অচেনা মুখ ও আরো পনেরো



অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী

অচেনা মুখ

ও

আরও পনেরো

অচেনা মুখ

ও

আরও পনেরো

অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী

দীপ প্রকাশন

২০৯এ, বিধান সরণি, কলকাতা ৭০০ ০০৬

দীপ

ACHENA MUKH O ARO PANERO

by Abhijnan Roychowdhury

প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০২৩

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য্য

প্রকাশক দীপ্তাংশু মণ্ডল

২০৯এ, বিধান সরণি, কলকাতা ৭০০ ০০৬

মুদ্রক কল্পনা অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০ ০১৫

উৎসর্গ

আমার হিন্দু স্কুলের বাংলার শিক্ষক
প্রয়াত শ্রদ্ধেয় শ্রী অপূর্ব বিশ্বাস স্যারকে,
যিনি আমাকে বাংলা ভাষা ভালোবাসতে শিখিয়েছিলেন।

ভূমিকা

এই বইতে আছে পাঁচটা উপন্যাস ও এগারোটা গল্প, যার মধ্যে প্রায় সব গল্পই রহস্য রোমাঞ্চের। এর মধ্যে বেশ কিছু গল্প আমার খুব প্রিয়। বেশ কিছু গল্প কল্পবিজ্ঞান বা ফ্যান্টাসি নির্ভর।

তবে এই গল্প বা উপন্যাসগুলোর মধ্যে আরেকটা জায়গায় মিল আছে। সেটা হল অনেক পাঠকই এসব গল্পের বা উপন্যাসের প্লট অত্যন্ত অভিনব বলে মনে করে, ও যখনই কিশোরভারতী, শুকতারা, সন্দেশ বা আনন্দমেলার শারদীয়া বা বিশেষ সংখ্যায় এসব গল্প প্রকাশিত হয়েছে, তখনই অজস্র পাঠক তাদের ভালোলাগা জানিয়েছে। বেশ কিছু উপন্যাস ও গল্প এখনও বহু বছর বাদেও পাঠকের আলোচনার কেন্দ্রে থাকে। এর মধ্যে তোমাদের সবার খুব প্রিয় চরিত্র অনিলিখারও কিছু গল্প আছে।

এই সংকলনে 'ভয়নিচের অজানা ভাষা' ও 'ভয়নিচের অজানা দেশে' এই দুই অত্যন্ত জনপ্রিয় উপন্যাস একসঙ্গে এক মলাটে সংকলিত হল, যাতে এই দুই গল্পের পারম্পর্য ও ধারাবাহিকতা ভালো করে বোঝা যায়।

দীপ প্রকাশনার কর্মকর্তা দীপ্তাংশু মণ্ডল ও দীপ প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত সবাইকে ধন্যবাদ জানাই কম সময়ের মধ্যে অত্যন্ত পেশাদারিত্বের সঙ্গে এই বই তোমাদের সামনে নিয়ে আসার জন্য।

আশা রাখি এ বই তোমাদের সবার ভালো লাগবে। সবাই ভালো থেকো।

নমস্কারান্তে

অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী
৩১শে অক্টোবর, ২০২২
কেনিলওয়ারথ, ইংল্যান্ড

সূচিপত্র

পার্থর পাগলামি

অরি, জেগে ওঠ

কাছে পাওয়া

বৃহৎচঞ্চু

অচেনা হাত

স্বাধীনতা

তাজমহল

ঘটনার আটাশ ঘণ্টা বাদে

বাইবেল ও একটা ছবি

অপরিচিতা

ভয়নিচের অজানা ভাষা

ভয়নিচের অজানা দেশে

আমার বন্ধু ঋক

অনিলিখা ও বোহাস ক্যাসলের প্রেতাত্মা

এ যুদ্ধ শেষ হবেই

অচেনা মুখ

পার্থর পাগলামি

১

—বুঝলি, আবার সেই ছেলেটা এসেছিল। আমাকে নিয়ে যেতে চাইছিল ওদের দেশে। আমি যাইনি। —ঘরের সব থেকে অন্ধকার কোণের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রেখে বিড়বিড় করে আমাকে বলে উঠল পার্থ।

তারপরে আমার দিকে একবার তাকিয়ে চোখ সরিয়ে নিল। ওর চুল উসকোখুসকো, গালে আগাছার মতো গজিয়ে-ওঠা খাবলা খাবলা দাড়ি।

ওর কথা শুনেই বুঝলাম, ওর আবার সেই পাগলামি শুরু হয়েছে।

স্কুলের বন্ধুদের একমাত্র আমিই ছিলাম যে ওকে কখনো পাগলা বলে ডাকতাম না। ওর নাম ধরে ডাকতাম। আমার আরও বেশ কয়েকজন ভালো বন্ধু থাকলেও নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, আমিই ছিলাম ওর একমাত্র বন্ধু।

তার একটা কারণ ছিল। মাঝেমধ্যে ও কীরকম যেন অদ্ভুতরকম ব্যবহার করত। আমরা তখন ক্লাস সিক্সে। ওর পাশে কেউ বসতে চাইত না। যদি কেউ বসতে চাইত, সেটা ওকে নিজে মজা করার জন্যেই। সেজন্য ও বসত বেঞ্চির একদম কোণে। তার পাশে আমি।

কেন জানি না সবাই যখন ওকে 'পাগলা' 'পাগলা' বলে খেপাত, আমার খুব খারাপ লাগত। মনে হত ওর পাশে আমার থাকা দরকার। ও তো কারো ক্ষতি করতে চায় না।

তবে খুব নিরীহ হলেও মাঝেমধ্যে এমন কিছু কাজ হঠাৎ করে করত, যা আমাকেও অবাক করে দিত। যেমন একদিন দেখি, লাল কালির একটা ফাউন্টেন পেন এনেছে। পাশে বসেছিলাম বলে খেয়াল করেছিলাম। দেখলাম, সেটা আমি দেখলেও অন্যদের থেকে আড়াল করে রেখেছিল। পরের দিন বুঝলাম কারণটা। আমাদের ক্লাসে রক্তিম আর আনন্দ দুজনেই বেশ খারাপ ছেলে। অন্যদের মারধর, ভালো জিনিস কেড়ে নেওয়া, অহেতুক মাতব্বরি—এসবই দুজনে মিলে করে। সেদিন স্কুলের টিফিনের সময় দেখি, দুজনের মধ্যে মারামারি লেগেছে। পরে জানলাম কারণটা। রক্তিমের সাদা শার্টের পিছনে লাল কালি ছিটিয়েছে আনন্দ। আনন্দ বরাবরই একটা লাল কালির পেন ব্যবহার করে। অন্য কেউ করে না। আনন্দ কিছুতেই সেটা স্বীকার করছে না। অবশ্য সেটা যে আনন্দ করেনি, পার্থ করেছে, সেটা শুধু আমি আন্দাজ করেছিলাম। কাউকে সে কথা বলিনি অবশ্য।



পার্থ পড়াশোনায় ভালো ছিল না। যদিও চেষ্টা খুব করত। ইন ফ্যাক্ট, আমাদের সবার থেকে অনেক বেশি পড়ত। কিন্তু সেভাবে কখনোই ভালো রেজাল্ট করতে পারত না। তবে এত মন দিয়ে পড়াশোনা করত বলে সময়ে সময়ে অনেকের ধারণাই ছিল যে ও বুঝি অনেক কিছু জানে। বিশেষ করে ইতিহাস নিয়ে দেখতাম, বেশ মোটা মোটা বই পড়ত। তা সেবারে ইতিহাস পরীক্ষার সময় ওর পাশে পড়ল সোমনাথের সিট। সোমনাথ ছিল টোকার এক্সপার্ট। পাশ থেকে দেখে টোকা ব্যাপারটাকে প্রায় শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল। কমা, ফুলস্টপ কিছুই বাদ দিত না।

কিছুদিন আগে সোমনাথ ক্লাসে ওর সেকশনের সবাইকে ওর বাড়িতে জন্মদিনে খাইয়েছিল। শুধু পার্থ বাদে। আমি বলতে বলেছিল, ধুর, ওই পাগলাটাকে আবার বাড়িতে ডাকা যায় নাকি!

কিন্তু পরীক্ষার সময় দেখি, সেসব ভুলে সারাক্ষণ টুকল পার্থর খাতা থেকে। আমি পরীক্ষার পরে বললাম পার্থকে, তুই এভাবে ওকে টুকতে দিয়ে অন্যায়কে প্রশ্রয় দিলি। সারাক্ষণ পুরো তোর খাতার দিকে চেয়ে লিখে গেল।

পার্থ কিছু বলল না। শুধু মুচকি হেসে বলল, ওই ছেলেটা প্ল্যানটা দিয়েছে। মজাটা দেখিস।

—কোন ছেলে?

—তুই তাকে চিনবি না। বলে ইচ্ছে করে এই ব্যাপারে আর কোনো কথা না বলে অন্যদিকে চলে গেল।

কিছুদিন বাদে ইতিহাসের পরীক্ষার নাম্বার জানানোর সময় হরেনবাবু ওদের দুজনকে কাছে ডাকলেন। ওদের খাতা দুটো বার করে বলে উঠলেন, দুজনেরই এক উত্তর, শুধু এক উত্তর নয়, প্রায় সব ভুল উত্তর। বলে না অন্ধ অন্ধকে পথ দেখালে কী হয়! তবু পার্থকে আমি একশোয় কুড়ি দিয়েছি, ও সৎভাবে চেষ্টা করেছে বলে। বলে একটু থেমে এবারে সোমনাথের কান দুটো বেশ জোরে টেনে বলে উঠলেন, বলি, টোকার সময় কার খাতা দেখে টুকছ, কী টুকছ, সেটুকু বোঝার জন্যেও ঘটে বুদ্ধি থাকা দরকার।

বলি, সিপাহি বিদ্রোহে রবীন্দ্রনাথ নেতৃত্ব দিয়েছিল? আর তাজমহল তৈরি করেছে ভগৎ সিং! কাল বাবা-মা-কে স্কুলে আসতে বলবে। হেডস্যারের ঘরে।

পার্থ স্কুল থেকে বেরোনোর সময় শুধু আমাকে বলল, ইচ্ছে করে সব ভুল লিখেছি, যাতে ও ঠিক ধরা পড়ে।

বলে বিড়বিড় করে ফের বলে উঠল,ছেলেটার বুদ্ধি আছে।

পার্থকে কখনো কখনো একদম স্বাভাবিক মনে হত। কিন্তু পরীক্ষা কাছে এলেই যেন সেই টেনশনে ওর পাগলামি বেড়ে যেত। তখন মাঝেমধ্যে ও স্কুলে আসত না। আমি তখন ওর বাড়ি যেতাম। ওর মা আমাকে খুব ভালোবাসতেন।

আসলে উনি জানতেন আমিই ওর একমাত্র বন্ধু। ওকে বুঝি। ও দুঃখ পায় এমন কিছু করি না। সেজন্য আমি ওদের বাড়ি গেলেই খুব খুশি হয়ে আমার জন্যে ভালো ভালো খাবার বানাতে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। কিন্তু আবার ওর যখন এই আধপাগল অবস্থা হত, তখন মনে হত, মাঝেমধ্যে উনি যেন খুব ভেঙে পড়তেন। যেন খুব অসহায় হয়ে পড়তেন।

পার্থর বাবা মারা গিয়েছিল। সেজন্য পুরো দায়িত্বটাই এসে পড়েছিল মাসিমার উপরে। উনি কোথায় জানি কাজ করতেন। কিন্তু অনেকদিনই যেতে পারতেন না পার্থর এইরকম অবস্থার জন্যে। পার্থের আরেক খুব প্রিয়জন ছিল ওর মামা। মামা ছিল ওর বড়ো গর্বের জায়গা। মামা শুনেছিলাম, পড়াশোনায় খুব ভালো ছিল। পরে বিদেশে চলে যায়। নিয়মিত যোগাযোগ না

থাকলেও পার্থ কথায় কথায় ওর মামার কথা বলত। মাঝে মাঝেই ওই 'জগ্যিদাসের মামা'র মতো মামাকে নিয়ে নানান গল্পও ফাঁদত। কিছুটা বাড়িয়ে অবশ্যই। মামা মানেই যেন সবেতে ফার্স্ট। সে ১০০ মিটার দৌড় হোক, কি কোনো সর্বভারতীয় পরীক্ষা।

যত উপরের দিকে ক্লাসে উঠছিলাম, পার্থর অস্বাভাবিক ব্যবহার যেন বাড়ছিল। মনে হত যেন ও পড়াশোনার চাপ নিতে পারছিল না। অর্ধেক দিন স্কুলে আসত না। এলেও নিজের মনে বিড়বিড় করে মাঝেমধ্যে কার সঙ্গে যেন কী সব কথা বলত। জানলার বাইরের দিকে অন্যমনস্ক হয়ে তাকিয়ে থাকত। টিফিনে আমার পাশে বসে খেতে খেতেও যেন মনে হত, অন্য কিছু ভাবছে। একা একা থাকত বেশির ভাগ সময়। আমি চেষ্টা করলেও দু-একটা কথা বলার পরেই যেন অন্যমনস্ক হয়ে যেত।

একবার ও অনেকদিন স্কুলে এল না। আমিও খোঁজ নিতে পারিনি। খুব ব্যস্ত ছিলাম পড়াশোনা নিয়ে। কয়েক মাস বাদেই মাধ্যমিক।

একদিন দেখি, স্কুলে মাসিমা এসেছেন। আমি ভেবেছিলাম, কোনো টিচারের সঙ্গে কথা বলতে এসেছেন। পরে জানলাম, আমার সঙ্গে দেখা করতেই এসেছেন। আমি যদি ওদের বাড়িতে যেতে পারি একদিন, সে কথা বলতে।

পরের দিন স্কুলের পরে ওদের বাড়ি গেলাম। ওদের বাড়িতে গিয়ে শুনি, পার্থ নাকি বেশ কয়েকদিন ধরে একটা ঘরের মধ্যে লুকিয়ে বসে আছে। বেরোতে চাইছে না। শরীর নাকি খুব খারাপ। আমি একা ঢুকতে যাচ্ছিলাম। মাসিমা বারণ করলেন। বললেন, আগে আমার সঙ্গে কিছু দরকারি কথা বলে নিতে চান।

সেদিনই পার্থর অসুখের ডাক্তারি নামটা প্রথম জানলাম। 'স্কিৎসোফ্রিনিয়া'। ও নাকি অনেক কিছু দেখে বা শোনে বা গন্ধ পায়, যার আসল কোনো অস্তিত্ব নেই বাস্তবে। শুনেই বুঝতে পারলাম, ওই কাল্পনিক ছেলেটা যার কথা ও প্রায়শই বলে, সে এই জগতেরই অংশ। শুনলাম, মাঝেমধ্যে নাকি পার্থ খুব ভায়োলেন্ট হয়ে ওঠে। তখন উত্তেজনার বশে অনেক সময় হাতের কাছে যা জিনিস পায়, তা-ই ছোড়ে। এমনকী সেদিন মাসিমাকেও কালির শিশি নাকি ছুড়ে মারতে যাচ্ছিল। সেজন্যই উনি আমাকে একা যেতে দিতে চান না।

আমি মাসিমার সঙ্গে ওর ঘরে ঢুকলাম। দেখি, চারদিকে বই ছড়িয়ে খাটের উপরে বসে আছে পার্থ। পাশের জানলার দিকে তাকিয়ে বসে আছে, আর কী সব যেন বিড়বিড় করে বলে যাচ্ছে।

—আপনার থাকার দরকার নেই মাসিমা, আমি আছি।— বলে উঠলাম।

আমার উপস্থিতি যেন খানিকক্ষণ বাদে লক্ষ করল পার্থ। মনে হল সে দৃষ্টি ঠিক স্বাভাবিক নয়। চোখে পিঁচুটি। গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। বেশ গরম পড়েছে। তার মধ্যেই পাখা বন্ধ। বেশ কয়েকদিন চান করেনি। গায়ে ঘামের বিশ্রী গন্ধ।

তারপরে হঠাৎ করে আনমনে বলে উঠল পার্থ, এবারে মনে হয় না মাধ্যমিক দিতে পারব। জানি আমার মা-র খুব কষ্ট। আমি যদি তাড়াতাড়ি একটা কিছু করতে পারতাম। কিন্তু আমি আমার মামার মতো ভালো নই। তোর মতো ভালোও নই। কিছুই মনে রাখতে পারি না। তা ছাড়া কিছুই আজকাল মাথায় ঢোকে না।

কথাগুলো শুনতে শুনতে মনে হল পার্থ বোধহয় এখন স্বাভাবিক।

বলে উঠলাম, পারবি না কেন, নিশ্চয়ই পারবি! তোকে পারতেই হবে। আমাকে বলবি, কোনটা শক্ত লাগে। কোনটাতে সাহায্য লাগবে। আমি বুঝিয়ে দেব।

একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল পার্থ। কিন্তু পরক্ষণেই বলে উঠল, না রে, সেরকম হওয়ার নয়। ছাপা অক্ষরগুলো সব কাঁপে। মাঝেমধ্যে একটা লাইন দশবার করে পড়তে হয়। আমি কোনোভাবেই পারব না। ওই ছেলেটাও তা-ই বলল। বলল, আমি পরীক্ষা দিতে পারব না।

—কোথায় থাকে ওই ছেলেটা? কার কথা বলছিস? আমি তাকে চিনি?— আবার সেই একই প্রশ্ন অধৈর্য হয়ে বলে উঠলাম।

একটু থেমে ও আস্তে আস্তে বলে উঠল, তোকে আজ একটা টপ সিক্রেট বলে দিই। ওই ছেলেটা এখানকার নয়। ওকে সবাই দেখতে পেলেই হইচই পড়ে যাবে। শুধু আমার সামনে আসে। ও বলেছে, একদিন আমাকে ওদের দেশে নিয়ে যাবে। সেখানে নাকি আমার চিকিৎসা সম্ভব। আমি ওখানে গেলেই আবার ভালো হয়ে যাব।

—ছেলেটা কি আমেরিকাতে থাকে না ইংল্যান্ডে? কোথায় সে?

ঠোঁটের কোণে একটা দুষ্টু হাসি হেসে পার্থ বলে উঠল, তোকে দেখালে তুই খবরটা পাঁচকান করবি। তখন ওরা বিপদে পড়বে। ওরা চারজন আছে এই পৃথিবীতে।

—মানে ওরা পৃথিবীর নয়?— আমি খুব অবাক হয়ে বলে উঠি। সত্যি বলতে কী, আমি চিরকালই বেশ সহজে অন্যদের কথা বিশ্বাস করে নিই। তখন আরও করতাম। তা ছাড়া ছোটোবেলায় অ্যালিয়েন বা ভিনগ্রহী যে হাতিবাগানের ভিড়ের মধ্যে থাকতে পারবে না, এরকম কথাই ভাবতে শিখিনি।

আমার প্রশ্নে উৎসাহিত হয়ে ও বলে উঠল, না হলে আর বলছি কী? ওরা অনেক দূরের একটা গ্রহ থেকে এসেছে। মাঝেমধ্যে শুধু ছেলেটা জানলার বাইরে এসে উঁকি দেয়। এই

খানিক আগেও আমার সঙ্গে লুডো খেলতে এসেছিল। আমার কাছ থেকেই খেলাটা শিখেছে। ওই, ওই দেখ।

দেখলাম সত্যি কিছু দূরে মাটির উপরে একটা লুডোর বোর্ড রাখা। তাতে ঘুঁটিও সাজানো আছে।

সেদিন বেশ কয়েক ঘণ্টা ছিলাম। শুধু ওইদিনই নয়, তারপরে পরীক্ষার আগে আরও বেশ কয়েকদিন গিয়েছিলাম। কিন্তু ও সুস্থ হয়ে ওঠেনি। আমি ও মাসিমা অনেকবার বোঝানোর পরেও ও পরীক্ষা দেবে না।

একদিন মাসিমাই আবার আসতে বারণ করলেন। এতে আমার সময় নষ্ট হচ্ছে পরীক্ষার আগে। তা ছাড়া, মাসিমার মুখেই শুনলাম, বাড়ির কাজের মহিলাকে পার্থ নাকি চায়ের কাপ ছুড়ে মেরেছে। অল্পের জন্য সে বড়োরকম চোট পায়নি।

সে বছর মাধ্যমিক দেয়নি পার্থ। যদ্দূর জানি আর কখনোই দেয়নি। পরীক্ষার পর যখনই গেছি, দেখেছি, ওই ঘরের মধ্যে অন্ধকার করে বিড়বিড় করে কী সব বলে যাচ্ছে। চারদিকে বই ছড়ানো। দেখলে মনে হয়, প্রচুর পড়ছে। আমাকে হঠাৎ হঠাৎ করে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলে উঠত। কিন্তু খাপছাড়া কথা। মনে হত যেন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠছে, আবার হারিয়ে যাচ্ছে।

শুধু ওই ছেলেটার সম্বন্ধে যখন কথা বলত, সেগুলো যেন খুব উৎসাহ নিয়ে বলত। শুনেছিলাম, একদিন রাস্তায় বেরিয়ে না দেখে পার হতে গিয়ে আরেকটু হলে একটা বাসের তলায় চাপা পড়ছিল। সেজন্য ওকে বাইরেও একা বেরোতে দেওয়া হত না।

তা ছাড়া ওর পাগলামির খবরটা তখন শুধু আর বাড়ি আর স্কুলের চৌহদ্দির মধ্যে আটকে ছিল না। আশপাশের পাড়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল। সবাই ওকে 'পাগলা পার্থ' বলে বলত। শুধু আমি ছাড়া।

২

বহু বছর কেটে গেছে। আমি আমেরিকায় নাসা-য় কাজ করি। জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানী। সেসব নিয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু রিসার্চে যুক্ত আছি। বেশ নামডাক হয়েছে। মাঝে একবার ভারতে আসার সুযোগ হল কয়েকদিনের জন্য। ঠিক করলাম, পার্থর বাড়িতে যাব। আমার স্কুলের সামান্য কিছু বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ আছে। কিন্তু তারা কেউই পার্থর খবর বলতে পারল না। যেন পুরো কর্পূরের মতো হারিয়ে গেছে।

কেন জানি না, হঠাৎ করে মনে হল, পার্থর সেই পুরোনো বাড়িটা একবার গিয়ে দেখে আসি। ও কি এখন ওখানে থাকে! নাকি অন্য কোথাও?

উত্তর কলকাতার এক পুরোনো পাড়ার মধ্যে বাড়িটা। কিন্তু খুঁজে পেতে একটু সময় লাগল। এই পাড়াগুলোর কিছু কিছু জায়গা একদম বদলে গেছে। চেনাই যায় না।

না পেয়ে ফিরেই যেতাম, কিন্তু পার্থর নাম বলতেই একজন মাঝারি বয়সি লোক বলে উঠল, ও আপনি 'পাগলা পার্থ'কে খুঁজছেন। —বলে একটু এগিয়ে একটা লাল ইটের শিরদাঁড়া-বেরোনো একটা বাড়ি দেখিয়ে দিল।

বুঝলাম, কেন চিনতে পারছিলাম না। ওর বাড়ির পাশে একটা পানের দোকান ছিল, একটা মিষ্টির দোকান ছিল। সেগুলো উধাও হয়ে এখন একটা ফোনের দোকান হয়েছে।

বাড়িটা রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে আরেকটু বিবর্ণ হয়েছে। প্রায় ভূতুড়ে বাড়ির মতো চেহারা। চওড়া সিঁড়ির পাশ দিয়ে ভাঙা রেলিং পেরিয়ে দোতলায় উঠে এলাম।

দোতলায় ওরা যে ফ্ল্যাটে থাকত, সেটা যেন এখনও সেই পঞ্চাশ বছর পিছনেই পড়ে আছে। মাঝে কোনো জীবনের স্পর্শ পায়নি। কোনো কলিং বেল নেই। বেশ কয়েকবার দ্বিধা নিয়ে ধাক্কা দেওয়ার পরে একটা চেনা কণ্ঠস্বর শুনলাম। পার্থ। এত বছর পরেও সেই একই রকমভাবে একটা অদ্ভুত সুরে কথা বলা।

আমাকে কি এত বছর পরে চিনতে পারবে? কী বলবে? কোনো বিপদ নেই তো? এখন কি ও সম্পূর্ণ পাগল?

এসব নানান চিন্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি, দেখি, হঠাৎ দরজা খুলে গেল। সামনে সেই মূর্তিমান পার্থ।

দেখেই চিনতে পেরেছে। মনে হল বেশ খুশি। একটু উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, অনেকদিন পরে। কিন্তু জানতাম, তুই আমাকে ভুলবি না।

ঘরে গিয়ে বসলাম। বেশ ভয়ে ভয়েই বসলাম। কারণ সেই ঘরে শুধু একটা ভাঙা চেয়ার, আর অন্যদিকে খাট। চারদিকে এমনকী খাটের উপরে ছড়ানো নানান বৈদ্যুতিন যন্ত্র, অজস্র তার, আরও অনেক কিছু।

বলে উঠলাম, কী করিস এখন?

—ওই যে দেখছিস না, সব ইলেকট্রনিক জিনিস, ফোন—এসব মেরামত করি। শুধু যেগুলো দেখে মনে হয় বেশি ইন্টারেস্টিং কাজ, সেগুলো নিই। কোনোরকমে চলে যায়।

—মাসিমা?

—অনেকদিন মারা গেছেন।

—তুই বোধহয় কারোর সঙ্গে যোগাযোগ রাখিস না। কোনো বন্ধু তোর কোনো খবর দিতে পারল না। শেষে এখানে এসে চান্স নিলাম।

—ধুর, তুই ছাড়া স্কুলের আর কেউই বন্ধু ছিল না। আমার এই বিশ্বের সঙ্গে আর কোনো যোগাযোগ রইল না। মামা কিছুদিন হল মারা গেছেন। যেটুকু যোগাযোগ শুধু এই বিশ্বের বাইরের মহাবিশ্বের সঙ্গে। তা তুই কী করিস?

বুঝলাম, সেই পাগলামিটা এখনও রয়ে গেছে। আমার পরিচয় দিলাম। কী করি, সেটা খুব হালকাভাবে বললাম। যদিও বলেই বুঝলাম, ও এসব ব্যাপারে কিছুই জানে না। কোনো কিছুর খবরও রাখে না। 'নাসা' নামটার সঙ্গেও ওর কোনো পরিচিতি নেই। তা ছাড়া গতকালও আমার যে সাক্ষাৎকার এখানকার বড়ো একটা কাগজের প্রথম পাতায় বেরিয়েছে, সেটাও ও দেখেনি। 'বিখ্যাত মহাকাশবিজ্ঞানী অচিন্ত্য বোস এখন কলকাতায়'।

ওকে বলে উঠলাম, তা তুই এসব কাজ শিখলি কোথায়? তুই তো আর তারপরে স্কুলে যাসনি কোনোদিন?

—সেই যে মাধ্যমিক দিলাম না, তার কয়েক বছর বাদে হঠাৎ করে দু-দিনের জ্বরে মা মারা গেল। তখন ওই ছেলেটাই হল আমার একমাত্র সঙ্গী। ও-ই আমাকে শেখাল। হাতেকলমে কাজ।

—কোন ছেলেটা?

—আরে, সেই যে ছেলেটা, যার কথা তোকে বলতাম না?

—এখনও তার সঙ্গে তোর যোগাযোগ আছে?

—না। এখন আর নেই। কয়েক বছর আগে ও চলে গেছে। ওর এখানে আর থাকার কোনো উপায় ছিল না। ফিল্ড স্টাডিতে এসেছিল, পৃথিবীতে পঞ্চাশ বছর কাটিয়ে চলে গেছে।

এবার আর হাসি সামলাতে পারলাম না।

আমার সেই হাসি দেখে পার্থ একটু যেন ক্ষুণ্ণ হল। বলে উঠল, আমার ছোটোবেলায় শুধু দুজন বন্ধু ছিল, তুই আর ও। কিন্তু তুই কোনোদিন বিশ্বাসই করলি না যে ও আছে। আসলে ও অন্য কারো সামনে আসতে চাইত না। আমি অনেক সময় এই ঘরে—ওই —ওই যে দেরাজটা দেখছিস— তার মধ্যেও ওকে লুকিয়ে রাখতাম। ওরা চারজন এসেছিল, তিনজন ধরা পড়েছে কোথাও। ও তাই ভয়ে ভয়ে ছিল। আমকে ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করত না। কাউকে না।

বেশ বুঝলাম। বাইরের দিক থেকে শান্ত মনে হলেও ওর পাগলামো আদৌ কমেনি। একই রকম আছে। আমার পক্ষে এখানে একা বেশিক্ষণ থাকা ঠিক হবে না। কখন খেপে যায়।

ও ফের বলে উঠল, দাঁড়া, তোকে একটা ছবি দেখাই। ওর ছবি। আমার হাতে আঁকা।

বলে ও উঠে পুরোনো একটা আঁকার খাতা থেকে একটা পাতা বার করে এনে আমার সামনে ধরল। ফের বলে উঠল, আমার হাতে আঁকা।

তাচ্ছিল্যভরে হাতে নিয়েই চমকে উঠলাম সেই ছবি দেখে।

ঘরে আলো কম ছিল। তাই ভালো করে দেখার জন্য উঠে গিয়ে আবার আলো জ্বাললাম। এই একই ছবি আমি খুব সম্প্রতি দেখেছি।

নাসা-র টপ সিক্রেট ফাইলে রাখা সেই ছবি আমি ও শীর্ষস্থানীয় অন্য দুজন বিজ্ঞানী ছাড়া অন্য কেউ দেখেনি। এমনকী এই ছবির বাইরে আমরাও তাদের সম্বন্ধে কিছুই জানি না। কী জন্য ওখানে রাখা, সেটাও জানি না। যদিও আমাদের আন্দাজ, ওরকম কোনো ভিনগ্রহী পৃথিবীতে এসেছিল। তাদের কোথাও লুকিয়ে রাখা আছে।

কিন্তু হুবহু একই ছবি এত বছর আগে পার্থ কী করে এঁকে ফেলল! সেই প্রাণীকে ঠিকভাবে বর্ণনা করা খুব মুশকিল। মাথায় কোনো চুল নেই। দুটো চোখে নেকড়ে বাঘের চাহনি। পেটের জায়গাটা খুব ছোটো। কোনো হাত নেই। নীচের দিকে চারটে শুঁড়ের মতো পা। এরকম কোনো প্রাণী কারোর পক্ষে ভাবা সম্ভব নয়। কী করে ঠিক একই ছবি ও আঁকল, যা ওর জানার কোনো সম্ভাবনা নেই?

—তুই এখনও বিশ্বাস করছিস না, তা-ই তো? কেউই করবে না। তা ও আমার মতো একজনের কথা শুনে, যার স্কিৎসোফ্রিনিয়া আছে। আসলে ঠিক ওইটা থাকার জন্যেই ছেলেটা আমাকে এত ভালোবাসত। ও বলত আমিই নাকি একমাত্র স্বাভাবিক। তাই সবকিছু দেখতে পাই। তোরা সবাই অস্বাভাবিক, বা ওর ভাষায় পাগল। মনে করিস না, আমি কিন্তু কখনো সেটা মনে করতাম না।

—কেন? সব দেখতে পাস মানে?

—সবরকম। ও বলত, আমি একমাত্র, যে এই বহুমাত্রিক জগতের সব সম্ভাবনা দেখতে পাই। শুনতে পাই। সব সম্ভাবনার কথা ভাবতে পারি। ঠিক যেমন ও দেখতে পায়।

—মানে?

—ধর, আমি যদি চাই, ভেবে নিতে যে আমার মা এখন এখানে আমার সঙ্গে আছে, ভাবতে পারি। ওইদিকে দেখ। এখন তোর দিকে তাকিয়ে হাসছে। অনেকদিন বাদে এসেছিস বলে পিঠে করে এনেছে। কী দেখতে পাচ্ছিস?

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে ফের বলে উঠল,—কী, পাচ্ছিস না? আমি কিন্তু পাচ্ছি। ওই ঘরের কোণে সোফায় বসে আছে। কী, বিশ্বাস হচ্ছে না?

আমি প্রথমবার জীবনে মাথা নেড়ে সায় দিলাম, তোকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করছি, পার্থ। ঠিকই বলেছিস। আমরা সবাই পাগল।

১১ জানুয়ারি ২০২২

কেনিলওয়ার্থ, ইংল্যান্ড

অরি, জেগে ওঠ

১

সামনের সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বালির উপরে চুপ করে বসে ছিল ঋষি। দূরে এখন একটা মাছ ধরার ডিঙিনৌকো দেখা যাচ্ছে। খুব সম্ভবত মাছ ধরে ফিরছে। কলকাতার এত কাছে যে এরকম সুন্দর জায়গা আছে, তা ও কোনোদিন ভাবতেও পারেনি। বাড়ির থেকে ঢিল-ছোঁড়া দূরত্বে সমুদ্র। ড্রয়িং রুমের প্রশস্ত জানলা দিয়েই সমুদ্র দেখা যায়। মনে হয় যেন দেওয়ালে কোনো নামী শিল্পী সমুদ্রের ছবি এঁকে দিয়েছে। এরকম বাড়ি শুধু সিনেমার পরদায় দেখা যায়।

এক সপ্তাহের জন্য মা-বাবার সঙ্গে ও এখানে এসেছে। এ বাড়িটা কিছুদিন আগে ওর বাবা কিনেছে। এই প্রথম ওর এখানে আসা।

কিন্তু ও বাড়িতে বসে থাকার পাত্র নয়। এ ক-দিন মাঝেমধ্যেই সকাল-সন্ধে গেট খুলে বাইরে বেরিয়ে যায় সৈকতে। বালির মধ্যে পায়ের পাতা ডুবিয়ে বসে থাকে। বিচের বালি এত মিহি যে হাতে ধরে রাখা যায় না। শরীর আস্তে আস্তে বালির মধ্যে ঢুকে যায়। এদিকটা খুব নির্জন। বেশি লোক আসে না। শুধু মাঝেমধ্যে লাল কাঁকড়ার দল দেখা যায়। গত দু-দিন ভোরে সূর্যোদয় দেখেছে। লালচে হয়ে-ওঠা আকাশের মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে উজ্জ্বল সোনার থালার মতো সূর্য উঁকি দেয়। জলের উপর দিয়ে সেই আলোর রক্তরেখা ওকে এসে ছুঁয়ে যায়। শরীরে ও মনে।

ওর বয়েসি ছেলেদের তুলনায় অনেকটাই শান্ত ঋষি। একা একা অনেকটা সময় কাটাতে ভালোবাসে।

পরীক্ষায় প্রথম হলে কী চাই, বাবা জিজ্ঞেস করেছিল। ও বলেছিল, সমুদ্রের ধারে কোনো জায়গায় যেতে চায়।

বাবা মুচকি হেসেছিল। তারপরেই নাকি অনেক ভেবেচিন্তে বাবা এ বাড়িটা কিনে ফেলেছে। আসলে ঋষির বাবা খুব বড়ো ব্যবসায়ী। ওর মা-ও একজন খুব বড়ো সরকারি অফিসার। এক ছেলে। তাই চাইতে-না চাইতেই সবকিছু পেয়ে যায় ঋষি। ও মুখ ফুটে কিছু চায়, সেটার জন্যই যেন সবাই অপেক্ষা করে। অবশ্য এটাও ঠিক যে ঋষি এবারেও পরীক্ষাতে প্রথম হয়েছে। বরাবরের মতো। ও সবকিছুতেই সেরা। পড়াশোনা, খেলাধুলো সবেতেই। ওর মধ্যে একটা জেদ আছে। যেটাই ধরে, সেটাতেই ও সবার থেকে ভালো করে।

নাকি অন্য কিছু? ও কি সত্যিই খুব প্রতিভাবান, যেরকম সবাই ওকে বলে!

এই যেমন কয়েক সপ্তাহ ক্লাবে ব্যাডমিন্টন খেলতে শুরু করেছে। এর মধ্যেই সবাইকে হারাতে শুরু করেছে। এমনকী কয়েকদিন আগে ওই ক্লাবের চ্যাম্পিয়নকেও হারিয়েছে। সবকিছুই যেন ও খুব সহজে পেয়ে যায়। এই সেদিন স্কুল প্রতিযোগিতায় ও যখন ১০০ মিটার দৌড়োনোয় প্রথম হল, ও সেই চেনা কথাটাই আবার শুনল। গেমটিচার বিজয়বাবু এগিয়ে এসে বললেন, নাহ, তুমি সবেতেই সেরা।

কথাটা শুনলে ওর আগে বেশ ভালো লাগত। কিন্তু ও লক্ষ করেছে, আজকাল যেন সবাই ওকে এ কথাটা বলছে। ও কী করে সবকিছু এত সহজে পারে, সেটা ও নিজেই বুঝে ওঠে না। আগের মতো সবকিছু জেতার পরে সে আনন্দও তাই পায় না।

এসব কথা ভাবতে ভাবতে বালির উপরে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঠিক তখনই ও সেই একই স্বপ্নটা আবার যেন দেখতে পেল। একটা ছোটো ঘর। ঘরের মধ্যে ও আটকে পড়েছে। ঘরটা বেশ অন্ধকার। ঘরের বাইরে থেকে কারা যেন ঘরের দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। জোরে জোরে ডাকছে, 'অরি, জেগে ওঠ। বেরিয়ে আয়।' কিন্তু কিছুতেই ও যেন বেরোতে পারছে না। উঠে দাঁড়াতেই পারছে না। এরকম স্বপ্ন ও আগেও দেখেছে।

ও ধড়মড়িয়ে উঠে বসেছিল। উঠেই খেয়াল করল যে মা কখন জানি পাশে বালির উপরে একটা চেয়ার টেনে এনে বসেছে। ওকে উঠতে দেখে বলে উঠেছে,কী কোনো বাজে স্বপ্ন?

—হ্যাঁ, মা, একটা খুব বাজে স্বপ্ন।

—কী স্বপ্ন?

—ও তেমন কিছু না। বলার মতো তেমন কিছু নয়। শুধু ভয় লাগছিল।

—না খেয়ে এত বেলা অব্দি বালির উপরে রোদের মধ্যে শুয়ে আছিস। দেখিস, শরীর খারাপ না হয়!

—আচ্ছা মা, এ বাড়িটা কি এখন থেকে আমাদের?

—হ্যাঁ, তোর বাবাকে তো জানিস। তোর কথাতেই কিনে ফেলল। কেন, ভালো লাগছে না?

—খুব ভালো লাগছে। তবে এখানে একটা কুকুর থাকলে ভালো হত। তা-ই না? কুকুরটা বেশ ছুটে ছুটে খেলতে পারত। আমি বল ছুড়ে ছুড়ে দিতাম। এতোটা জায়গা। খুব মজা হত।

পরের দিন সকালেই বাবা একটা সাদা ছোটো কুকুর নিয়ে হাজির। কুকুরটার মুখটা বেশ হাসি-হাসি। ল্যাব্রাডর। মাস দুয়েক বয়স। খুব সহজেই ঋষির সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেল। বিকেলের দিকে বেশ খানিকক্ষণ ওকে বিচে নিয়ে গিয়ে খেলল ঋষি। ওর নাম দিয়েছে রেসি। খুব জোরে

দৌড়োয়। তবে একটা সমস্যা আছে নামটাতে। ঋষি আর রেসি। কেউ ঋষি—ডাকলেই রেসিও ছুটে যাচ্ছে।

ওর একটু অবাক লাগছিল। মা এত তাড়াতাড়ি কুকুরটাকে জোগাড় করল কী করে? কুকুরটা এত সুন্দর ট্রেনিং পেল কোথা থেকে? এত তাড়াতাড়ি ওর বন্ধুই বা হয়ে গেল কী করে? যেন ঠিক ওর জন্যেই রেসিকে তৈরি করা হয়েছে।

মা-কে সময়মতো এ ব্যাপারে জিজ্ঞেসও করল। মা ওর গাল টিপে আদর করে বলল, তুই চেয়েছিস, আর দেব না? কাল কিন্তু আমরা কলকাতায় ফিরব। ছুটি শেষ। সে খেয়াল আছে তো?

—আর রেসি?

—ও আমাদের সঙ্গেই যাবে। এখন থেকে আমাদের সঙ্গে থাকবে।

ছুটে গিয়ে ঋষি আনন্দে রেসিকে জড়িয়ে ধরল। রেসি ল্যাজ নেড়ে ওর গালটা চেটে দিল। একদিনের মধ্যেই খুব ভালো ভাব হয়ে গেছে রেসির সঙ্গে। কিন্তু তখনই রেসিকে আদর করার সময় হঠাৎ কাচের আয়নাতে ওর চোখ পড়ল। কে যেন তাতে লাল পেন দিয়ে লিখে রেখেছে— অরি, জেগে ওঠ।

ও চমকে উঠে মা-কে বলে উঠল, মা দেখো, যে ছেলেটাকে সেদিন স্বপ্নে দেখেছিলাম, তার নাম ছিল অরি। কে যেন 'অরি', 'অরি' বলে ডাকছিল। বলছিল, 'অরি, জেগে ওঠ'। দেখো, কে আবার আয়নার উপরে ঠিক সেটাই লিখে রেখেছে।

—কে? কোথায় লিখে রেখেছে?—অবাক হয়ে মা আয়নার দিকে তাকাল।

—ওই যে আয়নায়। —কিন্তু দেখাতে গিয়েই অবাক হল ঋষি। কোথাও কিছু তো নেই! তাহলে কি চোখের ভুল ছিল?

সেদিন রাতে ও আরেকটা স্বপ্ন দেখল।

একটা ছোটো ফ্ল্যাট। সেখানে একটা চেয়ার-টেবিলে বসে ও পড়াশোনা করছে। একটা মেয়ে ঘরে ঢুকে ওকে দাদা বলে ডেকে কী যেন দেখাল। ও মেয়েটাকে রেগে গিয়ে বলল পড়ার সময় বিরক্ত না করতে। কী একটা যেন খুব দরকারি পরীক্ষা আছে সামনে। কিছুই পড়া হয়নি। ও যা পড়ছে, সব ভুলে যাচ্ছে। চারদিকে মোটা মোটা বই। পাতা ওলটাতে গিয়ে দেখছে, তার অনেক কিছুই ও পড়তে শুরু করেনি।

ঘুম যখন ভাঙল, ঘরে ভোরের আলো বেশ দাপটের সঙ্গে ঢুকে পড়েছে। বেশ বেলা হয়ে গেছে। কিন্তু তবু এ স্বপ্ন এতটাই সত্যি, যে তার থেকে বাস্তবে ফিরে আসতে ওর কিছুটা সময় লেগে গেল। চুপ করে বেশ খানিকক্ষণ বসে রইল। শেষে রেসির 'কুঁই, কুঁই' ডাকে ও বিছানা

ছেড়ে উঠে পড়ল। রেসি বিচে যেতে চায় ওকে নিয়ে বল খেলার জন্য। খেলার অবশ্য বেশি সময় নেই। দুপুরেই ওরা কলকাতা ফিরবে।

২

দু-দিন বাদে ঋষির স্কুলে পেরেন্টস-টিচার মিটিং ছিল। সবার মুখেই ঋষির সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। এমন কোনো বিষয় নেই যাতে ঋষি প্রথম হয়নি। স্কুলে ওর মতো রেজাল্ট কেউ বহু বছর করেনি। সবারই অনেক আশা অকে ঘিরে।

বাবা-মা-ও খুব খুশি। স্কুল থেকে বেরিয়ে গাড়িতে ওঠার সময় ওর পাশ দিয়ে একটা ছেলে লাল সাইকেল চালিয়ে চলে গেল। ঋষি সাইকেলটার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে বাবা বলে উঠল—কী, ওরকম সাইকেল চাই?

মাথা নাড়িয়ে সায় দিল ঋষি।

পরের দিন ব্রেকফাস্টের সময় খবর পেল ঋষি। সাইকেল কেনা হয়ে গেছে। ড্রয়িং রুমের একপাশে নতুন লাল সাইকেলটা রাখা আছে। বাবা বলে উঠল— তোমাকে আগামী তিন দিন সাইকেল চালানো শেখার জন্য একজন লোক রেখেছি। তোমাকে প্র্যাকটিস করাবে।

—আজ চালাতে পারব না?

—না, কাল থেকে আসার কথা। কেন, আজ থেকে চালাতে চাও?

ওকে চুপ করে থাকতে দেখে বাবা ফের বলে উঠল, ঠিক আছে, দেখছি।

কয়েকটা ফোন করল বাবা। শেষে ব্যবস্থা হয়ে গেল। স্কুল থেকে ফেরার এক ঘণ্টার মধ্যেই সাইকেল চালানো শেখাতে একজন লোক এসে গেল। তারপরে ওকে নিয়ে বাড়ির লাগোয়া বিশাল বাগানে সাইকেল চালানো শেখাতে শুরু করল। চালাতে চালাতেই ও ভাবছিল, ওর বাবা-মা কী ভালো! যা চায় প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যায়! আর কেউ কি এত সহজে এসব পায়? কে জানে? কিছু বললেই হল, ঠিক যেন ম্যাজিকের মতো তার পরমুহূর্তে ওর সামনে সব জিনিস হাজির হয়ে যায়।

বাড়ির বাইরে গেটের সামনে দিয়ে একদল লোক যাচ্ছে। কোনোকিছুর দাবিদাওয়া নিয়ে চিৎকার করতে করতে যাচ্ছে। সাইকেল চালাতে চালাতেই তাদের হাতে প্ল্যাকার্ডটা দেখে চমকে উঠল ঋষি।

প্ল্যাকার্ডে লেখা—জেগে ওঠো। যাওয়ার সময় তারা যেন ঋষিকে প্ল্যাকার্ডটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিল। সেটা দেখতে গিয়ে সাইকেল থেকে পড়েই গেল ও।

বাড়ির ভেতর ঢুকে মা-কে এটা বলতেই, মা বলে উঠল, আসলে আমার মতো সরকারি অফিসের উপরতলায় যারা কাজ করে, তাদের উপর সবার খুব রাগ। এরকম কোনো

আন্দোলন হলেই, সবার আগে আমরাই ওদের লক্ষ্য হয়ে যাই। ওসব নিয়ে কিছু ভাবিস না।

কিন্তু প্ল্যাকার্ডে যে লেখা—জেগে ওঠো।—তার অর্থ কী? মা বলল,ওরা বলতে চাইছে, চারদিকের অন্যায়ের বিরুদ্ধে যাতে সবাই জেগে ওঠে। কারোর কাছে যেটা অন্যায়, সেটাই অন্য অনেকের কাছে ঠিক, ন্যায়। এসব নিয়ে ভাবিস না! ভালো করে রাতে ঘুমোচ্ছিস না। তাই এসব আবোল-তাবোল ভাবছিস।

সত্যি তা-ই। এরকম সব স্বপ্ন দেখলে কি আর ভালো করে ঘুম আসে!

সেদিন রাতে আবার স্বপ্ন দেখল ঋষি। একটা অন্ধকার বাড়ি। ও তার মধ্যে বন্দি। বাইরে থেকে কারা যেন ওকে উদ্দেশ করে ডাকছে, জেগে ওঠ। জেগে ওঠ। বেরিয়ে আয়।

কিন্তু ও বেরোনোর পথ খুঁজে পাচ্ছে না। বাড়িটা গোলকধাঁধার মতো। বার বার এক জায়গায় ফিরে যাচ্ছে। বাইরে থেকে সবাই ডেকে যাচ্ছে। তার মধ্যে একটা যেন কোনো মহিলার কাতর কণ্ঠ। কী মিষ্টি যে ডাক, সে বোঝানো যাবে না। যেন কত জন্মের পরিচিত সে ডাক।

বার বার সে ডাক শোনা যাচ্ছে— অরি, বেরিয়ে আয়। জেগে ওঠ অরি। জেগে ওঠ।

শেষে যেন ও একটা পথ খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু সে পথ দিয়ে খানিকটা এগোনোর পর হঠাৎ চোখে পড়ল তীব্র আলো। এত তীব্র আলো যে ও সামনে আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।

স্বপ্ন ভেঙে গেল। বিছানার উপরে উঠে বসল ঋষি। কে এই অরি? কেন ওকে সবাই ওই নামে ডাকছে? এমনকী অরি নামের কোনো বন্ধুও তো নেই।

রাত চারটের সময় সেই যে ঘুম ভেঙে গেল আর ঘুম এল না। মা-কে ও স্কুলে যাওয়ার আগে ব্রেকফাস্টে জিজ্ঞেস করল,— মা, অরি বলে কাউকে চেনো তুমি?

মা অবাক হয়ে বলে উঠল,— না। কিন্তু কেন?

এবারে আর স্বপ্নের কথাটা না বলে থাকতে পারল না ঋষি। এরকম একটা সাদামাটা স্বপ্ন। কিন্তু কী যেন আছে সে স্বপ্নে! ঠিক যেন জীবনেরই মতো। ও কি অরি বলে কাউকে কোনোদিন জানত? কেনই বা একই রকম স্বপ্ন দেখছে বার বার! কেনই বা ওই ডাকটা এত আপনার বলে মনে হচ্ছিল? স্বপ্নের সব ডিটেল কি এত ভালোভাবে কখনো মনে থাকে?

মা হেসে ওকে কাছে টেনে নিয়ে বলে উঠল, অনেক সময় পড়াশোনার টেনশনের জন্য অনেকে এরকম স্বপ্ন দেখে। আমিও দেখেছি। কিন্তু তোর চিন্তার কী আছে? তুই তো পড়াশোনাতে এমনিতেই এত ভালো! তোর কি কোনো কিছুর কোনো অভাব আছে?

সত্যি কোনো কিছুর অভাব নেই ওর। অভাব কথাটাই ওর কাছে অজানা, অচেনা। সেই ছোটোবেলার থেকে।

৩

স্কুলের লাগোয়া একটা খুব বড়ো ফুড স্টোর আছে। সেখানে অনেকরকম ফাস্ট ফুড, চকোলেট পাওয়া যায়। মাঝেমধ্যে স্কুল থেকে বেরিয়ে ও আর ওর বন্ধুরা ওখান থেকে খাবার কিনে খায়। অনেকদিনই ও অন্যদের জন্য খাবার কেনে। সবার অবস্থা ওর মতো ভালো নয়। সেদিন ও একাই ছিল। কয়েকদিন ধরে একটা বিশেষ ধরনের চকোলেটের বিজ্ঞাপন দেখছে। কী মনে হতে ও আজ সেটাই চেয়ে বসল। দোকানের কাকু ওকে প্রথমে 'না' বলেই পরক্ষণে বলে উঠল, দাঁড়াও, দেখছি। বলে কোথা থেকে ওটা বার করে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দিল। এটা আগেও হয়েছে। ও যা চেয়েছে, দোকানকাকু ঠিক সেটাই সব সময় পেয়ে গেছে।

ও চকোলেট নিয়ে ভারী খুশি হয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ কে যেন আবার ওর নাম ধরে ডেকে উঠল। পরিষ্কার শুনতে পেল সেই একই মহিলা কণ্ঠে ডাক— অরি জেগে ওঠ। জেগে ওঠ। ঠিক সেদিনের সেই মহিলার গলা।

চমকে উঠে পিছনের দিকে তাকাল ঋষি। কই, কিছু তো নেই। দোকান থেকে চকোলেটটা নিয়ে, ওর হঠাৎ কী মনে হল— স্কুলে না গিয়ে, কিছু দূরে ব্যস্ত রাস্তা। ও তার দিকে এগিয়ে গেল। নাহ, এদিকে তো কেউ নেই। কিন্তু ডাকটা স্পষ্ট, তীব্র। সে ডাকের কাছে যেন বাকি সব বাস্তব ম্লান হয়ে গেছে। আবার শুনতে পাচ্ছে—অরি, জেগে ওঠ।

অবাক হয়ে দেখল, ব্যস্ত রাস্তার উপরে বড়ো বড়ো করে কে যেন লিখে রেখেছে—অরি, জেগে ওঠ। জেগে ওঠ।

বিশাল চওড়া রাস্তার মাঝে আড়াআড়ি করে লেখা। যেন কারোর হাতের লেখা। একটা পথ দেখাচ্ছে কি ওই লেখা?

ওর কী যেন মনে হল! ব্যস্ত রাস্তার মধ্যে দিয়ে ও লেখার উপর দিয়ে ছুটতে শুরু করল। খানিকক্ষণের জন্য ভুলে গেল রাস্তায় সমস্ত গাড়ির উপস্থিতি। চোখ ধাঁধিয়ে গেল আলোয় হঠাৎ করে। আশপাশের গাড়ির হর্ন, চিৎকার সব যেন হারিয়ে গেল।

অরি অবাক হয়ে চোখ খুলে দেখল— ওকে ঘিরে ঘরে কয়েকজন ডাক্তার দাঁড়িয়ে আছে। একজন ডাক্তার ওকে দেখে বলে উঠল, তিন মাস কোমায় ছিল। আবার জ্ঞান ফিরে আসছে। মিরাকল। সত্যি মিরাকল।

কে যেন পাশ থেকে বলল, ওর আত্মীয়স্বজনকে খবর দেব? ওর মা তো অন্যদিনের মতো আজও সকাল থেকে বাইরে বসে আছে। ডাকব?

কিছুক্ষণের মধ্যে হুড়মুড়িয়ে ঘরে ঢুকলেন এক মহিলা। সাধারণ শাড়ি পরনে। চেহারায়— মুখে-চোখে ক্লান্তি আর অভাবের ছাপ।

অরি বলে মাথায় হাত রেখে ডাকতেই ঋষি বুঝল, এই ডাকই ও শুনত এতদিন ধরে।

ওই মহিলা ওর মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে কেঁদে যাচ্ছেন। বলে যাচ্ছেন, সবাই কি সবকিছু পায়, অরি! তুই জয়েন্টে পাশ করিসনি বলে এভাবে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করবি! আমাদের অভাব আছে, কষ্ট আছে। কিন্তু তার জন্য কি এত সহজে ভেঙে পড়তে হয়! জীবনে কি কোনো কিছু এত সহজে পাওয়া যায়! না পেলেই বা কী এসে যায়! এই তো সবাই বলেছিল, তুই আর ফিরে আসবি না। কিন্তু আমি জানতাম, তুই ফিরে আসবি। সেজন্য গত তিন মাস সবাই বলা সত্ত্বেও আশা হারাইনি। রোজ আমি আর তোর বোন এখানে বসে থাকি।

অস্পষ্টস্বরে ঋষি জিজ্ঞেস করে উঠল, বাবা?

চুপ করে রইলেন ওই মহিলা। শুধু চোখ ছলছল করে উঠল।

পাশ থেকে ডাক্তার বারণ করল, ম্যাডাম, এখন এত কথা বলবেন না। ও সবে জেগে উঠছে। এখন ওকে বিশ্রাম নিতে দিন।

১৪— জানুয়ারি২০২০

কেনিলওয়ার্থ, ইংল্যান্ড

কাছে পাওয়া

—আরেকটু জোরে গাড়ি চালাও, দেরি হয়ে যাবে যে!

—যা রাস্তা, চারদিকে যেরকম জ্যাম, দেখছই তো। এর থেকে আর জোরে চালানো যাচ্ছে না।

—কিন্তু দেরি হয়ে যাবে যে! এগারোটার মধ্যে ওখানে পৌঁছোতেই হবে।

—তার অনেক আগে পৌঁছে যাব। এত টেনশন কোরো না। তুমি সবেতেই বেশি টেনশন করো।

দেবাশিস নিশ্চিত ছিল দেরি হবে না। প্রায় আধ ঘণ্টা আগেই পৌঁছে যাবে যাদবপুর। অনেকটা পথ বলে বেশ খানিকটা বাড়তি সময় হাতে রেখে বেরিয়েছে।

কিন্তু ঠিক যা ভয় করেছিল, সেটাই হল। কলকাতায় সবকিছুই আনপ্রেডিক্টেবল। আরও কিছুটা আগে গিয়েই দেবাশিস দেখল সামনের রাস্তার অর্ধেকটা বন্ধ। কাজ হচ্ছে। বাকি অর্ধেক রাস্তা দিয়ে দু-দিকের ট্র্যাফিক পাশ করানো হচ্ছে। সেজন্য বেশ কিছুটা রাস্তা ভালো জ্যাম হয়েছে। সারি সারি গাড়ি দাঁড়িয়ে গিয়েছে। কচ্ছপের গতিতে এগোচ্ছে। তার মধ্যে এদিক-ওদিক দিয়ে পাশ কাটিয়ে যেতে গিয়ে বা গাড়ি ঘোরানোর চেষ্টা করতে গিয়ে এমন একটা সাংঘাতিক অবস্থা হয়েছে যে তাতে দু-দিকের গাড়িই আটকে গেছে। একেবারে দাবার স্টেলমেট কন্ডিশন। কারো কিছু করার নেই।

এবারে নিজেই উত্তেজনায় ঘামতে শুরু করল। পাশে অনীতাও ছটফট করছে। ফের বলে উঠল, কবে থেকে বলছি। এতটা রাস্তা। ভোর ভোর বেরিয়ে পরে ওখানে পৌঁছে অপেক্ষা করতে পারতাম। বাবুর কতটা খারাপ লাগবে যদি দেখে ইঞ্জিনিয়ারিং-এর গ্র্যাজুয়েশনের কনভোকেশনের সময় আমরা কেউ ওখানে নেই।

দেবাশিস আর অনীতার এক ছেলে। ভালোনাম রজত। আদরের ডাকনাম বাবু। এমন কোনো দিন যায় না, এমন কোনো ঘণ্টা কাটে না যেখানে 'বাবু'কে নিয়ে আলোচনা হয় না। কিন্তু সেই 'বাবু' গত চার বছর হস্টেলে থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং করছে। শুধু বছরে সামান্য কিছুদিন ওর সঙ্গে দেখা করা যায়। তার মধ্যে আজকের দিন আবার অত্যন্ত স্পেশাল। গ্র্যাজুয়েশনের কনভোকেশন ফাংশন।

গত বেশ কিছুদিন থেকেই দুজনের চোখে ঘুম নেই। শুধু আজকের দিনটার অপেক্ষা। কতদিন বাদে আবার বাবুকে দেখা যাবে।

আর সেই আজকের দিনেই এরকম হতে হল। একজন ট্র্যাফিক পুলিশ কিছু দূরে পানের দোকানে দাঁড়িয়ে সিগারেট খেতে খেতে এদিকে নজর রাখছিল। যেন এই চরম অব্যবস্থা নিজের পক্ষে আর সামলানো সম্ভব নয় বলে ঈশ্বরের হাতে ছেড়ে দিয়েছে।

গাড়ির জানলা নামিয়ে সেই পুলিশটার উদ্দেশে গালাগাল করে উঠল দেবাশিস— ওখানে দাঁড়িয়ে কী করছেন! সব গাড়ি আটকে গেছে। যত্তসব ইরেসপন্সিবল ইনকমপিটেন্ট লোক। শুধু ঘুস খেতে জানে!

সেই ট্র্যাফিক পুলিসটা দেবাশিসের চিৎকার শুনে প্রথমে একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল। তারপরে রেগে গিয়ে দূর থেকে কী সব বলে উঠল।

পাশ থেকে অনীতা বলে উঠল, এখন আর কোনো কাণ্ড বাধিয়ো না। চলো, গাড়ি রেখে আমরা ট্যাক্সি নিয়ে বাবুর ওখানে যাই।

মাথা একটু ঠান্ডা করে বলে উঠল দেবাশিষ, ট্যাক্সি কী উড়ে যাবে! সে-ও তো এখানে জ্যামে আটকে থাকবে।

—কিন্তু তোমার মতো ঢিকঢিক করে গাড়ি তো আর চালাবে না!

কোনো উত্তর দিল না দেবাশিস। সেটা যে কোনো সমাধান নয়, সেটা ভালোই জানে ও।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য যানজট একটু কমে এল। ঠিক সময়ের মিনিট পাঁচেক আগেই ওরা ওখানে পৌঁছে গেল। ইউনিভার্সিটির মধ্যে যে কনফারেন্স হলে আজ ছাত্রদের গ্র্যাজুয়েশন উপলক্ষে সমাবর্তন হবে, সেদিকে এগিয়ে গেল। বেশ কিছু ছাত্রছাত্রীই দাঁড়িয়ে থেকে সবাইকে সাহায্য করছে। এগিয়ে দিচ্ছে।

যেটা দেখা যায় না সাধারণত, সেটাই এখানে হচ্ছে। নিয়মশৃঙ্খলা মেনে সবাই এগিয়ে যাচ্ছে হলের দিকে। নিশ্চয়ই বাকিরাও সব অন্য ছাত্রছাত্রীদের বাবা-মা-নিকটাত্মীয়।

একজন ছাত্রী ওদের দেখে এগিয়ে এল। তারপরে ওদের দুজনকে হলের মধ্যে ওদের নির্দিষ্ট সিট অব্দি এগিয়ে দিল।

অনীতা জিজ্ঞেস করে উঠল, কী নাম তোমার? কী সাবজেক্ট? কোথায় পড়ো?

—রিনি। সেকেন্ড ইয়ার ইলেকট্রিক্যাল। —বলে মিষ্টি হেসে বলে উঠল, আপনারা বসুন। এই পাঁচ মিনিটের মধ্যে অনুষ্ঠান শুরু হবে। আমি আসি!

মেয়েটা চলে যেতেই অনীতা বলে উঠল, কী মিষ্টি মেয়েটা। বাবুর থেকে তার মানে বছর দুয়েকের ছোটো হবে। এরকম একটা মেয়ে বউমা হলে কী সুন্দর হবে তা-ই না!

দেবাশিস হেসে বলে উঠল ধুর, এখনকার ছেলে-মেয়েরা কি আর এত তাড়াতাড়ি বিয়ে করে কেরিয়ার নষ্ট করে? তোমার সেই ওয়ান ট্র্যাক মাইন্ড।

খানিক বাদে অনুষ্ঠান শুরু হল। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এক-এক করে সব ছাত্রছাত্রীকে ডেকে নিচ্ছিলেন। ইঞ্জিনিয়ারিং নয়, অন্য সাবজেক্ট দিয়ে শুরু করেছেন। সবাই স্টেজের উপরে উঠে সার্টিফিকেট নিয়ে নেমে আসছে। হলের সামনের দিকে ছাত্রছাত্রীরা বসে আছে। তাদের পিছন থেকে ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। ওখানেই কোথাও বাবু নির্ঘাত বসে আছে।

অনীতা অধৈর্য হয়ে পড়ছিল। বলে উঠল— আচ্ছা, ইঞ্জিনিয়ারিং দিয়ে শুরু করতে পারত। অন্য সব সাবজেক্টে কত স্টুডেন্ট। ইঞ্জিনিয়ারিংটা তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যেত। ওটা শেষ করে তারপরে বাকি সাবজেক্টগুলো দিতে পারত। আচ্ছা, বাবু সামনে ওখানে বসে আছে, তা-ই না! যাব একবার! কত দেরি হয়ে যাচ্ছে।

আবার শান্ত করল দেবাশিসবাবু, হ্যাঁ, হয়ে যাওয়ার পরে তো দেখা হবেই। এখন আর কী করে দেখা করবে!

শেষে ইঞ্জিনিয়ারিং শুরু হল। রজতের সাবজেক্ট কম্পিউটার সায়েন্স। খানিকক্ষণের মধ্যেই ডাক এল রজত রায়, কম্পিউটার সায়েন্স। নাম শুনে উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে উঠেছিল দেবাশিস।

পাশ থেকে অনীতা হাত ধরে টান দিল, বসে দেখো-না! কী হচ্ছে! লোকেরা কী ভাবছে!

কিন্তু পরক্ষণেই স্টেজে রজত উঠে এসেছে। সেটা দেখে অনীতাও উঠে দাঁড়াল— ওই, ওই তো বাবু। কী রোগা হয়ে গেছে, তা-ই না! ঠিকঠাক খায় না নির্ঘাত।

উপাচার্যকে হাতজোড় করে প্রণাম জানিয়ে সার্টিফিকেট নিল রজত। রজত তৃতীয় হয়েছে। সেজন্য একটা মেডেলও পেল। দুজনেই সমবেত সবার সঙ্গে হাততালি দিল।

একবার অনীতা জোরে চেঁচিয়ে উঠল, বাবু।

তারপরে নিজেই লজ্জা পেয়ে গেল। কিন্তু রজত ঠিক শুনেছে মা-র গলার ডাক। পুরস্কার নিয়ে স্টেজের উপর থেকে মা-কে লক্ষ করে দেখে একবার হেসে নেমে গেল স্টেজের অন্যদিক দিয়ে।

আবার পরের জনকে ডেকে নেওয়া হল।

এবারে দেখা করা যাবে রজতের সঙ্গে। সেরকমই কথা ছিল।

সিট ছেড়ে কনফারেন্সের হলঘরের থেকে বেরিয়ে এল ওরা। কিছু দূরে আরেকটা বিল্ডিং। সেখানে ছাত্রদের সঙ্গে দেখা করা যাবে। বিল্ডিংটায় ঢুকে লবি পেরিয়ে একটা ঘরের দিকে এগিয়ে গেল ওরা।

সেই ঘরে অবশ্য ঢোকার সামান্য লাইন ছিল। কিন্তু বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না।

মিনিট দশেক বাদে ঘরে ডাক পড়ল। ঘরের মাঝবরাবর একটা কাঠের পার্টিশন। তার উপরের দিকটা কাচের। এখানেই কাচের অন্যদিক দিয়ে দেখা যাবে রজতকে অর্থাৎ বাবুকে। বসার একটা সোফা আছে। কাঁচের উলটোদিকে আধো অন্ধকার। একটা আলো জ্বললেও, ইচ্ছে করে যেন অন্ধকারকে কিছুটা জায়গা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

ওদের বসার কিছুক্ষণ বাদে উলটোদিকে এসে বসল রজত। ওর চোখ-মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত।

কাচের মাঝে একটা মাইক্রোফোন আছে। তাই কথা বলতে হলে জোরে বলার দরকার হয় না।

—কেমন আছ তোমরা!— রজতই প্রথম উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল।

ওদের গলা আনন্দে-আবেগে অবরুদ্ধ হয়ে এসেছিল। ওরা তা-ই কিছু বলতে পারল না সঙ্গে সঙ্গে।

বাবু ফের বলে উঠল, মা, তুমি কিন্তু বুড়িয়ে গেছ। সব চুল পেকে গেছে।

অনীতা একটু সামলে ভারী গলায় বলে উঠল, তা বয়স হচ্ছে, বুড়িয়ে যাব না! তুইও তো একেবারে বদলে গেছিস। রোগা হয়ে গেছিস। চুলের আবার কীরকম কায়দা হয়েছে। দাড়ি রেখেছিস বাবার মতো।

—বাবা কিন্তু একই রকম আছে।

হেসে উঠল দেবাশিসবাবু।

অনীতা ছদ্মরাগ দেখিয়ে বলে উঠল, এই, এক নম্বর বাবার সাপোর্টার। বানিয়ে বানিয়ে বলা হচ্ছে। বাবা আমার থেকেও বেশি বুড়িয়ে গেছে। তবে বাবা এখনও খুব অ্যাকটিভ। সারাদিন যা ব্যস্ত থাকে। অফিস, তারপরে নানান জায়গায় যাওয়া। আমার আর কী কাজ! এবারে তুই তো চাকরি জয়েন করবি। ব্যাঙ্গালোরে চাকরি পেয়েছিস শুনেছি। কবে যেতে হবে?

—এক মাস বাদে। তবে ভাবছি, দেশে থাকব না। আমেরিকা চলে যাব। আমার ডেটা সায়েন্স নিয়ে কাজ করার ইচ্ছে আছে। ভালো একটা অফার পেয়েছি একটা ক্যালিফোর্নিয়া বে-সড স্টার্ট আপ-এর কাছ থেকে।

—সেটা আবার কী!

—ও তুমি বুঝবে না মা।

—আমি তোর মা, বুঝব না, মানে! ঠিক বুঝব। ঠিক করে বোঝা।

ওরা কথা বলতেই থাকল। কত কথা জমে গেছে এতদিনে।

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই নির্ধারিত আধ ঘণ্টা শেষ হয়ে গেল। একটা লোক এসে দাঁড়াল রজতের পিছনে। আর যে ঠিক এক মিনিট বাকি, সেটা নির্দেশ করে আবার সরে গেল। তার মানে আবার ঠিক এক মিনিট বাদেই হারিয়ে যাবে রজত।

অনীতার চোখে জল এসে গিয়েছিল। মাঝের কাচের উপরে হাত রেখে বলে উঠল, তোকে ভারী ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করে। কত বড়ো হয়ে গেলি। কিন্তু এত কম সময় দেখার সুযোগ পাই। ইচ্ছেমতো দেখাও করা যায় না।

রজত উঠে দাঁড়িয়েছে— আর সময় নেই, মা। এবারে যেতে হবে। ভালো থেকো তোমরা। আবার কয়েক মাস বাদে দেখা হবে।

দেবাশিসেরও চোখে জল এসে গিয়েছিল। বলে উঠল, ভালো থাকিস বাবু। সাবধানে থাকিস। কী করছিস, মাঝেমধ্যে খবর পাই। কিন্তু কথা বলা তো আর যায় না!

রজত কাচের উলটোদিকে দাঁড়িয়ে একবার কাচে হাত দিল, ঠিক যেখানে অনীতা হাত রেখেছিল, তার উলটোদিকে। যেন মাঝে কোনো কাচ নেই। যেন মা-র হাতকেই ছুঁয়েছে।

তারপরে ফের বলে উঠল, আমি সব সময় তোমাদের সঙ্গেই আছি। এই তো আবার কয়েক মাস বাদেই দেখা হবে।

ওর চোখ যেন ছলছল করে উঠল।

তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

দেবাশিসবাবু ও অনীতা বসেই রইল আরও কিছুক্ষণ। দুজনের চোখেই জল।

আবার কতদিন বাদে দেখা হবে। তার মধ্যে কত কিছু হতে পারে। ততদিন ওরা বেঁচে থাকবে কি না কে জানে! কিন্তু তার আগে দেখা করা যাবে না। সেরকমই এগ্রিমেন্ট ছিল। মাঝের সময়টা কম করালে যে ভালো হত এখন সেটা ওরা বেশ বুঝতে পারে।

কিন্তু তাতে আরও অনেক খরচ বেশি পড়ত। তা ছাড়া ওরা সেটা রেকমেন্ডও করে না। কিছুটা দূরত্ব নাকি রাখতেই হয়। সময় এবং স্পেসে।

এমনিতেও দেবাশিস যা রোজগার করে, তার একটা বড়ো অংশ চলে যায় এই ভার্চুয়াল রিয়ালিটি সংস্থার কাছে রজতকে এভাবে দেখার জন্য।

ওরা আরও খানিকক্ষণ বসে থেকে উঠে দাঁড়াল।

অনীতা বলে উঠল, কী ভালো হত, যদি বাবুকে একবার ছুঁয়ে দেখতে পারতাম। কতদিন ছেলেটাকে ভালো করে দেখিনি।

বলে আবার স্বগতোক্তি করে উঠল, তবে ছেলেটা যে ভালো আছে, সেটাই আসল। ভালো চাকরিও পেয়েছে বলল আমেরিকায়।

দেবাশিসবাবু বলে উঠল, আমাদের ছেড়ে একদম একা থাকতে পারত না, মনে পড়ে? আর এখন। আবার আমেরিকা যাবে নাকি!

—কে যেতে দিচ্ছে ওকে আমেরিকা! আমি বোঝাব যাতে ও আমেরিকা না যায়। কী দরকার অতদূরে যাওয়ার? —একটু থেমে ফের বলে উঠল অনীতা, আচ্ছা, ওকে কোনোদিন বাড়িতে নিয়ে আসা যায় না!—অনীতা প্রশ্নটা করেই চুপ করে গেল। কারণ উত্তরটা ওর জানা। ওদের দুজনেরই জানা।

দেবাশিস খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ফের বলে উঠল, এই যে এটুকু পেয়েছি, তা-ই বা কম কীসে! তবে ওকে তো আর আমরা এর থেকে কাছে পেতে পারি না।

চুপ করে রইল ওরা। তারপরে দুজনের অচেনা দুটো ছায়া যেন এগিয়ে গেল গাড়ির দিকে।

গাড়িতে উঠে অনীতা কাঁদতে শুরু করল। দেবাশিসের চোখেও জল।

দশ বছর আগে স্কুলে ক্লাস সিক্সে পড়ার সময় রজত হঠাৎ মারা যায়। স্কুলে খেলার সময় অ্যাক্সিডেন্টে মাথায় চোট পেয়েছিল রজত। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় পথেই মৃত্যু হয়। একটা দিন, সেই একটা দিন সব কিছু উলটে-পালটে দিয়ে চলে গিয়েছিল। বাড়ির বাইরে আঁকা একটা চন্দনের আলপনার যেরকম অবস্থা হয় ঝড়বৃষ্টির রাতে, ঠিক সেরকমই।

সেই মুহূর্তেই সবকিছু যেন থমকে গিয়েছিল ওদের। হারিয়ে গিয়েছিল বেঁচে থাকার সব উদ্দেশ্য। অনীতা শোকে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। কারো সঙ্গে কথা বলত না বেশ কিছুদিন। এমনকী দেবাশিসও আত্মহত্যার কথাই ভেবেছিল। ঠিক সেই সময় এই সংস্থার কথা জানতে পারে ওরা।

রজত বড়ো হলে ঠিক কীরকম দেখতে হবে, ঠিক কীভাবে হাঁটবে-চলবে,কীভাবে কথা বলবে, কী কাজ করতে পারবে, ঠিক সে অনুযায়ী ওকে সামনে নিয়ে আসে এই সংস্থা। যা হতে পারেনি রজত, কিন্তু বেঁচে থাকলে যা হতে পারত, সেই সম্ভাবনার উপরে দাঁড়িয়ে ওরা রজতকে যেন ফের জীবন দেয়।

রজতের উপস্থিতি এখন শুধু এই ভার্চুয়াল জগতে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের সাহায্য নিয়ে ও বড়ো হলে ঠিক কীরকম হত, সে গণনার উপরে আজ ওর জীবন দাঁড়িয়ে আছে। হয়তো, হতে পারত এসব সম্ভাবনার উপরে দাঁড়িয়ে আছে ওর আজকের এই উপস্থিতি।

এই রজত যে ওদের 'বাবু' নয়, সেটাও এখন ভুলে গেছে দেবাশিস, অনীতা। বলা যায় চারদিকের বাস্তবের থেকেও ওদের কাছে বেশি সত্যি রজতের এই উপস্থিতি, রজতের এই অবাস্তবের জগৎ।

শুধু ওরা রজতকে কাছে পায় না। তবু এই যে পাওয়া, এটাই বা কম কীসের!

গাড়ি স্টার্ট করার সময় অনীতা ফের বলে উঠল, আচ্ছা, মেয়েটার নাম যেন কী ছিল! বেশ মেয়েটা।

—ধুর, তোমার সেই ওয়ান ট্র্যাক মাইন্ড। দেখো, ছেলে অলরেডি কার সঙ্গে প্রেম করে বসে আছে। আমার ছেলে না! —বলে মুচকি হাসল দেবাশিস।

৯ সেপ্টেম্বর ২০২১

কেনিলওয়ার্থ, ইংল্যান্ড

বৃহৎচঞ্চু

১

—মনে হয় না আজ স্যার আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারবে। যেরকম ব্যস্ত আছেন।

অনিলিখার জন্য দরজা খুলেই গণেশ বলে উঠল।

গণেশের যথারীতি অফিসের পোশাক—সাদা শার্টের উপরে লাল টাই, কালো স্যুট। দেখলেই মনে হয়, এই বুঝি কোনো কোম্পানির বোর্ড মিটিং থেকে বেরিয়ে এসেছে।

এটা যে কলকাতার বাইরে মফসসলের একটা বাড়ি, যেখানে গণেশ বিজ্ঞানী মিস্টার পাইয়ের আপ্তসহায়ক, সেটা গণেশকে দেখে বোঝার কোনোরকম উপায় নেই। এটাই ওর অভ্যেস। এসব পোশাক পরলে নাকি কর্মদক্ষতা বাড়ে।

কলকাতা থেকে অনেক দূরে কল্যাণগড়ে অনিলিখা এসেছে মিস্টার পাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে। সেটা জানার পরে কেউ দরজা খুলেই পরিচিত অতিথিকে এরকম কথা বলে না। কিন্তু গণেশের পক্ষে এ ধরনের কথা আদৌ অস্বাভাবিক নয়।

অনিলিখা অবশ্য এত সহজে দেখা না করে ফিরে যেতে রাজি নয়। বিশেষ করে মিস্টার পাইয়ের এই সেক্রেটারি-র কথা শুনে তো নয়ই। মুশকিল হল, মিস্টার পাই কোনো মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন না। বাড়ির ফোনও গণেশই আগে ধরে। সেজন্য এই রিস্কটা না নিয়ে কোনো উপায় থাকে না।

অনিলিখা গণেশকে ভালোই চেনে। লোকটা এমনিতে বেশ সাদাসিধে ভালোমানুষ হলেও মনে করে কারো আসা মানেই মিস্টার পাই—এর সময় নষ্ট,আর কিছুটা সময় নষ্ট মানেই মিস্টার পাইয়ের আরেকটা বড়ো আবিষ্কার থেকে পৃথিবীকে বঞ্চিত করা।

মুচকি হেসে অনিলিখা গণেশকে বলে ওঠে—ঠিক আছে। অনেকদিন দেখা হয়নি মিস্টার পাইয়ের সঙ্গে। এতদূর এসেছি যখন, একটু বসে যাই। তোমার সঙ্গেই না হয় দেখা হল।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভেতরে এসে বসুন। আমি স্যারকে অবশ্যই খবর দিচ্ছি। স্যার গত কয়েকদিন ধরে এত ব্যস্ত যে নাওয়া-খাওয়ার পর্যন্ত সময় নেই। এই তো অবিনাশবাবু গতকাল তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করে শেষে গজগজ করতে করতে চলে গেলেন।



—কেন কী ব্যাপারে এত ব্যস্ত?

—সে এক টপ সিক্রেট এক্সপেরিমেন্ট। আমি নিজেও ভালো করে জানি না।

অবশ্য জানলেও যে গণেশ সে ব্যাপারে কিছু বলত না, সেটা অনিলিখা ভালো করেই জানে। অনিলিখা তবু একটু উসকে দেয় জানার জন্যে— তা তুমি জানো না তো, কে আর জানবে?

—ওই, ওই যে লোহার বাক্সটা জুটেছে ইদানীং। লিও। লিওকে নিয়েই দিনরাত কাজ করছেন এই গত দেড় মাস ধরে। দুজনেরই ঘুমের দরকার হয় না। আমার থেকে এখন লিওই বেশি আপনার। — দীর্ঘশ্বাস ফেলল গণেশ।

লিওকে অনিলিখা ভালো করে চেনে। মিস্টার পাইয়ের হাতে তৈরি বুদ্ধিমান রোবট লিও। এরকম অসামান্য রোবট খুব কমই দেখেছে অনিলিখা। লিও যে গণেশের থেকে অনেক ভালো

সহকারী, সে বিষয়ে অনিলিখার কোনও সন্দেহ নেই। মিস্টার পাইয়েরও নিশ্চয়ই সেই একই ধারণা।

সোফায় না বসে উঠে দাঁড়িয়ে মিস্টার পাইয়ের ড্রয়িং রুমের এক ধার দিয়ে সার-দেওয়া বুককেসগুলোর বই দেখতে দেখতে অনিলিখা বলে ওঠে—ঠিক আছে। দেখা না হলেও আমি কিছু মনে করব না। এমনিতেও আমার আগে জানিয়ে আসা উচিত ছিল। একদম না জানিয়ে এসে পড়েছি। আসলে বনগাঁতে আমার এক পিসি থাকেন। পথে ভাবলাম, মিস্টার পাইয়ের সঙ্গে একবার দেখা করে যাই। কোভিডের জন্য অনেকদিন ওর সঙ্গে দেখা হয়নি।

—না, না। ভালো করেছেন। অন্তত আমার সঙ্গে তো দেখা হল। স্যারকেও জানাচ্ছি। আপনার ব্যাপার আলাদা।—একটু যেন নরম হয়েই গণেশ বলে ওঠে, অবিনাশবাবু এসেছিলেন স্যারের কাছে কোভিডের ভ্যাকসিনের বিষয়ে জানতে। এখনও নেননি। আগেও এ ব্যাপারে স্যার বুঝিয়েছিলেন। অবিনাশবাবুর বদ্ধমূল ধারণা, এর জন্য নাকি মানুষ আবার আস্তে আস্তে বাঁদরে পরিণত হয়ে যাবে। একদল মানুষকে বাঁদরে পরিণত করাই নাকি এই ভ্যাকসিনের মূল উদ্দেশ্য। স্যার এসব গালগল্প শুনলেই খেপে যান।

হেসে বলে ওঠে অনিলিখা, সর্বনাশ! এসব কথা আবার অবিনাশবাবুর মাথায় কে ঢোকাল। অবিনাশবাবু, মানে প্রতিবেশী সেই মোটাসোটা লম্বা-চওড়া ভদ্রলোক, তা-ই তো! খুব মজার লোক।

—হ্যাঁ, সেই ভদ্রলোক। যাই, আমি এখন স্যারকে আপনার আসার খবর জানাই। দেখি, উনি কী বলেন।

অনিলিখা বেশ কয়েক মাস পরে মিস্টার পাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। আসলে কোভিডের জন্য আমেরিকায় আটকে পড়েছিল অনিলিখা। কলকাতায় ফেরার পরে এখনও দরকার না পড়লে তেমন কোথাও যায় না অনিলিখা।

মিস্টার পাইয়ের বাড়িতে এসে ঢুকলেই কীরকম যেন ভালো লাগে। কী দারুণ বই এর সংগ্রহ মিস্টার পাই এর। মনে হয় পুরো বাড়িটাই যেন লাইব্রেরি। বিশেষ করে দেশ-বিদেশের ও বাংলার কিশোর সাহিত্যের এমন সংগ্রহ এখন আর কোথাও দেখাই যায় না।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই মিস্টার পাইয়ের দেখা মিলল। হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন। দেখে মনে হয় বেশ ক্লান্ত। চোখ-মুখ বসে গেছে। গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। চশমার আড়ালে থাকা বড়ো বড়ো চোখেও ক্লান্তির ছাপ। চুল দেখলে বোঝা যায়, গত তিন মাস চুল কাটেননি।

—অনিলিখা! এ তো দারুণ সৌভাগ্য আমার! হঠাৎ করে! কোনো আর্জেন্ট কিছু?

—না, না, এই এদিকে এসেছিলাম। ভাবলাম, আপনার সঙ্গে একবার দেখা করে যাই।

—খুব ভালো করেছ। একেবারে রাতে খেয়ে যাবে।

—না, না। রাত করলে মা খুব চিন্তা করবে। তা ছাড়া আপনিও ব্যস্ত আছেন।

—উহু, ওসব কোনো কথা শুনছি না। এতদিন বাদে এসেছ, বিশেষ করে আজকের মতো দিনে, তোমাকে এত তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেব ভেবেছ! অনেক গল্প হবে। এখনকার বাংলা সাহিত্য নিয়ে আড্ডা হবে। বেশ কয়েকটা ভালো লেখা পড়লাম রিসেন্টলি। সবার সঙ্গে তো আর সেসব নিয়ে আলোচনা করা যায় না।

অনিলিখা আড়চোখে গণেশের দিকে তাকায়। গণেশের মুখ সামান্য গম্ভীর। পাশে দাঁড়িয়ে শুনছে। স্যার যে অযথা এরকম সময় নষ্ট করবে—এটা আদৌ পছন্দ হচ্ছে না, সেটা ওর মুখ দেখলেই বেশ বোঝা যায়।

—তা আজকের দিনে কী! কোনো ভালো ইন্টারেস্টিং খবর আছে মনে হচ্ছে?

অনেক সময় মিস্টার পাইয়ের কাছে এমন কিছু খবর থাকে, যা কোনো সংবাদপত্রেও পাওয়া যায় না।

মিস্টার পাইয়ের ঠোঁটের কোণে একটু মুচকি হাসি দেখা দিল।

তারপরে হঠাৎ করে বলে উঠলেন, আচ্ছা অনিলিখা, তোমার কী মনে হয়! আমাদের পৃথিবীর বাইরে আর কি কোনো বুদ্ধিমান প্রাণী আছে?

হঠাৎ করে এই প্রশ্নের অর্থ কী! এরকম কোনো প্রাণীর সন্ধান কি পেয়েছেন মিস্টার পাই?

অনিলিখা বলে ওঠে, থাকার যথেষ্ট সম্ভাবনা। এই লক্ষ-কোটি তারকাজগতের অসংখ্য গ্রহ-উপগ্রহের মধ্যে আর কোথাও যে কোনো প্রাণ নেই, সেটা ভাবা শক্ত। নিশ্চয়ই আছে। কোথাও না কোথাও আছেই।

—তবে তারা এখনও আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে না কেন?

—এর বেশ কয়েকটা কারণ থাকতে পারে। এক, হয়তো এত দূরে দূরে সেসব জগৎ ছড়িয়ে আছে যে তারা জানে যে যোগাযোগ করে কোনো লাভ নেই। যদি কোনো মেসেজ পাঠানোর এক লক্ষ বছর পরে তার জবাব আসে, সেই যোগাযোগের আর সার্থকতা কী? অথবা হয়তো তারা পৃথিবীতে বুদ্ধিমান প্রাণের উপস্থিতি সম্বন্ধে এখনও জানে না। অথবা তারা জানলেও যোগাযোগের কোনো প্রয়োজন পড়েনি, সেটাও হতে পারে।

—গুড। তবে তার বাইরেও আরও কিছু কারণ থাকতে পারে।

—হ্যাঁ, সে তো অনেক কিছুই হতে পারে। হয়তো তারাও ভয় পায় পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। ভাবে, কোনদিন না ওদের গ্রহ আক্রমণ করে বসে! অথবা হয়তো এরকম দূরে দূরে ছড়িয়ে-থাকা গ্রহে মেসেজ পাঠিয়ে উত্তর আসার আগেই সেই গ্রহে প্রাণ উধাও হয়ে

যাচ্ছে। পরমাণু যুদ্ধ, নিজেদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ, পরিবেশ দূষণ—এরকম কিছু কারণে সে গ্রহ হয়তো ইতিমধ্যেই ধ্বংস হয়ে গেছে, অন্য কারো সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে ওঠার আগেই।

—ভালো বলেছ। তবে আরও একটা কারণ থাকতে পারে। এবং সেটা আমাদের জন্য বেশ দুশ্চিন্তার। তবে সেটা এখনই বলছি না। পরে বলব।

—তা হঠাৎ করে এই বিষয়! কোনো কারণ আছে?

—হ্যাঁ, বলছি একটু বাদে। —বলে একটু থেমে মিস্টার পাই ফের বলে উঠলেন, চলো, তোমাকে আমার ল্যাবে একটু নিয়ে যাই। ওখানে গিয়েই বলব। বুঝবে, কেন এ কথা বলছি।

বলে মিস্টার পাই উঠে দাঁড়িয়ে ড্রয়িং রুম থেকে বেরিয়ে করিডোর দিয়ে ল্যাবের দিকে এগিয়ে গেলেন। পিছন পিছন অনিলিখাও এগোয়।

মিস্টার পাইয়ের ল্যাবটা বিশাল। ওর বিশাল বাড়ির একদম অন্য প্রান্তে। এমন হরেকরকম যন্ত্র খুব কম জায়গায় দেখেছে অনিলিখা। যতবারই এসেছে, প্রত্যেকবারেই নতুন নতুন অনেক যন্ত্র দেখেছে। তার মধ্যে বেশ কিছু বিশ্বের উন্নততম ল্যাব ছাড়া কোথাও নেই। অনেক যন্ত্র অনিলিখার কাছেও অচেনা। মিস্টার পাইও কিছু নিজে হাতে তৈরি করেন।

ল্যাবের ভেতরে আরেকটা বিশাল কাচের ঘর। সেখানে ল্যাবের এককোণে লিও দাঁড়িয়ে আছে। গণেশ যতই লোহার বাক্স বলুক-না কেন, লিওকে দেখে যে ও মানুষ নয়, সেটা বোঝার কোনো উপায় নেই। মনে হয় বছর কুড়ির ভদ্র শিক্ষিত ছেলে। এটা আগে অনিলিখা দেখেনি। সেই কাচের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে লিও যেন কী সব করছে।

আরও কাছে এগিয়ে এল ওরা। কাচের ঘর থেকে নানান বিচিত্র রকমের আওয়াজ হচ্ছে। কাচের ঘরের মধ্যে কিছুটা অন্ধকার থাকায় ভেতরের কিছু ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে, অনেক কিছুই যেন হচ্ছে কাচের ঘরের মধ্যে।

মিস্টার পাই এবারে মৃদুস্বরে লিওকে নির্দেশ দিলেন, ঘরের ভেতরের আলোটা জ্বালাও।

লিও একটা হালকা আলো জ্বালানোর সঙ্গে সঙ্গে কাচের ঘরের ভেতরের আশ্চর্য সব কর্মকাণ্ড চোখের সামনে ধরা পড়ল। কাচের বাক্সটার উচ্চতা বারো ফুট। দৈর্ঘ্য-প্রস্থে প্রায় কুড়িফুট মতো হবে। একটা পাইপের মধ্যে দিয়ে সেই কাঁচের বাক্সের মধ্যে ছোটো পাথরের নুড়ি এসে ঢুকছে। ওই কাচের বাক্সের মধ্যে ঢোকার পরে সেই নুড়ি ছোটো ছোটো বিস্ফোরণে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। সেসব ধূলিকণা বাতাসে এসে মিশছে। তারপর তীব্র বেগে ঘুরপাক খাচ্ছে ঘরের মধ্যে।

—ওটা কি 'পার্টিকল অ্যাকসিলারেটর'? এত ছোটো? —কাচের ঘরের মধ্যে রাখা একটা ছোটো যন্ত্রের দিকে লক্ষ করে অনিলিখা বলে উঠল।

—হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। ওটা দিয়ে 'চার্জড প্রোটন' ওই ধুলোর কণার উপরে নিক্ষেপ করা হচ্ছে।

—আপনার তৈরি এই 'পার্টিকল অ্যাকসিলারেটর'?

—পুরোটা নয়, কিছু অংশ। আচ্ছা, ওই নীচের পাত্রটা লক্ষ করো।

অনিলিখা লক্ষ করল, নীচে রাখা একটা ছোটোপাত্রে সামান্য জল জমেছে। কিন্তু মিস্টার পাই কী করছেন এসব দিয়ে? কী হচ্ছে এখানে?

লিওকে আগেও একবার দেখেছে। কিন্তু লিও এখন এতটাই ব্যস্ত যে একবার 'হ্যালো অনিলিখা' বলে তারপরেই আবার নিবিষ্ট হয়ে কাচের ঘরের পাশে রাখা একটা কন্ট্রোল সেন্টারে কী সব সুইচ ঝড়ের বেগে একটার পর একটা টিপে যাচ্ছে। ঘরের মধ্যের অবস্থা দেখে যেন সেটা ও করে যাচ্ছে।

এত দ্রুত নিয়ন্ত্রণ লিওর মতো রোবটের পক্ষেই সম্ভব।

—কিন্তু এসব কী? অনিলিখা আবার অবাক হয়ে বলে উঠল।

—চলো, ড্রয়িং রুমে গিয়ে বলছি। ব্যাপারটা যতটা সরল করে বলা যায়।— বলে মিস্টার পাই আবার ফিরে চললেন ড্রয়িং রুমের দিকে।

ড্রয়িং রুমের সোফায় বসেই মিস্টার পাই বলে উঠলেন, বহু বছর ধরে আমার একটা প্রশ্ন ছিল। কীভাবে জল এল পৃথিবীতে? কীভাবে প্রথম সমুদ্র সৃষ্টি হল? শুধু আমার নয়, বিশ্বের সব বিজ্ঞানীর কাছেই এই প্রশ্নের কোনো উত্তর জানা নেই।

অনিলিখা বলে উঠল, হ্যাঁ, তা ঠিক। এখনও সে প্রশ্নের কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি। শুরুতে যখন পৃথিবীর সৃষ্টি হল, তখন সূর্যের যা প্রতাপ, যা তাপ, তখন নিশ্চয়ই পৃথিবীও খুব গরম, গ্যাসীয় পিন্ড ছিল।

—একজ্যাক্টলি। তাহলে সেখানে জল এল কোথা থেকে বলো তো?

—হয়তো শুরুতে কোনো একটা বড়ো বরফের ধূমকেতু এসে পড়েছিল পৃথিবীতে। সেখান থেকেই শুরু।

—অবশ্যই। সেটা একটা পসিবিলিটি। কিন্তু সমস্যা হল, শুধু সেরকম ধূমকেতুর থেকে জল এলে পৃথিবীর জল অন্যরকম হত। ধূমকেতুর বরফের 'আইসোট্রপিক ফুটপ্রিন্ট' থেকে বোঝা যায়, সেখানকার জলে ডিউটিরিয়াম বা সাধারণ হাইড্রোজেনের দ্বিগুণ ভরবিশিষ্ট ভারী হাইড্রোজেন গ্যাস অনেক বেশি থাকে। আমাদের পৃথিবীর জলে ডিউটিরিয়াম প্রায় থাকেই না। তবে, তার বাইরেও এক বিশেষ ধরনের কার্বনসমৃদ্ধ 'সি টাইপ' অ্যাস্টরয়েড বা গ্রহাণুর থেকেও জল আসার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সেখানেও একই সমস্যা। সেক্ষেত্রেও আমাদের জলে

অনেক বেশি ডিউটিরিয়াম থাকত। অর্থাৎ শুধু ধূমকেতু বা 'সি টাইপ' গ্রহাণু থেকে জল এলে সেই জল অন্যরকম হত। অন্য কিছুও ছিল এই জলের রহস্যের পিছনে। কিন্তু সেটা কী? সেটাই বড় প্রশ্ন বা মিসিং লিঙ্ক।

ফের বলে উঠলেন মিস্টার পাই, নিশ্চয়ই তাহলে এই ধূমকেতু বা গ্রহাণুর জলের সঙ্গে এমন কোনো জল মিশেছিল যেখানে ডিউটিরিয়াম খুব কম ছিল, এখানকার জলের থেকেও কম। সব হয়তো মিলেমিশে আমাদের বিশ্বের জল হয়েছে। এটাই এই রহস্যের একমাত্র সমাধান হতে পারে, সেটা জানতাম।

কিছুদিন আগে আমার এক জাপানি বিজ্ঞানী বন্ধু আসাহির কাছে প্রথম শুনলাম এক নতুন ধরনের গ্রহাণুর ধুলোর কথা। ওদের পাঠানো মহাকাশযান 'হায়াবুসা'র মাধ্যমে এই নতুন ধরনের গ্রহাণুর অতিসূক্ষ্ম ধুলোর সন্ধান পাওয়া গেছে। ওরা তার নাম দেয় 'ইটাকাওয়া'। আমার কেমন যেন সন্দেহ হয়।

ওকে ওই ধূলিকণা পাঠাতে বলি আমার পরীক্ষার জন্য। ওর পাঠানো ধুলোর কণা বিশ্লেষণ করে দেখি, যা ভেবেছিলাম, ঠিক তা-ই। ওই ধূলিকণাতেও জল আছে। আর শুধু আছে না, শুধুই সাধারণ জল। তাতে কোনো ডিউটিরিয়াম নেই। কিন্তু সেই সাধারণ জল ওই ধূলিকণায় এল কী করে? মহাবিশ্বে কোনো কিছুতে এরকম সাধারণ জল থাকা সম্ভব নয়।

আমি ব্যাপারটা নিয়ে পরীক্ষা শুরু করি আমার ল্যাবে।

এখন বুঝেছি, সেটা হয়েছে সূর্য থেকে আসা সৌরঝড়ে থাকা চার্জড পার্টিকল, মূলত প্রোটনের সঙ্গে ওই ধূলিকণার ধাক্কার জন্য। 'চার্জড প্রোটন' এই ইটোকাওয়া গ্রহাণুর অতিসূক্ষ্ম ধূলিকণার সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছে ও তাদের চরিত্রে পরিবর্তন এনে সাধারণ জল তৈরি করেছে। এসবই আমি আমার ল্যাবে অবশ্য প্রমাণ করেছি।

প্রথমে একটা প্রোটন এসে ধাক্কা মেরে এই ধূলিকণার মধ্যে থাকা জলে 'হাইড্রক্সাইড' আয়ন তৈরি করেছে। তার অনেক পরে আরেকটা প্রোটন একইভাবে একই লক্ষ্যে ধাক্কা মেরে ডিউটিরিয়ামমুক্ত সাধারণ জল তৈরি করেছে, যা তার পরে ওই ধূলিকণার মারফত লক্ষ লক্ষ বছর ধরে নেমে এসেছে পৃথিবীর বুকে।

এতদিনে সে রহস্য সমাধান করতে পেরেছি। সেই জলই তৈরি হতে দেখলে আমার ল্যাবে। পুরো প্রসেসটাই আমার ওই ছোটো কাঁচের ঘরের মধ্যে হচ্ছে। কিন্তু সমস্যা কোথায় জানো?

এটা র‍্যানডমভাবে করা যেতে পারে না। এসব জটিল প্রসেস যেন কেউ নিয়ন্ত্রণ করেছে, এখনও হয়তো করছে, ঠিক যেমন আমার ল্যাবে আমরা করছি। কিন্তু এই মহাবিশ্বে এটা কে

করল পৃথিবীতে জল তৈরির জন্য! যেখানে সৌরঝড় পৌঁছোয়, সেখানেই কিন্তু এভাবে জল তৈরি করার সম্ভাবনা থাকতে পারে। প্রাণও তৈরি হতে পারে। কিন্তু পুরো প্রসেসটা খুব নিখুঁতভাবে পরিচালিত না করলে, সাধারণ জল সম্ভব নয়। সেটা হলে অন্য অনেক গ্রহেও প্রাণ থাকতে পারত।

—মানে? আপনি কী বলছেন, এটা কেউ পরিচালিত করছে? সেজন্য এই সৌরজগতের মধ্যে শুধু পৃথিবীতে এই জল আছে!

—সেটাই চিন্তার, অনিলিখা হয়তো আমরা সবাই একটা ল্যাবের মধ্যে বসে আছি। আমাদের উপরে কেউ সারাক্ষণ নজর রাখছে। হয়তো এই পৃথিবী, এই পরিবেশ, এই জলবায়ু সবই তার সৃষ্টির ল্যাব।

—এটা কিন্তু ভাবা বেশ শক্ত— হেসে উঠে অনিলিখা বলে ওঠে, শুধু সায়েন্স ফিকশনেই সম্ভব।

মিস্টার পাই ফের বলে উঠলেন, হতে পারে। পুরোটাই হয়তো অলীক কল্পনা। আরেকটা কথা বলি। এই যে নাসা থেকে কয়েক মাস আগে মহাবিশ্বে একটা টেলিস্কোপ পাঠানো হয়েছিল। শুরুর দিকে বেশ কাজ করছিল। তারপর কয়েকদিন আগে শুনলাম, সেটার সঙ্গে নাকি সবরকম যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেছে। সেটা যেভাবে কাজ করছিল, তাতে সৃষ্টির সব রহস্য বোঝা যেত। কে বলতে পারে, হয়তো এমন কেউ আছে, যে চায় না আমরা সেটা জানতে পারি।

চুপ করে রইলেন মিস্টার পাই। অন্যমনস্ক হয়ে অনিলিখার জন্যে কিছুক্ষণ আগে নিয়ে আসা শিঙাড়াটা প্লেট থেকে তুলে নিয়ে নিজেই খেতে খেতে ফের বলে উঠলেন, কিন্তু আমি যে সেই সৃষ্টির রহস্য জেনে গেছি, সেটা জানলে তারা নিশ্চয়ই খুশি হবে না। একদিক থেকে আমরা এটা জেনে গেলে আমরাও অন্য গ্রহে জল তৈরি করতে পারব। প্রাণ তৈরি করত পারব। আমরাই হয়ে উঠব ঈশ্বর।

এবারে শুকনো মুখে গণেশ এগিয়ে এল। —স্যার, আপনাকে একটা কথা বলা হয়নি। আপনার উপরে নাকি একজন কেউ নজর রাখছে। অবিনাশবাবু এ কথা বলতে এসেছিলেন গতকাল। একজন লোক, তার কান নাকি শেয়ালের মতো। সে নাকি গত পরশু এসে দূর থেকে আমাদের ল্যাবের দিকে তাকিয়ে ছিল।

—অবিনাশবাবু আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন বুঝি?

অনিলিখা বুঝল, অবিনাশবাবুর আসার কথা গণেশ মিস্টার পাইকে আদৌ জানায়নি।

—হ্যাঁ, স্যার, আমি ওর অন্য সব কথার মতো এটাও আজগুবি কথা ভেবে উড়িয়ে দিয়েছিলাম। এখন মনে হচ্ছে, ওটা হয়তো কোনো অ্যালিয়েন ছিল। বা এমন কেউ, যে আপনার এই রিসার্চের খবর পেয়েছে।

—ধুর! আরে ও হল মতি মল্লিক। মতির কানটা কীরকম না! ওকে আমি একটা ফাউন্টেন পেন কিনব বলে কিছু পেন নিয়ে আসতে বলেছিলাম। বলেছিলাম ল্যাবে আলো জ্বলা মানে আমি ব্যস্ত থাকব। ডিস্টার্ব না করে অন্য সময়ে আসতে। সে ব্যাপারেই এসেছিল নির্ঘাত।

অনিলিখা ফের বলে উঠল, তা আপনি কী ভাবছেন এই আবিষ্কার নিয়ে?

—আসলে এটা পুরোটাই এত সূক্ষ্ম গবেষণা, অবজার্ভেশন আর কন্ট্রোলের উপরে দাঁড়িয়ে আছে যে আমি পুরোটা লিখে রাখছি। বলতে পারো, পুরো প্রসেসটা আমাকে প্রমাণ করতে হবে। তারপরে ইচ্ছে আছে, এক-দু-মাসের মধ্যেই এ বিষয়টা কোনো একটা সায়েন্স কনফারেন্সে জানাব। তখন সারা বিশ্ব জল রহস্যের সমাধান করতে পারবে।

কথার মাঝে বাধা পড়ল। বাইরে কলিং বেল।

—স্যার, অবিনাশবাবু এসেছেন, দরজা খুলে দেব?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, অবশ্যই।

খানিক বাদে অবিনাশবাবু এলেন। শুধু একা নয়, সঙ্গে ডান হাতে একটা খাঁচা ধরে আছেন। যদিও খাঁচাটাকে একটা লাল কাপড় দিয়ে মুড়ে রেখেছেন। তার ভেতরে কী আছে, তা দেখা যাচ্ছে না।

সোফায় বসেই বলে উঠলেন, আপনার জন্যে এবারে কল্যাণগড় ছাড়তে হবে দেখছি। কোনো খোঁজখবর নেই। দু-দিন এসে ফিরে গেলাম। এখানকার নতুন ও.সি. আলিম সাহেব আসার পর থেকেই আপনার উপরে কড়া নজর রাখছেন। আমাকেও একবার থানাতে ডেকে এনে আপনার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদও করেছেন। ওর আগের ও.সি. দেবব্রতবাবু, তাকে তো আপনিই জঙ্গলমহলে ট্রান্সফার করে দিলেন।

—আমি! সে কী, আমি আবার তার কী করলাম!

—আপনি নয়তো কী? আপনার পোষা পঙ্গপাল।

—ওহো! সেই পঙ্গপালকাণ্ডের জন্য ওকে চলে যেতে হল।

—হ্যাঁ, নয়তো কী? কী কাণ্ড করেছিলেন! আপনার আবিষ্কারের বদান্যতায় মুখ্যমন্ত্রীর উপরে পঙ্গপালের দল সেবারে আক্রমণ করল। আপনাকে হাতের কাছে পেলে যে মুখ্যমন্ত্রী কী করতেন কে জানে!

—যা-ই হোক। আপনার খবর কী! আর আপনার সঙ্গে ওতে কী আছে?

—আরে ওটা দেখানোর জন্যেই তো এসেছিলাম। —বলে ভদ্রলোক খাঁচার উপরে থেকে চাদর সরিয়ে নিলেন।

তার মধ্যে ভারী অদ্ভুতদর্শন এক পাখি।

ফের বলে উঠলেন, এরকম পাখি কোনোদিন দেখেছেন! সেজন্যেই আপনাকে দেখাতে এনেছিলাম। কেউই এর নাম বলতে পারল না। আপনি যদি পারেন। আপনার অনেক অকাজের বিষয়ে অনেক জ্ঞান আছে দেখেছি। সেদিন আমি বিলুদের পুকুরের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। ওখানেই পাখির বাচ্চাটাকে দেখলাম। অদ্ভুত পাখি। দেখি, আমার পিছু পিছু আসছে। দেখতে সেই সত্যজিৎ রায়ের গল্পের 'বৃহৎচঞ্চু'র মতো, নিয়ে এলাম। বিনা পয়সায় একটা ভালো পাখি হল।

অনিলিখা ও মিস্টার পাই খাঁচার পাশে বসে কাছ থেকে দেখল। সত্যি অদ্ভুত দেখতে। লম্বা নীল রঙের গলায় লাল রঙের ছোপ। লম্বা ধারালো ঠোঁট। মাথার উপরে যেন একটা হাড় উঠে আছে অনেকটা শিংয়ের মতো দেখাচ্ছে। হাইটে দেড় ফুট মতো হবে। পাখিটার চোখ দেখে কিন্তু হিংস্র মনে হয় না।

—এ তো দেখে অনেকটা ক্যাসুয়ারির মতো মনে হচ্ছে। কিন্তু ঠিক ক্যাসুয়ারির মতোও নয়, ক্যাসুয়ারি দেখতে অনেক হিংস্র হয়। —অনিলিখা বলে উঠল।

—খুব শান্ত পাখি। সবার সঙ্গে চটপট বন্ধুত্ব করে ফেলে। তবে এটা একেবারেই বাচ্চা। দু-দিন আগে যখন এনেছিলাম, তখন এর সাইজ এর অর্ধেক ছিল। মনে হয়, আরও বড়ো খাঁচা লাগবে শিগগিরি।

—বলেন কী! এত তাড়াতাড়ি বড়ো হয়ে যাচ্ছে!

—হ্যাঁ, সেজন্যেই পাখিটা কী জানতে চাই। দাঁড়ান, পাখিটাকে খাঁচা থেকে বার করে দেখাচ্ছি।

—উড়ে যাবে না তো?

—আরে না, না। আমার বাড়িতে এই কদিন ছেড়েই রেখেছি। মাঝে মধ্যে উড়লেও, বা বাইরে গেলেও ঠিক আবার খাঁচায় ফিরে আসে। খুব ইন্টেলিজেন্ট চটপটে পাখি। —বলে অবিনাশবাবু খাঁচা থেকে পাখিটা বার করলেন। অনিলিখা পাখিটার পাশে বসে ভালো করে দেখল। পাখিটার গায়ে হাত দিতেও বিরক্ত যেন হল না।

—সত্যি, খুব শান্ত পাখি। গায়ে হাত দিলেও কিছু বলে না।

—বললাম না, খুব শান্ত পাখি। এ কদিনে বাড়ির লোক হয়ে গেছে। এমনকী আমার ঝগড়াটে পোষা হুলোটার সঙ্গেও বন্ধুত্ব করে ফেলেছে। অন্য সব পাখি দেখলে হুলোটা তেড়ে

যায়। এটা দেখি, হুলোটার লোম ঠোঁট দিয়ে চুলকে দিচ্ছে। আর হুলোটাও আরামে চোখ বুজে শুয়ে আছে। তা আমি পাখিটার নাম দিয়েছি বৃহৎচঞ্চু।

—বাহ, কিন্তু সত্যজিৎ রায়ের ওই গল্পের পাখিটার মতো আবার এটা না আপনার হুলোকে আক্রমণ করে।

—না, না, এর চোখটা কীরকম শান্ত দেখেছেন। এখানে ঘুরেফিরে বেড়াবে। দেখবেন। কী শান্ত পাখি। আবার বললেই খাঁচায় ফিরে আসবে।

পাখিটা সত্যি বেশ অদ্ভুত। শরীরের তুলনায় পা-টা আর ঠোঁটটা বেশ খানিকটা বড়ো, শিকারি পাখির মতো। একটা একটা করে পা ফেলে ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

বিভিন্ন কথার মাঝে অবিনাশবাবু মিস্টার পাইকে উদ্দেশ করে বলে উঠলেন, আপনি কী সব কাজ করে বেড়ান। গত পরশু দূর থেকে দেখলাম, একটা লোক আপনার বাড়ির উপরে লক্ষ রাখছিল।

—হ্যাঁ, সে খবর গণেশ আমাকে দিয়েছে। সেটা কিছু নয়।

—তা আপনি এখন কীসের উপরে কাজ করছেন, বলুন তো!

—ওই ধরুন জল তৈরির কল।

—জল তৈরি! এখানে কল্যাণগড়ের ট্যাঙ্কের জল এত ভালো। অন্য জলের কী দরকার! আপনি এসব আবোল-তাবোল পরীক্ষানিরীক্ষা করে বেড়াচ্ছেন। মশাই, আপনার সব আবিষ্কার একশো বছর পিছিয়ে আছে।

অনিলিখা পাশে বসে কথা শুনে মুচকি মুচকি হাসছিল। বলে উঠল, আপনি আছেন বলেই ভরসা। মাঝেমধ্যে দু-একটা ভালো আইডিয়া মিস্টার পাইকে দিতে পারতেন।

—দিই তো! আমার কথা শুনলে কবে বঙ্গসম্মান পেয়ে যেতেন। বলেছিলাম না?

কিন্তু ওর কথা শেষের আগেই অনিলিখা বলে উঠল, আচ্ছা, পাখিটা কোথায় গেল? তাকে তো দেখছি না।

সত্যি ঘরের মধ্যে আর বৃহৎচঞ্চু নেই। ভ্যানিশ!

ঠিক একই সঙ্গে ল্যাবের দিক থেকে একটা কিছুর যেন আওয়াজ এল। সবাই এগিয়ে গেল ল্যাবের দিকে। কী ব্যাপার! কিন্তু ল্যাবে ঢুকেই চমকে উঠল। বৃহৎচঞ্চু ল্যাবের মধ্যে উড়ছে। আর লিও যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো ওর দিকে তাকিয়ে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে। বৃহৎচঞ্চুউড়ে গিয়ে কাচের ঘরের পাশের ওই কন্ট্রোল সেন্টারের সুইচগুলোর উপরে এসে বসল।

লিও কীরকম ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে সরে দাঁড়াল। পাখিটা তারপর কনট্রোল সেন্টারের সুইচগুলো ঠোঁট দিয়ে ঠোকরাতে লাগল। দুটো সুইচ ধারালো ঠোঁট দিয়ে উপড়েও ফেলল।

হতভম্ব সবাই। অনিলিখা ও মিস্টার পাই ছুটে গেল পাখিটার দিকে। কিন্তু তার আগেই পাক খেয়ে পাখিটা সবার হতভম্ব চোখের সামনে আবার ল্যাব থেকে উড়ে বেরিয়ে গেল।

অবিনাশবাবু 'বৃহৎচঞ্চু' বলে ডাকতে ডাকতে পাখিটার পিছু পিছু ছুটে গেল। তার পিছু পিছু গণেশও। খানিক বাদে গণেশ ফিরে এসে বলে উঠল, রান্নাঘরের জানলা দিয়ে উড়ে বেরিয়ে গেল। অবিনাশবাবুও হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এসেছেন।

অবিনাশবাবু অবাক হয়ে বলে উঠলেন, কী হচ্ছে এসব! আপনার বাড়িতে এসব দেখে আমার পোষা পাখিও পাগল হয়ে যাচ্ছে। তা ছাড়া জানি না ওই লিও কী করেছে পাখিটার উপরে। এরকম শান্ত পাখি তা না হলে অশান্ত হয়ে ওঠে! কী ব্যাপার মিস্টার পাই?

মিস্টার পাইয়ের মুখ খুব গম্ভীর। কোনো উত্তর দিলেন না। লিও আবার ফিরে এসেছে কন্ট্রোল সেন্টারে। যেন সংবিৎ ফিরে পেয়েছে। কিন্তু এখন পাখিটা যা ক্ষতি করে দিয়ে গেছে, তাতে কী হচ্ছে কে জানে!

ঘরের ভেতর থেকে অন্যরকম সব আওয়াজ হচ্ছে। কিন্তু ভেতরে অন্ধকার থাকায় ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। কাচের ঘরের মধ্যে আলো জ্বালানোর পরে মিস্টার পাই কন্ট্রোল সেন্টারে কী সব করার চেষ্টা করলেন। মনে হল, সফল হলেন না।

হতাশায় কিছুক্ষণ বাদেই চিৎকার করে বলে উঠলেন, সব, সব নষ্ট করে দিয়েছে পাখিটা। পুরো গত ছ-মাসের কাজ নষ্ট। মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ।

তারপরে ফের বলে উঠলেন, এক্ষুনি, এক্ষুনি আমাদের বেরিয়ে যেতে হবে এখান থেকে। যেকোনো সময় কাচের ঘরটা ভেঙে যেতে পারে। কিছু জিনিস খারাপ হয়ে যাওয়ায় পুরো প্রসেসটা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে।

সত্যি তা-ই। কাচের ঘরের ভেতরে পাইপ থেকে গুলির মতো বেরিয়ে-আসা ছোটো ছোটো নুড়ি পাথর এখন আর গুঁড়ো না হয়ে সজোরে আছড়ে পড়ছে কাঁচের উপরে। একটু একটু করে কাচের কিছু অংশে ফাটল হচ্ছে। পার্টিকল অ্যাক্সিলারেটরটা থেকে যেন ধোঁয়া বেরোচ্ছে। সেটাও কাজ করছে না।

—আমাদের এক্ষুনি বেরিয়ে যেতে হবে। এখনই।

লিও তবু দাঁড়িয়ে কিছু একটা করতে কাচ্ছিল।

—বেরিয়ে এসো লিও। দেরি হয়ে যাবে। সুইচগুলো কাজ করছে না। এত কম সময়ে ঠিক করা যাবে না।

সবাই মিলে ছুটে ল্যাব থেকে বেরিয়ে এল। আসার এক মিনিট পরেই একটা বিস্ফোরণ হল। যেন একটা শক্তিশালী বোমার আওয়াজ। পুরো বাড়িটা কেঁপে উঠল। ল্যাবের দরজা বন্ধ থাকলেও প্রায় একই সঙ্গে শোনা গেল ঝনঝন করে কাচ ভেঙে পড়ার আওয়াজ।

কিছুক্ষণ বাদে ল্যাবে উঁকি মেরে দেখা গেল ল্যাবের ভেতরের পুরো কাচের ঘরটা ভেঙে পড়েছে। ল্যাবের মধ্যে চারদিকে ধোঁয়া। অনেক যন্ত্রপাতি ভেঙে গেছে। কিছু কিছু জায়গায় আগুন জ্বলছে।

দশ দিন পরে

মোবাইলে নাম্বারটা দেখামাত্র অনিলিখা ফোনটা ধরল। মিস্টার পাই।

—কেমন আছেন মিস্টার পাই? সব ঠিক আছে?— অনিলিখা জানে, উনি ভালো থাকতে পারেন না। যেরকম ক্ষতি হয়েছে সেদিন। তবু জিজ্ঞেস করতে হয়।

—আর ঠিক থাকি! অবিনাশবাবুর মতো প্রতিবেশী থাকলে যা হয়। ওর ধারণা, আমি কিছু নিষিদ্ধ বোমা তৈরির চেষ্টা করছিলাম। কী করছিলাম, কেন করছিলাম—এসব নিয়ে তারপর থেকেই বার বার পুলিশের যাতায়াত শুরু হয়ে গেল। তাদের প্রশ্নে আমি জেরবার। কী করে এসব ওদের বোঝাই।

—কিছু বুঝতে পারলেন, কেন হল এরকম?

—হ্যাঁ, ইচ্ছে করেই করা হয়েছে। তা না হলে এই ধ্বংস করাটাও এত চট করে কারো পক্ষে করা সম্ভব হত না। সবের মূলে ওই পাখিটা।

—ওরকম কোনো পাখি আছে বলে আমার জানা নেই। আমি আসার পরে বেশ কিছু জায়গায় খোঁজ নিয়ে দেখেছি। কোনো খোঁজ পাইনি। ওরকম পাখি কোথা থেকে এল হঠাৎ করে!

—আমিও কোনো খবর পাইনি ওই পাখিটার। অবিনাশবাবুর কাছেও ফিরে যায়নি ওই পাখি। যেমন হঠাৎ করে এসেছিল, সেরকম হঠাৎ করে উধাও। ওটা এখানকার নয়।

—মানে? পাখিটা কি অন্য কোনো অজানাজগতের!— প্রায় অসম্ভব একটা প্রশ্ন এখন মুখে আসতে সময় লাগল না।

চুপ করে থাকলেন মিস্টার পাই। প্রায় এক মিনিট নীরবতার পরে ফের বলে উঠলেন। —তবে আমার এই পরীক্ষা একেবারে ব্যর্থ হয়নি। আমার ধারণা প্রমাণিত হয়েছে। আমরা একা নই। আমরা পৃথিবীর সবাই বোধহয় কোনো একটা পরীক্ষার অংশ। যারা এসব করছে, তারা চায় না আমরা বিশেষ কিছু রহস্যের সমাধান এখনই করে ফেলি। এমন কিছু করে বসি, যাতে আমরা বুঝতে পারি, আমাদের নিয়ে কী করা হচ্ছে! আমরা গিনিপিগের জীবনযাপন করে

নিজেদের ভাবছি খুব বুদ্ধিমান। নিজেদের একমাত্র বুদ্ধিমান জীব বলে ভাবছি। জানি, আমার এই কথাটা কোনো স্বাভাবিক মানুষ ভাবতে পারবে না। কিন্তু এখন আমি নিশ্চিত, ওই পাখিটা কোনো উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছিল অবিনাশবাবুর মাধ্যমে। কিন্তু আসলে ওরা কারা? ওরা কি পৃথিবীতেই থাকে?

ফোনটা ছাড়ার আগে মিস্টার পাইয়ের দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনতে পেল অনিলিখা।

১৬ জানুয়ারি ২০২২

কেনিলওয়ার্থ, ইংল্যান্ড

অচেনা হাত

অনিলিখা খুব অন্যমনস্কভাবে জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। তারপর বলল, এরকম যদি হত যে, আমাদের বাঁ হাতটা যা করতে চায়, ডান হাতটা তাতে বাধা দেয়, বাঁ পা-টা যা করতে চায়, ডান পা-টা তার ঠিক উলটো করতে চায়, তাহলে কী সাংঘাতিক ব্যাপার হত তা-ই না?'

অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছে। আগে হলে বলতাম অকালবর্ষণ। এখন আর বলি না। প্রকৃতির এই খামখেয়ালিপনা দিনকে দিন যেন বেড়েই চলেছে। তা না হলে, পুজো গেল, এখনও এরকম বৃষ্টি!

অনিলিখা আমাদের দিকে মুখটা ঘুরিয়ে বলল, যা বৃষ্টি হচ্ছে, দরকারি কাজগুলো যে সারব, তার উপায় নেই। বৃষ্টিটা কমলেই বেরোত হবে।

—আরে, রোববারে এই বৃষ্টির দিনে আবার কেউ কাজের কথা ভাবে নাকি? চেয়ারে আধশোয়া অবস্থা থেকে সোজা হয়ে বসে বিশ্বজিৎদা বলে উঠল, তাও আবার কলকাতায় বসে! তা হঠাৎ করে কী একটা কথা যেন বলল অনি? বাঁ হাত আর ডান হাত। দু'হাতের মধ্যে বিরোধ! সেরকম আবার হয় নাকি? ছোটোদের একটা গল্প পড়েছিলাম, একটা কয়োটকে নিয়ে। খানিকটা এরকমই। শরীরের প্রত্যেকটা অঙ্গপ্রত্যঙ্গভাবে সে সবচেয়ে দরকারি। আর তা-ই নিয়ে নিজেদের মধ্যে বেজায় ঝগড়া। শেষে এজন্য কয়োটকে মরতে হয়েছিল। তা ঘটনাটা কী? একটু খুলে বলো তো!

—নাহ, সে কথা থাক। অন্য একদিন হবে, অনেক কাজ আছে—অনিলিখা ওঠার উপক্রম করল।

আমিও সবার সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলাম, কেন, আজকেই বলো-না! এরকম বৃষ্টির দিনেও যদি তোমার সময় না হয়, তবে আর কবে হবে? এমনিতেই তো তোমার দেখা আজকাল আর পাওয়াই যায় না, অনিলিখাদি! আজ এখানে, কাল সেখানে, বলো-না কী বলছিলে।

অনিলিখা চুপ করে বসে কী যেন ভাবল। ডান হাতে পরা ঘড়িটা একবার চট করে দেখে নিল। তারপর টেবিলের উপরে প্লেটে রাখা একটা পাঁপড়ভাজা হাতে তুলে নিয়ে কামড় দিয়ে বলে উঠল, এক বছর আগের কথা। তোদের মনে আছে বোধহয়, গত পুজোর ঠিক আগে ইতালি থেকে ফিরেছিলাম। দু-মাস মতো ছিলাম সেখানে। ইতালি বলতে আমরা সাধারণত রোম, পিসা, মিলান এসব জায়গাই বুঝি। আমি কিন্তু গিয়েছিলাম অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত

একটা শহরে। নাম জেনোয়া। খুব পুরোনো বন্দর শহর। কলম্বাসের জন্মস্থান। সমুদ্রপথে বাণিজ্যে প্রায় হাজার বছর ধরে একটা বড়ো ভূমিকা পালন করেছে এই শহর।

ওখানে পৌঁছোনোর পর প্রথম কয়েকদিন স্টেশন-লাগোয়া একটা হোটেলে ছিলাম। হোটেলটা ভালোই ছিল। কিন্তু দু-বেলা হোটেলের খাবার কি বেশি দিন ভালো লাগে! তাই এক-দেড় মাসের জন্য যদি কোনো ভালো ফ্ল্যাট ভাড়া পাওয়া যায়, তার সন্ধানে ছিলাম। কিছুদিন বাদে অফিসের কলিগ একটা বাড়ির খোঁজ দিল। অফিস থেকে এক মাইল হাঁটাপথ। বাড়িটা দেখে মোটামুটি পছন্দ হয়ে গেল। তারপরে বাকি দেড় মাস ওই ফ্ল্যাটেই ছিলাম।

বাড়িটা সম্বন্ধে বলার আগে তোদের জেনোয়া শহরের চরিত্রটা একটু বুঝিয়ে বলি। ইতালির অন্য পুরোনো শহরগুলোর মতো এখানেও পাথর দিয়ে বাঁধানো সরু সরু রাস্তা। রাস্তার মোড়ে মোড়ে থমকে দাঁড়িয়ে দেখার মতো পুরোনো দিনের বাড়ি। তাক-লাগানো স্থাপত্য। ছড়িয়ে-থাকা হলুদ, গোলাপি, কমলা বাড়ি। সবুজ আর নীল খড়খড়ির জানলা।

তা এই পুরোনো বাড়িগুলোর ভিড়ে এই বাড়িটাও দিব্যি মিশে যায়। অন্তত একশো বছর পুরোনো তো হবেই। বড়োরাস্তার উপর গেট। গেট থেকে ঢুকে ডানদিকে বাড়ির দরজা। সে দরজা পেরলেই চওড়া মার্বেলের সিঁড়ি উপরে উঠে গিয়েছে। পাশে একটা বহু পুরোনো দিনের লিফট। দুটো লোহার দরজা টানলে আর উপরে ওঠার সুইচটা কয়েকবার টিপলে সাড়া মেলে। হঠাৎ ঘড়াৎ করে আওয়াজ হয়। বোঝা যায় লিফট উঠতে শুরু করেছে। গতি দেখলেই বোঝা যায়, যে লিফটটা যিনি বসিয়েছিলেন, তাঁর জীবনে অন্তত কোনো তাড়া ছিল না। আমার ফ্ল্যাটটা দোতলায়। লিফটের দুটো গেট খুলে বেরিয়ে এলে বাঁদিক-ডানদিকে দুটো ফ্ল্যাট। বাঁদিকের ফ্ল্যাটটা ছিল আমার ওই দেড় মাসের আস্তানা।

তা বাড়িটার পুরোটাই কি ভাড়া দেওয়া ছিল?— জিজ্ঞেস করলাম।

—না, চারতলা বাড়ি। একতলাটা বাড়িওয়ালার নিজের। বাকি প্রত্যেক তলায় দুটো করে ফ্ল্যাট। সিঁড়ির দু-পাশে। আমার ফ্ল্যাটে ঢুকলেই সামনে ড্রয়িং রুম। বাঁদিকে একটা সরু প্যাসেজ চলে গিয়েছে। প্যাসেজের ডানদিকে পর পর দুটো বড়ো বেডরুম। বাঁদিকে বাথরুম, কিচেন আর একটা ছোটো স্টোররুম। ফ্ল্যাটে বিশাল বিশাল খড়খড়ির জানলা। তারপরে কাচ। তবে খড়খড়ি খোলা অত সোজা ছিল না। দুটো জানলা দিয়ে মাঝেমধ্যে সামান্য আলো উঁকি দিত। এমনিতেও বাইরে প্রায় সব সময় মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। ঝিরঝিরে বৃষ্টি। ফ্ল্যাটে অমাবস্যার অন্ধকার কাটাতে প্রায় সারাদিনই আলো জ্বালিয়ে রাখতে হয়। মাঝেমধ্যে দিন আর রাতের তফাতটা বুঝতে রান্নাঘরের কাচের জানলার বাইরে চোখ রাখতে হত। এখানেই শুধু ঘোরানো কাচের জানলাটাকে খড়খড়ির আড়ালে রাখা হয়নি। ওই জানলা দিয়ে খুব ভালো যে দৃশ্য

দেখা যেত তা নয়। এটা ছিল বাড়ির পিছনের দিক। একচিলতে বাগান। শুধু বাড়িওয়ালার একতলার ফ্ল্যাটের মধ্যে দিয়ে যাওয়া যেত। এ বাগানে কয়েকটা মাঝারি সাইজের গাছ, কিছু ফুলের টব গোল করে রাখা। মাঝে সামান্য একটু সিমেন্ট-বাঁধানো জায়গা। একধারে জঞ্জাল ফেলার ডাস্টবিন। মোদ্দা কথা, এমন কিছু দৃশ্য নয় যে হাঁ করে তাকিয়ে থাকব। কিন্তু সেটাই হল একদিন।

ও বাড়িতে থাকতে শুরু করার ছ-সপ্তাহ পরের ঘটনা। রবিবার ছুটির দিন, রান্নাঘরের জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি মুখ-গোমড়া আকাশ। নীচের দিকে তাকাতেই চোখ পড়ল একজন মধ্যবয়সি ভদ্রমহিলার উপরে। বাগানে একটা অ্যালুমিনিয়ামের চেয়ারে আধশোয়া অবস্থায়। হাতে একটা বই। ইতালিতে সুন্দরী মহিলার অভাব নেই। কিন্তু ওঁকে তাঁদের মধ্যেও আলাদা করে অনায়াসে খুঁজে পাওয়া যাবে। এককথায় অসামান্য সুন্দরী, ছাইরঙা ট্র্যাকসুটের উপরে একটা আকাশি নীল সোয়েটার পরা। উজ্জ্বল সোনালি চুল। চোখ, নাক, মুখ কাটা-কাটা। মুখে একটা অস্বাভাবিক স্বর্গীয় স্নিগ্ধতা। দেখে মনে হয়, বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হবে।

ইনিই কি বাড়িওয়ালি? লুসি মাতারাজ্জি? বাড়ি ভাড়া নেওয়ার সময় ওঁর সই, নাম দেখেছি। কিন্তু এজেন্টের মাধ্যমে হওয়ায় সরাসরি যোগাযোগ হয়নি। ঠিক করলাম, পরে একদিন গিয়ে আলাপ করব। এমন একজনের সঙ্গে আলাপ না-করাটাই ভুল হবে। তা তার জন্য অবশ্য বেশি দিন অপেক্ষা করতে হল না।

দু-দিন পরের ঘটনা। অফিস থেকে ফিরতে সন্ধে ছ-টা। কিছু আগেই একপশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। রাস্তা ভেজা। একটা কালো মেঘ হামাগুড়ি দিয়ে মাথার উপর এগিয়ে আসছে। আবার বৃষ্টি এল বলে! রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের হলুদ আলোগুলো সবে ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে। রাস্তা থেকে বাড়ির মেন গেটটা খুলতেই দেখতে পেলাম, ঠিক আমার আগেই ওই মহিলা বাড়ির ভিতর ঢুকছেন। আমাকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়লেন। হেসে বললেন, বুয়োনা সেরা। কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো?

আমিও হেসে একই রকম সৌজন্য দেখালাম। ভদ্রমহিলা আবার বললেন, তোমার ফ্ল্যাটে কোনো অসুবিধে হলে আমাকে জানিও।'

আমিও জানালাম কোনো অসুবিধে নেই। ফ্ল্যাটে যদিও প্রচুর অপ্রয়োজনীয় আসবাব আছে, তার মধ্যে দিয়ে হাঁটাচলা বেশ দায়। খড়খড়িগুলোও ঠিকমতো খোলে না। কিন্তু এসব তো আর প্রথম আলাপেই বলা যায় না। আর থাকবও তো মাত্র কদিন।

চলো আমার সঙ্গে, একটু কফি খাবে।

প্রথম আলাপেই কফি খেতে যাওয়াটা কি ঠিক? তাই আপত্তি জানালাম। কিন্তু ভদ্রমহিলা আপত্তি শুনলেন না। প্রায় জোর করেই ওঁর ফ্ল্যাটে নিয়ে গেলেন।

পুরো একতলা জুড়েই ওঁর ফ্ল্যাট ভারী সুন্দর করে সাজানো-গোছানো। দামি কাঠের আসবাব। লেদার সোফাসেট। বেশ কয়েকটা ইনডোর প্লান্টও রয়েছে। দেওয়ালে বড়ো-বড়ো ইতালিয়ান ফ্রেস্কো পেন্টিং। অবাক হয়ে দেখছি, ভদ্রমহিলা পাশ থেকে বললেন, বেশির ভাগই আমার আঁকা।

পেন্টিংগুলো অসাধারণ। তা আপনি কি প্রফেশনাল আর্টিস্ট?

আমি ফ্লোরেন্সের আকাদেমি অফ আর্টস থেকে ছবি আঁকা শিখেছি। কিন্তু এটা আমার মূল পেশা নয়। নেশা বলতে পারো। এখানে জেনোয়া ইউনিভার্সিটিতে আমি ফিজিকস পড়াই। আর সময় পেলেই আঁকতে বসে যাই।'

তা আপনি এখানে একাই থাকেন?

হ্যাঁ, একাই থাকি।

আমাকে সোফায় বসিয়ে ভদ্রমহিলা রান্নাঘরে গেলেন। সামনের ফ্লেঞ্চ ইজেলে রাখা একটা বড়ো অয়েল পেন্টিং। একটু খেয়াল করতেই বুঝলাম পিছনের বাগানের। ছবির মাঝখানে সেই সিমেন্টের বেদি। বাঁদিকে একটা ছোটো মেপল গাছ। তার পাশে একটা ছোটো ফুলগাছ। তাকে কেন্দ্র করেই যেন আঁকাটা। ভারী সুন্দর বেগুনি রঙের ফুল এই গাছটায়। আর ছোটো-ছোটো লাল ফল। ছবিতে গাছটাকে ঘিরে একটা মাকড়সার জাল। তাতে যেন বৃষ্টির ফোঁটা আটকে আছে। অদ্ভুত সুন্দর তবে ছবিটা দেখে মনে হল অসমাপ্ত।

মুগ্ধ হয়ে দেখছিলাম, পায়ের শব্দে ঘোর কাটল। ভদ্রমহিলা ট্রে-তে করে খাবার আর কফি নিয়ে ঢুকলেন।

আপনার এই আঁকাটা ভারী সুন্দর।

হ্যাঁ, এখনও শেষ হয়নি। আরও কয়েকদিন লাগবে। শুধু ছুটির দিন পেলেই বসতে পারি। অন্যদিন তো আর আঁকা হয় না।

এটা তো আপনার পিছনের দিকের বাগানটা, তা-ই তো?

লুসি যেন একটু দ্বিধা করে বলে উঠলেন, আসলে এখানকার বেশির ভাগ বাড়ির লাগোয়া বাগান প্রায় একই রকম। কোনো না কোনো গাছ থাকবে, সিমেন্টের বেদি থাকবে। তা যাক গে। এই কেকটা খেয়ে কীরকম লাগল বলো তো! বাড়িতে বানানো। —বলে প্লেটটা সামনের টেবিলের উপর রাখলেন।

প্রায় এক ঘণ্টা ছিলাম সেদিন। এত বিদুষী ও বিনয়ী মহিলা খুব কমই দেখা যায়। শনিবার পুরো একটা দিন উনি একটা ওল্ডএজ হোমে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সঙ্গে কাটান। রোববার দিনটা কাটান বই পড়ে আর ছবি এঁকে। সব মিলিয়ে ওই এক ঘণ্টা আলাপের রেশ আমার সঙ্গে রয়ে গেল। আবার কোনো একদিন দেখা করতে আসার কথা দিয়ে বেরোলাম।'

এতটা শুনে বিশ্বজিৎদা গলা খাঁকরে বলে উঠল, ইতালির সব বাড়িতে একই রকম বাগান, সিমেন্টের বেদি, মেপল গাছ, গল্পের এই অংশটুকু কিন্তু ঠিক হজম হল না।

শুনে অনিলিখা মুচকি হেসে বলল, থাক! মন দিয়ে শুনছ যে, এটুকু অন্তত বোঝা যাচ্ছে। তবে ঠিকই বলেছ, ওই কথাটা আমারও একটু অদ্ভুত লেগেছিল। আর-একটা জিনিসও খুব অদ্ভুত লেগেছিল।

লুসি বাঁ হাতটা প্রায় ব্যবহারই করছিলেন না। কফি আর কেক নিয়ে যখন রান্নাঘর থেকে এলেন, তখনও ওই ভারী ট্রে-টা শুধু ডান হাতেই ধরে ছিলেন। আমার মনে হচ্ছিল যে, বাঁ হাতে কোনো অসুবিধে নেই তো! প্যারালিসিস জাতীয়? তা না হলে শুধু এক হাতে একটা বড়ো ট্রে নিয়ে আসা একটু অস্বাভাবিক।

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝলাম তা নয়। কারণ আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে ছবিটার উপরে তুলির টান দিচ্ছিলেন মাঝে মাঝে বাঁ হাত দিয়ে।

ডান হাতটা অন্যদিকে সরানো।

এর ঠিক দু'দিন পরের ঘটনা। অফিসের দিন। বেলা বেশ ছোটো হয়ে গিয়েছে। সকাল সাতটাতেও অন্ধকার। চারদিকের বাড়িগুলোয় আলো জ্বলছে। এর মধ্যে রেডি হয়ে অফিসে বেরোতে বেশ কষ্টই হয়। তবু সেদিন আকাশ পরিষ্কার ছিল। রান্নাঘরে ব্রেকফাস্টের আয়োজন করছিলাম। হঠাৎ নীচ থেকে কিছু একটা ভাঙার আওয়াজ পেলাম। দেখি আমার জানলার পাল্লাটা সামান্য খোলা, কখনো খুলে বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছি। নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি অদ্ভুত দৃশ্য। লুসি বাগানের চেয়ারে বসে আছেন। ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতের কবজি জোর করে ধরে রেখেছেন। বাঁ হাতটা যেন সেই বাধা অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করছে। আঙুল তুলে সামনের ফুলগাছটার দিকে নির্দেশ করছে। ছবির সেই ফুলগাছটা, যাতে বেগুনি রঙের ফুল। বাঁ হাতটা বার বার উপরের দিকে উঠে আসছে আর ডান হাতটা আবার জোর করে সেটাকে নামিয়ে চেয়ারের হাতলে ধাক্কা মারছে। চেয়ারের নীচে ভাঙা কাপ, ডিশ। নির্ঘাত হাত থেকে পড়ে গিয়েছে আর তারই আওয়াজ আমি পেয়েছি।

অবাক হয়ে দেখছি, হঠাৎ দেখি, লুসি উঠে দাঁড়ালেন। দু-হাতের মধ্যে এই যুদ্ধে ওঁর সারা শরীর কাঁপছে। প্রায় ছুটে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন। রাস্তার ধারে বাড়ি, বাইরে গাড়ি চলাচল

শুরু করে গিয়েছে। এর মধ্যে নীচের তলায় কী হচ্ছে তা বোঝা খুব মুশকিল। ঘরে ঢোকার পর কোনো শব্দ পেলাম না।

এই ঘটনার কথা আমি কাউকে বলিনি। কারো শারীরিক বা মানসিক অসুস্থতার কথা অহেতুক অন্য কাউকে বলার প্রয়োজনই বা কী! অফিসের মধ্যে একটা ক্যাফে আছে, কফি মেশিনে নিজেই নানা ধরনের কফি তৈরি করে নেওয়া যায়। আমি কফি নিয়ে এক চুমুক দিয়েছি, হঠাৎ পাশ থেকে জিওভানির গলা শুনলাম।

বাড়িটা কেমন লাগছে অ্যানি?

এই অফিসে সবাই আমাকে অ্যানি বলে ডাকতে শুরু করেছে। কেন জানি না, বোধহয় ওদের ইতালির নামের কাছাকাছি হবে। জিওভানির দিকে মুখ ঘোরালাম।

ভালো, বেশ ভালো। বাড়িওয়ালির সঙ্গেও আলাপ হয়েছে, বেশ ভালো ভদ্রমহিলা।

প্রসঙ্গত বলে রাখি, জিওভানিই আমাকে ওবাড়ির সন্ধান দিয়েছিল।'

জিওভানি আমার কথায় সায় দিয়ে বলে উঠল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব ভালো মহিলা। আমার সঙ্গে অবশ্য খুব বেশি আলাপ নেই। কিন্তু একই কথা সবার মুখে শুনেছি। খুব নামকরা ফিজিসিস্ট। ওঁর লেখা বেশ কয়েকটা বইও আছে।

তা-ই? তা জানতাম না তো। তা উনি তো একা থাকেন?

ওঁর হাজব্যান্ড সুইস আল্পসে স্কি করতে গিয়ে মারা যান। অ্যাভালাঞ্চে। বডিও পাওয়া যায়নি। খুবই দুঃখজনক ঘটনা।

তা, লুসি তখন সঙ্গে ছিলেন না?

না। উনি কোনো একটা দরকারি কাজে এখানেই ছিলেন। এটা প্রায় পাঁচ বছর আগের ঘটনা। তখন খবরের কাগজে ঘটনাটা খুব বড়ো করে বেরিয়েছিল। ওঁর হাজব্যান্ডও খুব বিখ্যাত মানুষ ছিলেন। নামকরা ডাক্তার। নেফ্রোলজিস্ট। এর দেড় বছর পরে ওঁর ছেলে মারা যান রোড অ্যাক্সিডেন্টে। বুঝতেই পারছ, এ ধরনের খবর তো আর চট করে ভোলা যায় না। কখন কার ভাগ্যে যে কী থাকে, বলা মুশকিল।

তা তুমি এ খবরটা পেলে কী করে?

পারিবারিক সূত্রে ওঁর ছেলের মৃত্যুর খবরটা পেয়েছিলাম। লুসি আমার দূর সম্পর্কের আত্মীয় হন। তা তো জানোই।

ওঁর হাজব্যান্ডের সঙ্গে তোমার পরিচয় ছিল?

তেমন কিছু না। দু-একবার পার্টিতে দেখা হয়েছে। ওঁকেও ভারী সুন্দর দেখতে। দেখার মতো কাঁধ পর্যন্ত সোনালি চুল। তেমনই অমায়িক।

অনিলিখা একটু থামল। চা-শিঙাড়া নিয়ে কাজের মাসি ঘরে ঢুকছে। বংশীর দোকানের মাংসের শিঙাড়া। তাই গল্পে একটু বাধা পড়ল। মিনিট পাঁচেক বাদে অনিলিখা ফের বলতে শুরু করল, এর পরের ঘটনাটা ঘটল কলকাতায় ফিরে আসার কয়েকদিন আগে। অফিস-ফেরত ফ্ল্যাটে ঢুকে দেখি, আলো জ্বলছে না। অথচ বাইরের প্যাসেজে আলো জ্বলছে। কোনো এম. সি. বি. ট্রিপ করে থাকতে পারে। কিন্তু কোথায় সুইচবোর্ড আছে, খুঁজে পেলাম পা। কয়েকদিনের জন্য আসা, টর্চও নেই হাতের কাছে। অন্ধকারে ফ্ল্যাটের মধ্যে খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক হাতড়ে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, নীচে গিয়ে লুসির সঙ্গে কথা বলাই ঠিক হবে।

'সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এসে লুসির ফ্ল্যাটের ডোর বেল বাজালাম।

মিনিট দুয়েক পরে লুসি বেরিয়ে এলেন। চোখ-মুখ দেখে মনে হল খুব ক্লান্ত। তবু আমাকে দরজা থেকে ফিরে যেতে দিলেন না। ওঁর চেনা এক ইলেকট্রিশিয়ানকে ফোন করে আমাকে প্রায় জোর করে ড্রয়িং রুমে এনে বসালেন।

তোমার ডিনার হয়েছে? আমার সঙ্গে ডিনার করে যাও। ব্রকোলি দিয়ে স্যালমন মাছ বেক করেছি। ইলেকট্রিশিয়ান আসতে আধ ঘণ্টা তো লাগবেই। অতক্ষণ তুমি অন্ধকার ফ্ল্যাটে বসে কী করবে?

আমি বিশেষ প্রতিবাদ করলাম না। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। একটু যে বাইরে ঘুরে আসব, তার উপায় নেই। ফ্ল্যাট অন্ধকার। এই অবস্থায় লুসির সঙ্গে গল্প করে মাঝের সময়টা কাটানো ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

ইতালির রাজনীতি নিয়ে খানিকক্ষণ কথা হল। তারপর লুসি রান্নাঘরে গেলেন রান্নার বাকি অংশ শেষ করতে। আমি এতক্ষণ গল্পে মশগুল থাকায় খেয়াল করিনি। ক্যানভাসের সেদিনের সেই ছবিটা আর ওখানে নেই। এদিক-ওদিক খুঁজতে চোখ পড়ল পাশের কাগজ ফেলার বাস্কেটে। বেশ কয়েকটা ছেঁড়া কাগজের টুকরো উঁকি মারছে। একটা বের করতেই বুঝলাম এটা সেই ছবিরই ছেঁড়া একটা অংশ। কী এমন ব্যাপার হতে পারে যে, লুসি নিজের আঁকা এত সুন্দর একটা ছবি টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে ডাস্টবিনে ফেলে দিতে পারেন!

সব ক-টা টুকরো টেবিলের উপর রেখে জিগস পাজলের মতো একটার সঙ্গে একটা জুড়ে ফেললাম। প্রায় কুড়িটা টুকরো, কিন্তু জিগস পাজলের অভ্যাস থাকায় জুড়তে সময় লাগল না। আর জোড়ার পরেই চমকে উঠলাম। এত সুন্দর ছবিটাকে বেখাপ্পাভাবে একটা অংশ জোড়া হয়েছে। মোরগের ঝুঁটির মতো বেগুনি ফুলওয়ালা ওই গাছটার তলায় একটা লোক শুয়ে আছে, আর তার শরীরের উপর ছড়িয়ে পড়েছে ওই ফুল। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, ওই অংশটা

পরে আঁকা হয়েছে। লোকটার মুখ অন্যদিকে সামান্য ঘোরানো। লোকটার কাঁধ অবধি সোনালি চুল দেখে চমকে উঠলাম।

—তা এতে চমকে ওঠার কী আছে? বিশ্বজিৎদা বলল।

—চমকে উঠেছিলাম জিওভানির কথাটা মনে করে। ছবিটাতে কি লুসি ফ্রান্সিসকোকেই আঁকতে চেয়েছিলেন? কিন্তু হঠাৎ করে গাছের তলাতেই বা কেন?

'চিয়াও'—লুসির সম্বোধনে মাথা ঘুরিয়ে দেখি, লুসি পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।

এত মন দিয়ে জোড়া-দেওয়া ছবিটা দেখছিলাম যে, লুসি কখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, খেয়ালই করিনি। ওঁর মুখের দিকে তাকিয়েই চমকে উঠলাম। এ যেন অন্য লুসি। মুখটা ফ্যাকাশে সাদা। চোখের দৃষ্টিতে যেন রাগ আর বিস্ময়।

আমি কোনোরকমে বলতে পারলাম, আসলে ছবিটা এত সুন্দর, খোঁজ করতে গিয়ে চোখ পড়ল বাস্কেটে।

না, না, সে ঠিক আছে, লুসি যেন মুহূর্তে ফের স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছেন।

আসলে ছবিটা এত কষ্ট করে আঁকার পরে মনোমতো না হলে তখন খুব খারাপ লাগে। এটাও তা-ই। একদম পছন্দ হয়নি, তাই ছিঁড়ে ফেলেছিলাম। রান্না শেষ, চলো, খেয়ে নিই।

লুসির কথা শুনে আমার খুব অবাক লেগেছিল। নিজের সৃষ্টিকে এভাবে কেউ নষ্ট করে দিতে পারে! যেভাবে কুচিকুচি করে ছিঁড়েছেন, তাতে মনে হচ্ছে প্রচণ্ড রাগের মাথায় ছেঁড়া। তা আমি এ নিয়ে কোনো কথা না বাড়িয়ে ডিনারের উদ্দেশে এগোলাম।

সেদিন ডিনারের খানিক পরেই ইলেকট্রিশিয়ান এসে গিয়েছিল, তাকে নিয়ে আমার ফ্ল্যাটে চলে গিয়েছিলাম। খানিকক্ষণের মধ্যে আলোও ফিরে এসেছিল। কিন্তু আমি লুসির ওই চোখের দৃষ্টিকে ভুলতে পারছিলাম না। কেন জানি না, লুসির তাৎক্ষণিক রিঅ্যাকশনটা আমার ভালো লাগেনি।

সেদিন রাতে লুসির হাজব্যান্ড ফ্রান্সিসকোর উপর ইন্টারনেটে খোঁজখবর নিলাম। পাঁচ বছর আগের ঘটনা। স্কি করার জন্য একটা গ্রুপের সঙ্গে সুইস আল্পসে গিয়েছিলেন। দুর্ঘটনার আগের দিন রাতে ভারী বরফপাত হয়েছিল। যেখানে ওঁরা স্কি করছিলেন, সকালে সেদিন হঠাৎ করে অ্যাভালাঞ্চ হয়। ওঁদের গ্রুপের দুজনের মৃতদেহ পাওয়া গেলেও, ওঁকে পাওয়া যায়নি। অবশ্য এ ধরনের দুর্ঘটনায় মাঝেমধ্যে মৃতদেহ পাওয়াই যায় না। বরফের তলায় চাপা পড়ে যায়। পুলিশও এ বিষয়ে বিশেষ কিছু সন্দেহ করেনি। তবে একটা রহস্য ছিল। ফ্রান্সিসকোকে সেদিন সকালে কেউ স্কি করতে যেতে দেখেনি। আর তার আগের দিন ফ্রান্সিসকোর বাড়ি থেকে নাকি খবর এসেছিল আর্জেন্টলি ফিরে আসার জন্য। সে ব্যাপারে ফ্রান্সিসকো এক বন্ধুকে

বলেওছিল। তবে লুসি সে কথা অস্বীকার করেন। বাড়ির দিক থেকে কোনো কারণই ছিল না, যার জন্য ফ্রান্সিসকোকে জরুরি তলব করার দরকার ছিল। তারপর এত বছর কেটে গিয়েছে। কেস ক্লোজড। লুসিকেও সন্দেহ করার কোনো কারণ পাওয়া যায়নি।'

সহেলি এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিল। হঠাৎ করে নড়েচড়ে উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, তার মানে লুসি ওর হাজব্যান্ডকে মার্ডার করে ওই ফুলগাছের তলায় পুঁতে দিয়েছিল? আর তাই ছবিতে ভুল করে এঁকে ফেলেছিল, আর সেটা তুমি দেখে ফেলায়—মাই গড! তা, তারপর তুমি কী করলে?

অনিলিখা মুচকি হেসে বলে উঠল, 'এই তো! মার্ডার মিস্ট্রি বেশি পড়ার ফল। তবে তুই ঠিকই বলেছিস। আমারও ঠিক তা-ই মনে হয়েছিল। আর তাই সেই রাতেই পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। সেই সঙ্গে আর-একটা কথাও বলে রাখি, যেটা তোদের জানা দরকার। তা হল, অ্যালিয়েন হ্যান্ড সিনড্রোম। লুসির ক্ষেত্রে বাঁ হাতটা ছিল অ্যালিয়েন হ্যান্ড।

—মানে? ওই হাতটা? লুসির কন্ট্রোলে ছিল না?

—ঠিক তা নয়। আমাদের মস্তিষ্কের বাঁদিক আর ডানদিকের মধ্যে পাওয়ার স্ট্রাগল হল এ অসুখের মূলকথা। এটা একটা বিরল ধরনের অসুখ। তবে হলে খুব বিপদ। মস্তিষ্কের বাঁদিকের নিয়ন্ত্রণ থাকে ডান হাত আর ডানদিকের নিয়ন্ত্রণে থাকে বাঁ হাত। তাই ঝগড়া বেধে যায় বাঁ হাত আর ডান হাতের মধ্যে। সাধারণত বাম মস্তিষ্ক বেশি শক্তিশালী বলে এক্ষেত্রে ডান হাতই জিতে থাকে।

লুসি যে এরকম একটা বিরল অসুখে ভুগছেন তা আমার মনে হয়েছিল। আর তাই এটাও মনে হয়েছিল যে, ওঁর অতীতের কোনো অপরাধের সাক্ষ্য বহন করছে ওঁর নিজেরই ডান মস্তিষ্ক আর বাঁ হাত।

ডান হাতের এই কৃতকর্ম ডান মস্তিষ্ক ও বাঁ হাত মেনে নিতে পারেনি। তাই সবকিছু চাপা দেওয়ার পরেও উনি ভুল করে বাঁ হাতে এঁকে ফেলেন এমন একটা ছবি, যা ওঁর অতীতের কৃতকর্মের সাক্ষ্য বহন করে। আর ডান হাত সে ছবি তাই ছিঁড়ে ফেলে দেয়। ছবি ছেঁড়ার মধ্যেও এই পাওয়ার স্ট্রাগলের ছাপ স্পষ্ট। মনে রাখতে হবে, এক হাতে ছবিটা ছেঁড়া সহজ নয়। ছেঁড়া টুকরোগুলোকে দেখে আমারও তা-ই মনে হয়েছিল।

—তারপর কী হল? বিশ্বজিৎদা অধৈর্য হয়ে বলে ওঠে।

—আমার কাছে খবর পেয়ে পরদিন পুলিশ আসে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর এই ছবিটা পায়। শুধু তা-ই নয়, আগেও বহুবার লুসি ওরকম ছবি এঁকেছেন। সেসব ছবির ছেঁড়া টুকরোও পুলিশ খুঁজে পায়। আর্টিস্ট হিসেবে বাঁ হাতই উনি ব্যবহার করতেন। তাই মূলত

ছবিতেই সে প্রতিফলন ছিল। যতবার বাঁ হাত সে ছবি এঁকেছে, ডান হাত সময়মতো ছিঁড়ে ফেলেছে। লুকিয়ে রেখেছে। পুলিশের জেরার মুখে প্রথমদিকে লুসি নানারকম বিভ্রান্তিকর তথ্য দিলেও পরে অপরাধ স্বীকার করে নেন। এসব কথা জিওভানির কাছে পরে শুনেছিলাম। ততদিনে দেশে ফিরে এসেছি।

পুলিশ লুসিকে অ্যারেস্ট করে। ফ্রান্সিসকোর মৃতদেহ অবশ্য পাওয়া যায়নি। ফুলগাছের তলা থেকেই নিশ্চয়ই ওটা পরে অন্য কোথাও সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কেউ তো আর বাড়ির উঠোনে চিরকাল নিজের স্বামীর ডেডবডি রেখে দেওয়ার ঝুঁকি নেবে না। স্বাভাবিক। কিন্তু কোথায় ডেডবডিটা লুকিয়ে ফেলা হয়েছিল, সে কথা লুসি হাজার জেরাতেও বলেননি।

কিন্তু কারণটা কী ছিল?

—না, সেটা আর জানা হয়নি। আমি তো তার কয়েকদিনের মধ্যে ফিরে আসি। তখন ইনভেস্টিগেশন তো সবে শুরু হয়েছিল। তবে যেটা সন্দেহ করা হচ্ছিল তা হল, লুসির এই অসুস্থতার কথা ফ্রান্সিসকো জানতে পেরেছিলেন আর তাই চিকিৎসার জন্য চাপ দিচ্ছিলেন। লুসি নিশ্চয়ই তা চাননি। কারণ, দুটো হাতই হয়তো চায়নি যে তাদের স্বাধীনতা এত সহজে চলে যাক। তা এসব অনেক সম্ভাবনাই কফির কাপ সামনে থাকলে আপনা-আপনি আলোচনায় চলে আসে। সত্যটা কী, তা আমি কয়েকদিন আগে পর্যন্ত জানতে পারিনি।

—লেট মি গেস,— বিশ্বজিৎদা বেশ, নাটকীয় ভঙ্গিতে বলে উঠল, এসবের মূলে থাকে মূলত টাকা। খোঁজ নিয়ে দেখা গিয়েছে, ফ্রান্সিসকো মারা গেলে লুসির অর্থের দিক দিয়ে বড়ো করমের কোনো লাভ হত। বিমা জাতীয় কিছু। ঠিক কি না?

অনিলিখা মুচকি হেসে বলে উঠল, আগে খুনটাকে তো হতে দাও। যেখানে খুনই হয়নি, সেখানে সে রহস্যের সমাধান করবে কী করে? দিন কুড়ি আগে ইতালি থেকে একটা ফোন পাই। আমার নম্বর ওখানকার পুলিশের কাছে ছিল। ওরা জানায় যে লুসিকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ, ফ্রান্সিসকোর মৃতদেহ এতদিন বাদে সুইস আল্পসেই পাওয়া গিয়েছে। বরফের অনেক তলায় চাপা পড়ে গিয়েছিল। সম্প্রতি ওখানে আর-একটা দুর্ঘটনা ঘটে। হারিয়ে-যাওয়া গ্রুপের খোঁজ করতে গিয়ে ফ্রান্সিসকোর বডিও পাওয়া যায়। ডি. এন. এ. টেস্টও কনফার্ম করছে যে, ওটা ফ্রান্সিসকোরই।

মানে? তার মানে এই মৃত্যুতে লুসির আদৌ কোনো হাত ছিল না? তাহলে এসব ছবির অর্থ?

—সব রহস্যের কি সমাধান হয়? হয়তো লুসির বাঁ হাত শুধু ডান হাতকে একটু বিপদে ফেলতে চাইছিল। শেষমেশ ডান হাতের শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহও বলতে পারো। কতদিন

আর ডান হাতের শাসন মেনে চলবে? ওই ছবি আঁকাই ছিল বাঁ হাতের একমাত্র ভাষা। আর কনফার্মড না হলেও অনেকের সন্দেহ, ওইসব গাছ, বাগানের যত্ন নিত লুসির ডানহাত। তাই গাছেদের উপরেও একই সঙ্গে প্রতিশোধ। বলা বাহুল্য, পুলিশি তল্লাশিতে একটা গাছও আর টিকতে পারেনি। কী অদ্ভুত ধরনের রোগ ভাবা যায়?

—তা লুসি এখন কোথায়?

—যেখানে বহুদিন আগেই থাকার কথা ছিল। জেনোরায় মানসিক রোগীদের হাসপাতালে। —

অনিলিখা উঠে দাঁড়াল— যাই, বৃষ্টি প্রায় থেমে এসেছে। দেখি, দরকারি কাজগুলো সারতে পারি কি না!

স্বাধীনতা

পুনিতের বাবার একটা আজব শখ ছিল। ভারতের জাতীয় পতাকা আঁকা। একটা পাটকাঠির উপরে কাপড়ে আঁকা পতাকা লাগিয়ে গ্রামের সব বাচ্চাকে বিলি করত স্বাধীনতার দিনে। বিনে পয়সায়। পুনিতও অবশ্য একটা পেত। তবে ওর একটু হিংসেই হত। কী দরকার বাকি সবাইকে বানিয়ে দেওয়ার! ওদের নিজেদেরই তো অবস্থা এত খারাপ। আর কত পরিশ্রম! ওদেরও বাবা আছে, তা-ই না!

তা বাবাকে জিজ্ঞেস করলে উত্তর পেত—বড়ো হলে বুঝবি। স্বাধীনতা বলে কথা! স্বাধীনতার দিনে সবার হাতে এই পতাকা থাকা দরকার। আর সবাই কি আর তোর বাবার মতো এত সুন্দর আঁকতে পারে! কী সুন্দর গেরুয়া আর সবুজ রংটা ফুটেছে দেখেছিস! আর পতাকার মধ্যে চক্রটা দেখেছিস! ঠিক ২৪টা দাগ থাকতে হবে ওর মধ্যে। ব্যাপারটা অত সহজ নয়, বুঝলি। স্বাধীনতার ব্যাপার।—বলে চুপ করে কী যেন ভাবত বাবা।

পরে আরেকটু বড়ো হলে পুনিতও বাবার সঙ্গে পতাকা বিলি করত। আর মাঝে-মধ্যেই বাবাকে প্রশ্ন করত, বাবা, স্বাধীনতা মানে কী?

বাবা হেসে বলত, আমি কি অত,শত বুঝি রে! তবে খুব বড়ো ব্যাপার। দেখিস না সব কিছু ছুটি থাকে। স্কুল ছুটি থাকে। অফিস ছুটি থাকে। এইদিন ভারত স্বাধীন হয়েছিল। তার আগে খুব দুষ্টু সাহেবরা আমাদের উপরে খুব অত্যাচার করত। আমার ঠাকুরদাও তো অনেক বছর জেল খেটেছিলেন স্বাধীনতার জন্য। তাই তো আমার বাবারও আর পড়াশোনা হয়নি। ওঁরা অন্য মাপের মানুষ ছিলেন। নিজেদের কথা ভাবতেন না। আমি তো শুধু পতাকা বানাই। পতাকা নিয়ে যখন হাঁটি, তখন মনে হয় ভয়ের কিছু নেই। আমার হাতেই এ দেশের দায়িত্ব। তাই কোনো অন্যায় যেন সহ্য না করি।

পুনিতের মাথায় এসব কিছুই ঢুকত না। দু-দিন বাদে আবার একই প্রশ্ন করত। তা শেষে একদিন ওর বাবা খুব ভেবেচিন্তে বলল, গ্রামের পুরোহিতমশাই মানিকবাবু খুব পণ্ডিত লোক। আর ওর তো অনেক বয়েসও হয়েছে। উনি নির্ঘাত জানবেন। ওকে জিজ্ঞেস করব গিয়ে।

ওরা তারপরে একদিন ভোর ভোর মানিকবাবুর বাড়ি গিয়ে এ প্রশ্নটা করল। উনি তখন দাঁত ব্রাশ করছিলেন। প্রথমে প্রশ্নটা শুনে ব্রাশ মুখ থেকে পড়ে গেলেও, খানিক বাদে সামলে বলে উঠলেন, তোরা তো কিছুই দেখলি না! আমার এখনও মনে পড়ে সেদিনের কথা। আমরা

সবাই মাঝরাতে বড়োদের সঙ্গে বসে সেদিন রেডিয়োতে শুনেছিলাম। আমাদের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু বলছেন,আজ রাতে পৃথিবী যখন ঘুমোবে, স্বাধীন ভারত জেগে উঠবে।

সে কী আনন্দ চারদিকে! আমি তখন খুব ছোটো। আনন্দে না বুঝে মাটিতে গড়াগড়ি খেয়েছিলাম। এর বেশি আর কিছু আর মনে নেই। কিন্তু কথাগুলো এখনও মনে পড়লে গায়ে কাঁটা দেয়।

—তা দাদু, স্বাধীনতার মানে কী?—পুনিত আবার প্রশ্ন করে।

খানিকক্ষণ চুপ করে মানিকবাবু একটু যেন বিরক্ত হয়েই বলে উঠলেন, এই যে নিজের ইচ্ছেমতো চলছি-ফিরছি, কেউ এসে হঠাৎ ক রে পেটাচ্ছে না, বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে না —এটাই স্বাধীনতা। তা তোদের কি মাথা খারাপ হল! সকাল সকাল বাবা-ছেলে মিলে চড়াও হয়েছিস এ প্রশ্ন নিয়ে! বলি, তোদের কি কিছু এসে যায় এতে! খেতমজুরি করিস! এসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কী লাভ! ওসব যারা রাজনীতি করে, তারা এসব ভাববে। তোরা তোদের কাজ কর।

ওরা খানিক বাদে বাড়ি ফিরে এল। পুনিতের প্রশ্ন আরও বেড়ে গেল। কিন্তু প্রশ্ন করার সাহস আর ছিল না।

এর কয়েক মাসের মধ্যে হঠাৎ যে কী হল, দু-দিনের জ্বরে পুনিতের বাবা মারা গেল। বাবা কি আগেই টের পেয়েছিল? তা না হলে কেন তার আগের দিন পুনিতকে পাশে ডেকে মাথায় হাত বুলিয়ে বলবে, আমি চলে গেলে কাকার কাছে শহরে চলে যাস। পড়াশোনাটা ভালো করে করিস। আর পতাকাটা সঙ্গে রাখিস।

বাবা মারা যাওয়ার পরে খুব কেঁদেছিল পুনিত। ওর মা আগেই মারা গিয়েছিল। গ্রামে আপনার বলতে আর কেউ রইল না। ওর কাকা শহরে একটা ফ্যাক্টরিতে কাজ করে। বাবা মারা যাওয়ার দিনকয়েক বাদে কাকা এসে ওকে শহরে নিয়ে গেল।

কাকার অবস্থাও বেশ খারাপ। তারপরে বড়ো শহর। খরচ অনেক বেশি। তাই থাকার জায়গা জুটলেও ওর পড়াশোনা আর হল না। স্কুল বন্ধ হয়ে গেল। রোজগারের খোঁজে ও একটা চায়ের দোকানে কাজে ঢুকল। প্রথমে ভালো না লাগলেও পরে আস্তে আস্তে কাজটা ভালো লাগতে শুরু করল। চায়ের দোকানের পাশেই ছিল একটা বড়ো অফিস। আর সেখানে অনেক কমবয়েসি ছেলে-মেয়ে কাজ করে। ওর বেশ লাগে। কী সুন্দর সুন্দর জামাকাপড় পরে সবাই আসে। একসঙ্গে হইচই করে, আড্ডা মারে কাজের ফাঁকে। সব সময় মজায় থাকে।

চায়ের দোকান যার, তার নাম মুন্না। সে-ও বেশ ভালো লোক। কাজের ফাঁকে ফাঁকে মজার মজার গল্প করে। তবু মাঝেমধ্যেই পুনিতের মন খুব খারাপ লাগে। ওর বয়স দশ। সারাজীবন

কি এভাবেই কেটে যাবে চায়ের দোকানে? ও কি আর কিছু করবে না! মাথার উপর দিয়ে প্লেন গেলেই ও মাথা তুলে দেখে। ওতে করে নাকি হুস করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলে যাওয়া যায়। ও কি কোনোদিন ওরকম প্লেন চড়তে পারবে! কে জানে!

কই, ও তো ওর ইচ্ছেমতো কিছুই করতে পারে না। ও কি তাহলে স্বাধীন নয়!

কদিন বাদে মুন্নাদাকেও প্রশ্নটা করল পুনিত। ও ভেবেছিল, মুন্নাদা হেসে উড়িয়ে দেবে। কিন্তু তা না। মুন্নাদা একজন কাস্টমারকে বেগুনি দিচ্ছিল।

গলার স্বর একটু নামিয়ে ওকে বলে উঠল, আমিও ঠিক জানি না। এটা খুব বড়ো শহর। যাকে-তাকে এসব প্রশ্ন করলে কী ভাববে কে জানে! পুলিশ ও ধরতে পারে। লোক বুঝে জিজ্ঞেস করতে হবে।

সেদিনই বিকেলের দিকে মুন্নাদা একটা স্যুট-টাই-পরা লোকের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে উঠল, ওকে জিজ্ঞেস করা যাক। আমি ওকে চিনি। বেশ ভালো লোক।

তখন বিকেলের আলো ফুরিয়ে এসেছে। ঘর-ফেরা পাখিদের আওয়াজে কান পাতা দায়।

তা লোকটা প্রশ্নটা শুনে চায়ের প্লাস্টিকের কাপে একবার চুমুক দিল। তারপর সামনের গাছের পাখিগুলোর দিকে তাকিয়ে ধীরেসুস্থে বলে উঠল, ওই যে ওরা যেমন ইচ্ছে উড়তে পারছে, যেমন ইচ্ছে কাজ করতে পারছে, যেমন ইচ্ছে আওয়াজ করতে পারছে, সেটাই স্বাধীনতা। তার মানে অবশ্য এই নয় যে তুমি যা ইচ্ছে করতে পারবে। ধরো, তুমি তোমার চায়ের কাপটা আমার দিকে ছুড়ে মারলে, সেটা তো স্বাধীনতা নয়! সবকিছুই নিয়ম মেনে করতে হয়। তা না হলে সমাজ—দেশ—সব ভেঙে যায়।

পুরোটা না বুঝলেও পুনিতের এই কথাটা বেশ মনে লেগেছিল। আর তাই রোজ বিকেলের দিকে ওই ঘর-ফেরা পাখিদের দিকে তাকিয়ে দেখত ও। কীরকম খেয়ালখুশিমতো ওরা উড়ে বেড়ায়! দেখতে দেখতে ওর মনে পড়ত ওদের ছোটো বাড়িটার কথা। সরষের খেতের কথা! ওর বন্ধুদের কথা। ওর বাবার রং করার তুলিগুলোর কথা।

রাতের বেলা যখন কথা বলার কোনো লোক থাকত না, তখন পুনিতের খুব খারাপ লাগত। ওরও তো খেলতে ইচ্ছে করে, পড়তে ইচ্ছে করে। কিন্তু সেসব করার কোনো উপায় তো নেই। তবে কোনো একটা দিন ও নির্ঘাত স্বাধীন হবে। আর তখন ঠিক ওই লোকটার মতো কথা বলবে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে।

দেশ থেকে আসার সময় সঙ্গে করে বাবার তৈরি একটা পতাকা নিয়ে এসেছিল। রোজ রাতে তার উপরে খানিকক্ষণ হাত বোলাত। তারপরে মাথার কাছে নিয়ে শুত।

একদিন মুন্নাদা ওকে বলল, জানিস এই অফিসটাতে কাল স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বড়ো প্রোগ্রাম হবে। চারদিক তাই অত সাজিয়েছে। আমাদের দোকান তো কাল বন্ধ থাকবে। কিন্তু তুই আসিস। ওদের বলে অফিসে ঢুকে যাবি। ওরা তো তোকে রোজ দেখে। নির্ঘাত ঢুকতে দেবে। সব কথা জানতে পারবি তাহলে। দেখবি, পতাকা তোলা হবে।

পুনিত তো শুনে খুব খুশি। তা সেদিন ভোর হতে-না হতেই ওখানে হাজির। সঙ্গে সেই পতাকা। কিন্তু গেটের কাছে যেতেই অফিসের সিকিউরিটি এগিয়ে এল। ঢুকতে গেলে অফিসের কার্ড লাগবে। না থাকলে অফিসের কাউকে সঙ্গে থাকতে হবে। ও বেশ খানিকক্ষণ গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। অনেক গাড়ি গেট দিয়ে ঢুকল। কিন্তু তারা কেউই পুনিতকে খেয়াল করল না। ঘণ্টা দুয়েক বাদে ঢুকতে না পেয়ে ও ফিরে চলল বাড়ির পথে।

ওর হাতে ধরা পতাকাটা সবাই কৌতূহলের সঙ্গে দেখছিল। ও কিন্তু কোনো ভ্রূক্ষেপ না করে মাথার উপরে নাড়তে নাড়তে বাড়ির পথে হাঁটতে লাগল।

রাস্তায় অন্যদিনের মতো গাড়ির ভিড় নেই। অফিসপাড়া। বেশির ভাগই ছুটি। ফাঁকা রাস্তা। দু-চারজন হেঁটে যাচ্ছে। ওর সামনে কিছু দূরে এক কমবয়েসি মেয়ে হেঁটে যাচ্ছে। ভালো পোশাক পরা। হঠাৎ একটা গাড়ি এসে মেয়েটার পাশ ঘেঁষে থামল। গাড়ি থেকে দুটো লোক নেমে মেয়েটার উপরে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। টেনেহিঁচড়ে গাড়িতে টেনে তোলার চেষ্টা করছিল ওরা।

ওর কী মনে হল কে জানে! শুধু বাবার কথাটা মনে পড়ল।

—বুঝলি, এ পতাকা হাতে থাকলে কোনো কিছুতে ভয় লাগে না। কারণ মনে হয় আমার হাতে এ দেশের দায়িত্ব।

ও চিৎকার করে ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল গুন্ডা দুটোর উপরে। আশপাশে তো আরও লোক ছিল। তারা কেউ এগিয়ে এল না। লোক দুটোর গায়ে বেশ জোর। তবে পুনিতও অত সহজে হার মানতে নারাজ। যতবার লোক দুটো ওকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে মেয়েটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, ও ততবার ফের উঠে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল ওদের গায়ে। কিছু লোক মজা দেখার জন্য জড়ো হচ্ছিল। খানিক বাদে গতিক সুবিধের নয় বুঝে লোক দুটো কোনোরকমে গাড়িতে গিয়ে উঠল। আর উঠেই জোরে গাড়ি চালিয়ে দিল।

তবে তার আগেই ওদের একজন একটা ছোরা দিয়ে বেশ কয়েকটা কোপ দিয়ে গেছে পুনিতের হাতের উপরে। রক্তে ওর পুরো হাতটা লাল হয়ে গেছে। মেয়েটার কিছু ক্ষতি হয়নি। ভয়ে রাস্তায় বসে পড়েছে। আর অবাক চোখে পুনিতের দিকে তাকিয়ে আছে। এইটুকু একটা বাচ্চা!

পতাকাটাও দূরে পড়ে গেছে। টানা-হেঁচড়ায় ছিঁড়ে গেছে।

পুনিত রক্তে ভেজা হাতেই ছেঁড়া পতাকাটা রাস্তা থেকে তুলে চেঁচিয়ে উঠল, জয় হিন্দ!

প্রথমবার ওর মনে হল ও স্বাধীন। জ্ঞান হারানোর আগে ও যেন স্পষ্ট দেখতে পেল বাবার রং করার তুলির দাগ। গেরুয়া, সবুজ—

তাজমহল

—নাহ, লোকটার পছন্দ ছিল বলতে হবে।

—কার বিশ্বজিৎদা?

—খুররম শিয়াউদ্দিন মহম্মদের।

—সে আবার কে?

—আরে গাধা, শাহজাহানের কথা বলছি। শাহজাহানেরেই আরেক নাম খুররম। রুচি না থাকলে ও জিনিস বানানো যায়!

—তুমি কি তাজমহলের কথা বলছ?

—না, সল্টলেক স্টেডিয়ামের কথা বলছি।

—অন্য কিছুও তো হতে পারে।

—থাম তো। মুখে-মুখে তর্ক করিস না। একটু থেমে বিশ্বজিৎদা ফের বলে ওঠে,—তাজমহলের সঙ্গে অন্য কিছুর তুলনাই চলে না। মুখে শোনা, আর চোখে দেখার মধ্যে অনেক ফারাক। সামনে দাঁড়ালেই কেমন যেন শিহরণ হয়।

—সে কী! আগ্রা গিয়েছিলে না কি!

—হ্যাঁ, আগের সপ্তাহে দিল্লি গিয়েছিলাম। টুক করে আগ্রা ঘুরে এসেছি। আগ্রা বলতে অবশ্য শুধুই তাজমহল। সেদিন আবার পূর্ণিমা ছিল। পূর্ণিমার আলোয় তাজমহলকে যা লাগছিল না—কী বলব! কোনো বিশেষণই যথেষ্ট নয়। রাত বাড়ছিল, আর সাদা শ্বেতপাথরের রংও বদলাচ্ছিল। বিকেলের দিকে যা ছিল ধবধবে সাদা, সন্ধে হতেই তা রং বদলে সোনালি হয়ে গেল। দেখতে-দেখতে চার-পাঁচ ঘণ্টা কীভাবে কেটে গেল টেরই পেলাম না।

—দুশো বছর হয়ে গেল, তবু তাজমহলের মতো আরেকটা সৌধ তৈরি হল না! সাগ্নিক বলে ওঠে।

—অ্যাই দুশো কীরে! সাড়ে তিনশো বছর হয়ে গেছে। ১৬৫৪-য় কাজ শেষ হয়। ইতিহাসের জ্ঞান তো একেবারে জিরো দেখছি। বিশ্বজিৎদা ধমকে বলে ওঠে।

—১৬৩২-এ কাজ শুরু হয়েছিল। প্রায় কুড়ি হাজার শ্রমিক মিলে—। মিলন জ্ঞান জাহির করতে গিয়ে থেকে যায়। অনিলিখাদি!

অনিলিখাদি ঘরে ঢোকে। আমাদের শনিবারের আসরে অনিলিখাদি এখন কলকাতার শীতের মতো অনিয়মিত হয়ে এসেছে। কাজের জন্য মাঝেমধ্যেই বিদেশে যায়। শেষ দেখা মিলেছিল দেড়মাস আগে। ছোবড়ার দাঁত বার করা সোফাটায় বসেই বলে উঠল, —কী বিশ্বজিৎ, তাজমহলের ওপরে ওদের আবার কী বলছিলে?

অপ্রস্তুত বিশ্বজিৎদা কিছু বলে ওঠার আগেই অনিলিখাদি শুরু করে,—তা মিলন, কারা যেন তাজমহল করেছিল?

—কেন, ওই যে বললাম না, কুড়ি হাজার শ্রমিক। ওদেরকে তাজমহলের জন্য দেশ-বিদেশ থেকে আনা হয়েছিল।

অনিলিখাদি মৃদু হেসে বলে ওঠে,—পুরো ধারণাটাই ভুল। ঐতিহাসিক ভুল। তাজমহলে এমন অনেক কিছু আছে যেটা তখনকার লোকেদের পক্ষে করা সম্ভব ছিল না।

—আনবিলিভেবল অনিলিখা, তুমি তো দেখছি এবার ভারতের ইতিহাসই পালটে দেবে! বিশ্বজিৎদা উত্তেজিত হয়ে বলে ওঠে।

—আমাকে বলতে দাও। তাজমহলে পারসি, অটোমান, ভারতীয় আর ইসলামিক স্থাপত্যের মিশ্রণ দেখা যায়। তবে মূলত পিয়েত্রা দ্যুরা স্টাইল ব্যবহার করা হয়েছে, যা তার আগে বা পরে কখনো ব্যবহার করা হয়নি। ওই সময়ের অন্য সব স্থাপত্যে ব্যবহার করা হয়েছে লাল বেলেপাথর। তাজমহলে ব্যবহার করা হয়েছে রাজস্থানের মাকরানা শ্বেতপাথর। আঠাশ ধরনের মূল্যবান পাথর নানান দেশ থেকে আনা হয়েছে। প্রশ্ন উঠতেই পারে, সুদূর দেশ থেকে আনা হয়েছে। প্রশ্ন উঠতেই পারে, সুদূর দেশ থেকে এসব পাথর আনা কি তখন সম্ভব ছিল? সেখানেই শেষ নয়। এসব নানান সাইজের আর রঙের পাথর দিয়ে নিখুঁতভাবে জ্যামিতিক আকারে সাজানো হয়েছে। তিন সেন্টিমিটার জায়গার মধ্যে পঞ্চাশটার মতো ছোটো-ছোটো পাথর এমনভাবে বসানো আছে যে প্রত্যেকটার মধ্যে গ্যাপ একদম এক। এক মিলিমিটারের এক-দশমাংশ অবধি কোনো ভুল নেই।

—তা তুমি কী বলতে চাইছ?

—এরকম শিল্পকর্ম রোবোটিক্সের সাহায্য ছাড়া অসম্ভব।

—রোবোটিক্স! তখনকার দিনে রোবোটিক্স! বিশ্বজিৎদা উত্তেজিত হয়ে পায়চারি করতে-করতে বলে,—ইতিহাস এরা যেটুকু জানত, সেটুকুও ভুলে যাবে।

—চোখে না দেখলে আমিও ওটা বিশ্বাস করতাম না।

দুর্গেশের আনা চায়ের ট্রে থেকে এক কাপ তুলে নিয়ে অনিলিখাদি আবার বলতে শুরু করে। অনিলিখাদির পরবর্তী দেড়ঘণ্টার বিবরণ হুবহু তুলে ধরার চেষ্টা করছি। ঠিক না ভুল সে

বিচারের দায়িত্ব তোমাদের ওপরেই ছেড়ে দিলাম।

।। দুই ।।

তোরা তো জানিসই গত দেড়বছর ধরে আমাকে মাঝেমধ্যে ডাবলিন যেতে হচ্ছে। ডাবলিন, আয়ার্ল্যyন্ডের রাজধানী। ডাবলিনের উত্তর দিকে সোউস বলে একটা জায়গা আছে। দমদম যেমন কলকাতার মধ্যে চলে এসেছে, সোউসও সেরকম বলা যায় ডাবলিনের মধ্যেই। ডাবলিনে গেলেই সোউসের লাইব্রেরি আমার প্রিয় জায়গা। ছুটির দিনগুলো ওখানেই কাটাতাম।

আয়ার্ল্যান্ডে একটা রীতি আছে। বেশিরভাগ বই প্রকাশ হয় লেখকের স্থানীয় লাইব্রেরিতে। কিছুদিন আগে থেকে চারদিকে পোস্টার পড়ে যায়। প্রকাশের দিনে উৎসাহী সব পাঠকরা লাইব্রেরির একটা অংশে জড়ো হয়। তাদের সামনে লেখক সামান্য দু-চার কথা বলে বইয়ের উদঘাটন করেন। তা হঠাৎ একদিন পোস্টার দেখলাম ব্রায়ান ওয়াইল্ড-এর নতুন বই 'হোয়েন টাইমট্রাভেল ইজ পসিবল' প্রকাশিত হবে। লেখককে না চিনলেও, টপিকটা খুব ইন্টারেস্টিং। বই প্রকাশের দিন লাইব্রেরিতে হাজির হলাম। অন্যদিনের থেকে ভিড় বেশ বেশি। অবশ্য তাদের মধ্যে বুড়ো-বুড়ি আর বাচ্চাই বেশি।

ঠিক সময়মতো প্রফেসর ব্রায়ান এসে ওনার জন্য রাখা চেয়ারে বসলেন। ছোটোখাটো চেহারা। টাকমাথা। চোখে চশমা। পাকা দাড়ি। খুব উজ্জ্বল চোখ। বয়স ষাটের আশেপাশে হবে। লাইব্রেরির তরফ থেকে একজন প্রফেসর ব্রায়ানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলেন। শুনলাম ট্রিনিটি কলেজের এই প্রফেসারের বেশ কিছু মৌলিক গবেষণা আছে। বই যদিও এই প্রথম।

প্রফেসার মোড়ক কেটে বইটা বার করে তুলে ধরলেন। তারপর ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা তুলে, বাকি আঙুলগুলো মুষ্টিবদ্ধ করে বলে উঠলেন,—টাইমট্রাভেল ইজ পসিবল।

পরবর্তী আধঘণ্টায় যা বললেন তা আমারই বোধগম্য হল না, তো অন্যদের মাথায় কী ঢুকল জানি না! হোয়াইটহোল-ব্ল্যাকহোলকে জুড়লে কীভাবে বহুকোটি আলোকবর্ষ দূরের দুই ব্রহ্মাণ্ড কাছে চলে আসতে পারে, কীভাবে এই ঘূর্ণায়মান ব্ল্যাকহোলের মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করা যেতে পারে, কীভাবে এদের সাময়িকভাবে তৈরি করা যেতে পারে—এসব নানান তথ্য দিয়ে গেলেন। যেটা বুঝলাম তা হল সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন দুই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যাতায়াত করতে পারলে আমরা সময়ের আগে বা পরে যেতে পারব।

বই প্রকাশের অনুষ্ঠানের পরে এগিয়ে গিয়ে প্রফেসর ব্রায়ানের সঙ্গে কথা বললাম। এ বিষয়ে যে আমার দারুণ আগ্রহ আছে তা জানিয়ে ওনার সই করা একটা বই নিয়ে নিলাম।

এর পরে আরও কয়েকদিন ওনার সঙ্গে লাইব্রেরিতে, রাস্তায় দেখা হয়েছে। দেখা হলেই গবেষণা কীভাবে এগোচ্ছে—কী সমস্যা হচ্ছে এসব নিয়ে দু-চার কথা বলে যান। তা একদিন দেখি ঝড়ের বেগে সোউস রোড ধরে হেঁটে যাচ্ছেন, চোখ-মুখ উত্তেজিত। তিন-চারবার ডাকার পর ঘাড়া ঘোরালেন। কথায়-কথায় বললেন ওনার টিম নাকি সৌরজগতের খুব কাছে একটা ব্ল্যাকহোলের সন্ধান পেয়েছেন। তার মাধ্যমে নাকি টাইমট্রাভেল সম্ভব।

—তা অসুবিধেটা কী?

—কস্ট। টাইমট্রাভেল টেস্ট করতে গেলে অনেক-অনেক টাকার দরকার। বলে প্রফেসর আর দাঁড়ালেন না।

।। তিন।।

এরপরে বহুদিন আর প্রফেসর ব্রায়ানের সঙ্গে কোনো দেখাসাক্ষাৎ নেই। এর মধ্যে আমি বেশ কয়েকবার আয়ার্ল্যান্ড আসাযাওয়া করেছি। একদিন কৌতূহলবশত লাইব্রেরিয়ানকেও ওনার কথা জিগ্যেস করলাম। ওরা ওনার লাইব্রেরি কার্ড কম্পিউটারে দেখে বলল উনি নাকি গত তিনমাস লাইব্রেরিতে আসেননি। ওনার নেওয়া কয়েকটা বই ফেরত দেওয়ার দিন বহুদিন হল পেরিয়ে গেছে, অথচ ওনার কোনো পাত্তা নেই।

বয়স্ক লোক। শরীর খারাপ হল না তো! লাইব্রেরি থেকে ওনার বাড়ির ঠিকানা পাওয়া গেল। ১৬, ক্লনটার্ফ রোড, ম্যালহাইড। ম্যালহাইড জায়গাটা সমুদ্রের ধারে। অভিজাত এলাকা।

পরের রবিবার খুঁজে-খুঁজে গেলাম প্রফেসারের বাড়িতে। বিচ থেকে মিনিটপাঁচেক হাঁটা। নীচু পাঁচিল। গেট খুলে ঢুকলে ঘাসের লম্বা লন। বেশ কয়েকটা নানান আকারের ঝাউগাছ। ঘাসগুলো অযত্নে অনেক বড়ো হয়ে উঠেছে। গাছগুলোও অনেকদিন ছাঁটা হয়নি। একতলা বাড়ি। টালির ছাদ। বাড়ির দরজার পাশে কলিংবেল। অনেকবার টিপেও সাড়াশব্দ পেলাম না। এবার দরজার গায়ে লেটার বক্সের দিকে চোখ পড়ল। বেশ কয়েকটা চিঠি ফাঁকেই আটকে গেছে। হাত ঢুকিয়েই বুঝতে পারলাম একগাদা চিঠিপত্রে মুখটা বন্ধ হয়ে গেছে। প্রফেসর নিশ্চয়ই বেশ কিছুদিন বাড়িতে নেই।

পাশের বাড়িতে একজন বৃদ্ধ ঢুকছিলেন। তাঁকে প্রফেসার ব্রায়ানের কথা জিগ্যেস করলাম। বললেন, উনি নাকি দীর্ঘদিনের জন্য আফ্রিকায় বেড়াতে গেছেন। কবে ফিরবেন কেউ জানে না।

এরপরে আমি আমার চাকরির ব্যাপারে এত ব্যস্ত ছিলাম যে প্রফেসার ব্রায়ানের কথা ভাবার আর সময় পাইনি। সেদিন ছিল শনিবার। শীত পুরোদমে পড়ে গেছে। একগাদা গরম পোশাক পরে গ্র্যাফটন স্ট্রিট দিয়ে হাঁটছি। গ্র্যাফটন স্ট্রিট ডাবলিনের সবথেকে নামকরা কয়েকটা

রাস্তার মধ্যে পড়ে। এখানে গাড়ি ঢোকা নিষেধ। শুধু পথচারীদের জন্য লাল ইটের রাস্তা। ডাবলিনের সবথেকে নামিদামি দোকানগুলো এই রাস্তায়। হাঁটতে-হাঁটতে হঠাৎ কী খেয়াল হল, 'ওয়্যারস জুয়েলার্স', বলে একটা ঘড়ির দোকানে ঢুকলাম। দোকানের ভেতরে বেশ ভিড়। রোলেক্সের নানান মডেলের ঘড়ি দেখছি, হঠাৎ শুনি পাশের কাউন্টারে পরিচিত গলা। প্রফেসার ব্রায়ান। সঙ্গে আরেক বৃদ্ধ। দুজনে মিলে ঘড়ি দেখছেন।

আমি ব্রায়ানের সঙ্গে কথা বলার জন্য এগোচ্ছি, হঠাৎ চোখ পড়ল প্রফেসার ব্রায়ানের সঙ্গীর ওপর। ভদ্রলোক পকেট থেকে অদ্ভুত স্বচ্ছ এক ইঞ্চি লম্বা একটা কার্ড বের করে একঝলক কী যেন দেখে নিয়ে আবার পকেটে ঢুকিয়ে দিলেন। খানিকবাদে এদিক-ওদিক তাকিয়ে কেউ দেখছে কি না দেখে নিয়ে ওই কার্ডটা পকেট থেকে বের করে হাতের তালুতে নিলেন। আমার যেন মনে হল কার্ডটা হাতের তালুর সঙ্গে মিশে গেল। আমি সামনের কাচের মধ্যে পুরো ঘটনাটা দেখতে পেলাম। ওই ভদ্রলোক টেরও পেলেন না।

প্রফেসার ব্রায়ান আমাকে দেখে প্রথমে চিনতে পারলেন না। তারপরে লাইব্রেরির কথা বলতে খেয়াল করতে পারলেন। জানালেন আফ্রিকা থেকে কয়েকদিন আগে ফিরে এসেছেন। ওই বাড়িতেই আছেন। কিন্তু সঙ্গের ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার আলাপ করালেন না। আমিও কার্ড হাতে মিশে যাওয়ার অদ্ভুত ব্যাপারটার কোনো উল্লেখ করলাম না। ওনারা কুড়ি হাজার ইউরো দিয়ে একটা রোলেক্স ঘড়ি কিনে দোকান থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি নিজেও ঘড়ি দেখছিলাম। যদিও অত দামের নয়, কাচের কাউন্টারের ওপর হাত রেখেছিলাম। হঠাৎ মনে হল কাচের একটা জায়গা খুব গরম। আশপাশের জায়গা থেকে অনেক বেশি গরম। খেয়াল হল প্রফেসারের সঙ্গী ভদ্রলোক ঠিক ওই জায়গায় হাত রেখেছিলেন। কেন জানি না কীরকম একটা রহস্যের গন্ধ পেলাম। মুহূর্তের মধ্যে ঠিক করে ফেললাম যে ওনাদের পিছু নেব। কোথায় যান দেখব। 'ওয়্যারস' থেকে বেরিয়ে এলাম।

গ্র্যাফটন স্ট্রিটের ভিড়ে কাউকে খুঁজে পাওয়া খুব শক্ত। দেশ-বিদেশের ট্যুরিস্টের ভিড়। রাস্তায় এক জায়গায় একজন ব্যানজো বাজাচ্ছিল। তাকে ঘিরে অনেক লোকের ভিড়। সেই ভিড়ের মধ্যেই একঝলক দেখা পেলাম প্রফেসর ব্রায়ানের। খানিকবাদে বাজনা থামতে ওনারা সেন্ট স্টিকেন্স গার্ডেনের দিকে হাঁটতে শুরু করলেন। গ্র্যাফটন স্ট্রিটের শেষপ্রান্তে দৃষ্টিনন্দন স্টিফেন গ্রিন শপিং কমপ্লেক্স। তার পাশেই ওনাদের গাড়ি পার্ক করা ছিল। গাড়ি নিয়ে ওনারা ও'কোনেল স্ট্রিটের দিকে রওনা দিলেন।

আমার গাড়ি গ্র্যাফটন স্ট্রিটের অন্যদিকে রাখা। তাই একটা ট্যাক্সি ধরলাম। ও'কোনেল স্ট্রিট, ন্যাসাও স্ট্রিট ধরে ওদের গাড়ি ফিনিক্স পার্কের দিকে এগিয়ে চলল। ওদিকটা আমার বিশেষ

চেনা নয়। আমার ট্যাক্সি শুধু এ-রাস্তা ও-রাস্তা হয়ে ওই গাড়ির পিছন-পিছন চলল।

প্রায় একঘণ্টা পরে গাড়িটা একটা জর্জিয়ান স্টাইলের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। বড়ো-বড়ো কাচের জানলা। লাল ইটের বাড়ি। জানলার ওপরে আর্চ।

আমার ট্যাক্সিটা এমন একটা জায়গায় দাঁড় করালাম যাতে ওনাদের চোখে না পড়ে। ভাড়া মিটিয়ে বাড়িটার দিকে এগোলাম। ওনারা ইতিমধ্যেই বাড়িতে ঢুকে গিয়েছিলেন। বাড়ির দরজার কাছে পৌঁছে কী করব ভাবছি। হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল। প্রফেসর ব্রায়ান বেরিয়ে এসে বললেন,—এসো অনিলিখা, তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। শুধু-শুধু খরচ করে ট্যাক্সিতে এলে। আমাদের সঙ্গেই আসতে পারতে।

খানিকটা অপ্রস্তুত হলেও আমি সামলে নিয়ে বললাম,—আপনার সঙ্গে আরেকটু কথা বলার সুযোগ ছাড়তে পারলাম না।

—আর মি. রুপেলের সঙ্গে? মুচকি হেসে ব্রায়ান আমাকে নিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকলেন। ঢুকেই বাঁ-দিকে বড়ো ড্রয়িংরুম। সেখানে ঢুকেই 'ওয়্যারস'-এর সেই ভদ্রলোকের দেখা পেলাম। লেদারের সোফায় বসে একটা ছোটো বই-এর সাইজের ল্যাপটপে কীসব কাজ করছেন।

ভদ্রলোকের বয়স ব্রায়ানের মতোই হবে। মাথায় পাকা চুল। চোখ-মুখ তীক্ষ্ন, কিন্তু মুখটা ভাবলেশহীন। আমাকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে করমর্দন করলেন। প্রফেসার ব্রায়ান ফায়ার প্লেসটা জ্বেলে দিয়ে আমার আর রুপেলের জন্য সামান্য রেড ওয়াইন নিয়ে এসে সোফায় বসলেন।

—মিঃ রুপেলকে দেখে কি মনে হয় যে ওনার বয়স ১৪০?

—একশো চল্লিশ! ওনার বয়স সত্তরের বেশি বলে তো মনে হয় না! একশো চল্লিশ কী করে হবে? সবথেকে বেশি বয়সি জীবিত যিনি আছেন তাঁরই বয়স তো একশো দশ।

ব্রায়ান হেসে উঠলেন,—মি. রুপেল কিন্তু তোমার থেকে বয়সে অনেক ছোটো।

মি. ব্রায়ান আমার সঙ্গে সমানে হেঁয়ালি করছেন দেখে অবাক হলাম। বললাম,—মি. রুপেলের বয়স তাহলে কত?

—যে দুটো কথা বললাম, দুটোই ঠিক। ওনার জন্ম ২৫২৫ সালে।

আমার হাত থেকে ওয়াইনের গ্লাসটা প্রায় পড়েই যাচ্ছিল। ইতিমধ্যে মি. রুপেল একটা অদ্ভুত কাজ করলেন। ডান হাত দিয়ে বাঁ-হাতের মধ্যমা ছুঁয়ে বলে উঠলেন,—লুক।

সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম আমাদের প্রত্যেকের বসার পজিশন আর ঘরের আসবাব পরিবর্তিত হয়ে গেল।

মিঃ ব্রায়ান বলে উঠলেন,—এক্ষুনি রুপেল যেটা দেখাল সেটা ভার্চুয়াল রিয়ালিটির নিপুণ উদাহরণ। একটা পরিবর্তিত ছবি আমাদের অনুভূতি কেন্দ্রগুলোর ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হল। ওরা আজকাল এভাবে হাসপাতালে বাড়ির পরিবেশ তৈরি করে। বাড়িতে নকল অতিথিদের ডেকে এনে এভাবে আড্ডা মারে। বিজ্ঞান যে কত এগিয়ে গেছে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না।

অবিশ্বাসী চোখে মি. রুপেলের দিকে তাকিয়ে আছি দেখে ব্রায়ান ফের বলে উঠলেন,—বলেছিলাম না টাইমট্রাভেল একদিন সম্ভব হবে। তা রুপেল, কবে তোমরা টাইমট্রাভেল প্রথম আয়ত্ত করলে? তোমার ল্যাঙ্গোয়েজ ট্রানস্লেটার ব্যবহার করে আমাদের সমসাময়িক ইংরেজিতে বলো। বলে আমার দিক ফিরে ফের বলে উঠলেন,—ওদের ভাষা এখন অনেক সংক্ষিপ্ত ও সাংকেতিক হয়ে গেছে। ওদের ইংরেজি কিছুই বোধগম্য হবে না।

মি. রুপেল সহজবোধ্য ইংরেজিতে আস্তে আস্তে বলতে শুরু করলেন,—২৫২০ সালে টাইমট্রাভেলের পরীক্ষা প্রথম সফল হয়। একজন ভারতীয় বিজ্ঞানী টাইমট্রাভেলের জন্য যন্ত্র আবিষ্কার করেন তার পনেরো বছর পরে। ওই যন্ত্রের সাহায্যে দুজনের টিম দশবছর অতীতে খাওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু সেখানেই বিপত্তি। তাঁদের যাত্রা সফল হয়। কিন্তু অতীত থেকে তাঁরা যখন ফিরে আসেন, তখন কল্যাণে বর্তমানই গেছে পালটে। এরপর টাইমট্রাভেল নিয়ে ফের নানারকম গবেষণা, পরীক্ষানিরীক্ষা চলে। ২৫৫০ সালে এ সমস্যার সমাধান হয়। ফের চালু হয় টাইমট্রাভেল।

—তা সমস্যা সমাধান হল কী করে?

—মূল সমস্যা ছিল অতীতে গিয়ে কোনো কিছু পরিবর্তন করে দিলে, যেখান থেকে যাত্রা শুরু, সেখানে আর ফেরা যায় না।

—তাই এই যে আপনি রোলেক্স ঘড়ি কিনলেন, তার জন্যও তো ভবিষ্যৎ পরিবর্তিত হয়ে গেল। তাই না!

—না, অত সহজে সবকিছু পালটে যায় না। তবে হ্যাঁ, আমি যদি ঘড়ি চুরির দায়ে ধরা পড়তাম, তাহলে হয়তো যেখান থেকে এসেছি সেখানে ফিরতে পারতাম না তবে অতীতে গিয়ে যাতে বড়ো ধরনের কোনো পরিবর্তন না ঘটাই, তার জন্য একটা যন্ত্র আবিষ্কার হয়। আজকাল ট্রাইমট্রাভেলে কেউ গেলে তার হাতে বাধ্যতামূলকভাবে ওই যন্ত্র লাগিয়ে দেওয়া হয়। বলে রুপেল হাত থেকে একটা কার্ড বের করে আনলেন। এই কার্ডটাই আমি দোকানে দেখেছি।

ফের বলে ওঠেন,—দেখে মনে হবে সামান্য কার্ড, কিন্তু এর মধ্যেই মানবসভ্যতার যাবতীয় ইতিহাস, খুঁটিনাটি তথ্য ঢোকানো আছে। যখনই এই কার্ড দেখে যে টাইমট্রাভেলের জন্য নথিভুক্ত ইতিহাস পালটে যাচ্ছে, তখন কারেকটিভ অ্যাকশন নেয়। ইতিহাস যাতে না পালটে যায়। তা না হলে ফিরে দেখা যাবে বর্তমানই পালটে গেছে।

এবার মি. ব্রায়ান বলে ওঠেন,—মি. রুপেল কিন্তু বিজ্ঞানী নন। উনি নামকরা ঐতিহাসিক। ওনার যাত্রার উদ্দেশ্য ইতিহাসকে যাচাই করে ঠিকভাবে রেকর্ড করা। আর সে উদ্দেশ্যেই উনি অতীতের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছেন। ওই তথ্যই ঢুকে যাবে ওই কার্ডের পরবর্তী আপগ্রেডে। এর আগে উনি নীরোর রোমে গিয়েছিলেন। এখানে আসার উদ্দেশ্য আমার সঙ্গে দেখা করা। আমার বইতে লেখা সূত্রের ওপরেই টাইমট্রাভেলের গবেষণা পরে সফল হয়।

—প্রফেসর ব্রায়ানকে আমাদের সময় সবাই চেনে। পাঁচশো বছর আগে উনি যে এসব ভেবেছিলেন তা ভাবাই যায় না।

খানিক থেমে মি. রুপেল ফের বলে ওঠেন—এই গবেষণার প্রথম বড়ো পদক্ষেপ মি. ব্রায়ানের পার্টিকল অ্যাকসিলেটারের সূত্র। তবে তাতে অনেক পদ্ধতিগত সমস্যা ছিল যার জন্য পাঁচশো বছর তার প্রয়োগ করা হয়নি।

এবার আমি আর প্রশ্ন না করে পারি না,—টাইমমেশিন ঠিক কীরকম হয় তা নিয়ে আমার খুব কৌতূহল আছে। টাইমমেশিন মানেই তো মহাকাশযান। তা অত বড়ো জিনিস তো আর বাড়িতে রাখা সম্ভব নয়।

—কে বলল সম্ভব নয়? যদি বলি এ-বাড়িতেই রাখা আছে। বলে মি. রুপেল ঘরের কোণের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন। ছোটো একটা ৬ বাই ৬ ফুটের কাচের ঘর। মধ্যে তিনটে সিট। অত্যন্ত ছোটো-ছোটো যন্ত্রপাতি, প্যানেল, সুইচ।

—এটা যখন গ্যারেজে রাখা আছে। একধরনের পার্টিকল অ্যাকসিলেটার। এর সাহায্যে আমরা কৃত্রিম ওয়ার্মহোল তৈরি করে তার মাধ্যমে অতীতে বা ভবিষ্যতে যাতায়াত করি। ন্যাচারাল ব্ল্যাকহোলের ওপর নির্ভর করতে হয় না।

আমার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে মিঃ রুপেল ফের বলে উঠলেন,—তা তুমি কি এতে যেতে চাও? অতীতে যেতে পারো। তবে একটাই শর্ত। তোমার ভূমিকা হবে শুধু দর্শকের।

—অবশ্যই, আমি সব শর্ত মানতে রাজি।

—তা তুমিই বলো কোথায় কোন বছরে যেতে চাও?

—আগ্রা, ১৬৫৩ সাল।

—সেখানে কী আছে?

—তাজমহল। পৃথিবীর সর্বকালের সেরা স্থাপত্যের মধ্যে একটা। ১৬৫৩ সালে তাজমহল তৈরি প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল।

—তা এত কিছু থাকতে হঠাৎ তাজমহল?

—তাজমহলের শিল্পকর্ম, স্থাপত্য ছোটোবেলা থেকে আমাকে খুব আকর্ষণ করে। তা ছাড়া মুঘল সাম্রাজ্যের ওই সময়ের হাল-হকিকতও দেখা যাবে। আর ইতিহাসে দেবার মধ্যে তো যুদ্ধ-বিগ্রহ। ওসবের মধ্যে গিয়ে টেনশন বাড়িয়ে কী লাভ!

—ঠিক বলেছ। এমনিতেই তাজমহলে যাওয়া আমার এজেন্ডার মধ্যে ছিল। একজন ভারতীয়কে সঙ্গী পাব আশা করিনি। ধর্মের জন্য রাজনৈতিক কারণে আমাদের ইতিহাস এত বিকৃত হয়ে গেছে যে ঠিক কী ছিল তা জানতেই আমার আসা। অতীতকে সঠিকভাবে না ধরে রাখতে পারলে কী করে বুঝতে পারব যে আমরা অতীতকে পরিবর্তন করে ফেলছি না!

—তাহলে আর কী! কালই যাওয়া যাক। শুভস্য শীঘ্রম। ব্রায়ান বলে উঠলেন।

।। চার ।।

পরের দিন অবশ্য যাওয়া হয়নি। পুরোদিন যাওয়ার প্রস্তুতিতেই কেটে গেল। মুঘল আমলের পোশাক জোগাড় করতে হয়েছে। ল্যাঙ্গোয়েজ ট্রানস্লেটর লাগিয়ে তৎকালীন পারসি ভাষা একটু প্র্যাকটিস করতে হয়েছে। এর মাঝে মি. রুপেল কী একটা যন্ত্র আমার মাথায় লাগিয়ে দিলেন। বললেন, ইতিহাসজ্ঞান হবে। যন্ত্রণা একমিনিট পরে খুলে নেওয়া হল। তখনই মনে হল আমি ওই সময়ের জীবনযাত্রা, তাজমহল, শাহজাহান, তৎকালীন লোকাচার-সুফি চিন্তাভাবনা সম্বন্ধে অনেক ওয়াকিমহাল হয়ে গেছি। যেমন দিল্লি তৎকালীন নাম ছিল শাহজাহানাবাদ। শাহজাহান শাহজাহানাবাদকে রাজধানী ঘোষণা করেন ১৬৪৮ সালে। তাজমহলের মূল স্থপতি ছিলেন পারসি স্থপতি ইসা খান এফেন্দির ছাত্র ওস্তাদ আহমেদ লাহোরী। বুঝলাম, এরকম বেশ কিছু বিক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক তথ্য আমার মাথার পুরে দেওয়া হয়েছে।

মি. রুপেল দেখি বিড়বিড় করে বলে যাচ্ছেন,—আর্জুমান্দ বায়ুকোম। মুমতাজের আসল নাম।

পরদিন সকাল ন-টায় আমরা যাত্রা শুরু করলাম। সুইচ অন করার সঙ্গে-সঙ্গেই মনে হল অকল্পনীয় গতিতে কোথায় ছুটে চলেছি। তারপরেই আর কিছু মনে নেই—জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম।

যখন জ্ঞান ফিরল, সারা গায়ে ব্যথা। টাইমমেশিনের মধ্যেই একটা ধানখেতের মধ্যে এসে পড়েছি। ভোর হচ্ছে। টাইমমেশিন থেকে বেরিয়ে এলাম।

—তুমি ১৬৫৩-তে এসে গেছ অনিলিখা। মাথার ওপরের এই আকাশ, এই ধানখেত, দূরে যে মাটির বাড়ি দেখছ—সব ১৬৫৩-র আমরা ঠিক একঘণ্টা এখানে থাকব।

—যন্ত্রটার কী হবে?

—ওটা নিয়ে চিন্তা কোরো না। ওটা গিরগিটির মতো রং পরিবর্তন করে ধানখেতের মধ্যে মিশে যাবে। চলো তাজমহলের দিকে এগোনো যাক।

মিনিটপাঁচেক হাঁটা পরে ধানখেত ছেড়ে মাটির রাস্তায় উঠলাম। চারদিকে ফাঁকা মাঠ। দূরে-দূরে দু-একটা মাটির বাড়ি। আরও মিনিটপাঁচেক হাঁটার পরে একজন চাষির সঙ্গে দেখা হল। আমরা মুমতাজের সমাধিক্ষেত্র কোথায় তৈরি হচ্ছে বলতে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিল। চারক্রোশ পথ হেঁটে, নাকি আধঘণ্টা। টাইমমেশিনে অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ দিতে সামান্য ভুল হয়েছিল নিশ্চয়।

ভাগ্য ভালো। খানিকবাদে একটা ঘোড়ার গাড়ি দেখতে পেলাম। এটা নাকি কোন এক খানাজাদের গাড়ি। খানাজাদ বলতে সরকারি কর্মচারী বোঝায়। ভাড়া পেলে আমাদের নিয়ে যেতে রাজি। বুঝলাম দুর্নীতি তখন থেকেই ছিল। সরকারি গাড়ি ভাড়ায় খাটাচ্ছে। আমরা কিছু বলার আগেই বিশুদ্ধ পারসিতে বলে উঠল,—তাজমহল তো?

ও কী করে বুঝল জিগ্যেস করতে দৃপ্তভাবে বলে উঠল,—সব ট্যুরিস্ট তো ওখানেই যায়!

মি. রুপেল অযাচিতভাবে আমাদের পরিচয় জানালেন। আমরা নাকি মুঘল সম্রাটের আমন্ত্রিত ফ্রেঞ্চ জুয়েলার ট্যাভারনিয়ার-এর বন্ধু। বলে ট্যাভারনিয়ার-এর গুণকীর্তন শুরু করলেন। বুঝলাম মি. রুপেল, ওনার সদ্যলব্ধ ইতিহাসের জ্ঞান জাহির করছেন।

আমিও খানিকক্ষণের মধ্যে পারসি ভাষায় কোচোয়ানের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলাম। পাঁচশো বছর আগের কারুর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ তো আর বারবার আসে না। তা কথাপ্রসঙ্গে জানলাম সম্রাট কান্দাহার নিয়ে যুদ্ধে খুব ব্যস্ত। ওদিকে আহমেদনগরে বিদ্রোহ শুরু হয়েছে। বাংলার পোর্তুগিজরা মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। মনসবদারেরা বাড়ি-বাড়ি গিয়ে হানা দিচ্ছে। সমর্থ লোক দেখলেই সেনাদলে ভরতি করে নিচ্ছে। চাষবাসের অবস্থা তাই খুব খারাপ। ওদিকে আবার সম্রাটের নানারকম শখ। লালকেল্লা, আগ্রাদুর্গ, জুম্মা মসজিদ—তৈরি করতে যুদ্ধবিগ্রহের খরচ চালাতে গিয়ে রাজকোষ ফাঁকা হয়ে গেছে। তাই নানান ধরনের ট্যাক্স বসানো হয়েছে।

এসব কথার মধ্যে দেখি উলটোদিকের রাস্তা দিয়ে অনেকগুলো ঘোড়সওয়ারি আসছে। সামনে ঘোড়ায় সুসজ্জিত এক সৈনিক। অবাক হলাম আমাদের দেখে বিন্দুমাত্র কৌতূহল প্রকাশ করল না। চলে যাওয়ার পরে কোচোয়ান আলিমর্দন খান বলে উঠল,—এখানকার ফৌজদার। এখানকার সরকারের প্রধান।

বলতেই 'আইন-ই-আকবরি'-র কথা খেয়াল হল। অনেকগুলো গ্রাম মিলে মহল আর অনেকগুলো মহল মিলে সরকার। ফৌজদার তাই বড়োরকমের সরকারি পোস্ট। এখনকার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট।

ব্রায়ান বলে উঠলেন,—তা আমাদের খেয়াল করেনি? আমাদের দেখে তো বিদেশি মনে হওয়া উচিত।

আলিমর্দন বলে উঠল,—আপনাদের দেখে ট্যুরিস্ট ভেবেছেন।

—ট্যুরিস্ট?

—তাজমহলের তো টাকার অভাবে তৈরির বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। নানান দেশ থেকে যেসব শ্রমিক, কারিগর, শিল্পীরা, এসেছিল—তারাও ফেরত চলে গিয়েছিল। মূল সমাধি গড়ার কাজ অবশ্য শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তারপর মাকরানা মার্বেল আর আরও সব দামি পাথর কিনতে গিয়ে রাজকোষ প্রায় ফাঁকা। বছরদশেক কাজ বন্ধ ছিল। তারপর ট্যুরিস্ট আসতে শুরু করল। আপনাদের মতো দেখতে। ধীরেসুস্থে হাঁটে—মিনমিন করে কথা বলে। গায়ে জোর নেই। প্রথমেই সবাই এসে জিগ্যেস করত 'তাজমহল কোথায়?' খুব সুন্দর পারসিতে কথা বলে ওরা। আমরা অত ভালো বলি না। তা তাজমহল তো তখন প্রায় ফাঁকা মাঠ! তারপর ওরাই খরচ করে ওদের যন্ত্র দিয়ে কাজ শুরু করল। কোন মুলুক থেকে ওসব যন্ত্র আমদানি করে কে জানে? সেসব আজব যন্ত্র। এখন আবার কাজ ভালোই এগোচ্ছে। শেষ হলে দেখার মতো জিনিস হবে। সম্রাট অবশ্য ফরমান দিয়েছেন ট্যুরিস্টদের সঙ্গে কাজের বাইরে একদম মেলামেশা না করতে।

মি. রুপেলকে বিশুদ্ধ ইংরেজিতে বলতে শুনলাম,—ও মাই গড!

।। পাঁচ ।।

আর মিনিটখানেকের মধ্যেই আমরা তাজমহলের কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম। দূরে তাজমহলের গম্বুজে সোনার কাজ চলছে। কোমাৎসু কোম্পানির এক্সক্যাভেটর তার বিশাল-বিশাল রোবোটিক্স হাত বাড়িয়ে মাটি খুঁড়ছে। মাকড়সার মতো দেখতে কয়েকটা রোবট মিনারগুলোর গা বেয়ে উঠে পাথর পালিশ করছে। কিছু রোবট আবার চারদিকের বাগানের জন্য মাটি উঁচু করার কাজ করছে। আমাদেরই মতো অনেক লোক হাতের তালুর সাইজের ওয়্যারলেস ল্যাপটপ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মি. রুপেল বললেন ওগুলো দিয়েই সব রোবট নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। তবে সবাই যে ওদের মতো তা কিন্তু নয়। বেশ কিছু লোককে দেখলেই বোঝা যায় যে তারা ওই সময়ের। আলিমর্দনের মতো পোশাক-আশাক, চেহারা। একজন সুসজ্জিত দাঁড়িওয়ালা রাজবেশী লোককে দেখে ব্রায়ান বলে উঠলেন,—শাহজাহান?

আলিমর্দন হেসে বলে উঠল,—সম্রাট এভাবে এখানে আসবেন? উনি হলেন পারস্যের হস্তলিপি বিশারদ আমানত খান। সব লেখা খোদাইয়ের কাজ উনিই দেখছেন।

বুঝলাম বিশেষ কিছু কাজে লোকেরাও নিযুক্ত আছে। আর ট্যুরিস্টরা হল টাইমট্রাভেল করে ভবিষ্যৎ থেকে আসা লোকজন। তাজমহল দেখতে এসে আটকে পড়েছে। তাজমহলের কাজ শেষ না করে বেরোতে পারছে না। অতীতকে ঠিকমতো না তৈরি করতে পারলে ওদের আর ফেরা সম্ভব হবে না। কারণ ওদের গায়ে লাগানো কার্ড ফিরে যাওয়া অ্যালাউ করবে না। কার্ডের হিসেবে তাজমহল আছে। সত্যিকারে যদিও নেই।

আমরা বেশিক্ষণ থাকিনি। ঠিক একঘণ্টা বাদেই ফিরে এসেছিলাম ২০০৬-এ। আসার পরে মি. রুপেল বলেছিলেন,—তাজমহলের কথা একইরকম রেখে দেব। অতীতের তো একটা ভিত্তি থাকতে হবে!

খানিকক্ষণ থেকে অনিলিখাদি ফের বলে উঠল,—ভালোই করেছ বিশ্বজিৎ, তাজমহল দেখে এসেছ। তোরাও তাড়াতাড়ি দেখে আসিস। বলা যায় না, কালকে যদি ওরা অন্যরম কিছুকরার কথা ভাবে।

বিশ্বজিৎদা খুকখুক করে কেশে মুচকি হেসে বলে ওঠে,—অনিলিখা, আজ তোমার চালে সামান্য ভুল হয়ে গেছে। গল্পটায় একটা বড়ো মিসটেক করে বসে আছ। আচ্ছা, সবাই ভবিষ্যৎ থেকে গিয়ে আটকে পড়ে গেল যাতে নথিবদ্ধ ইতিহাস পরিবর্তিত না হয়ে যায়। অথচ তোমার গেলে ড্যাংড্যাং করে, আবার বহাল তবিয়তে ফিরে এলে। তোমারও তো তাজমহল তৈরিতে হাত লাগানো উচিত ছিল। বলে আমাদের দিকে তাকিয়ে বিশ্বজিৎদা ফের বলে উঠল, —তাজমহল কে করেছে? দ্য লেডি আর্কিটেক্ট অনিলিখা।

অনিলিখাদি সপ্রতিভভাবে উত্তর দিল,—বুদ্ধিমান কাউকে যে এতটা বুঝিয়ে বলা দরকার, জানা ছিল না! আচ্ছা, যারা ইতিহাস লিখতে যায়, তারা কি কখনো ওরকম কার্ড নিয়ে ট্রাভেল করে! মি. রুপেল তো ইতিহাস রচনা করতে গিয়েছিলেন, নিশ্চিত না হয়ে উনি কি এমনভাবে ট্রাভেল করবেন যাতে উনি নিজেই আটকে যান!

ঘটনার আটাশ ঘণ্টা বাদে

১

ঘটনার চার ঘণ্টা পরে

আজকের সকালটা যে অন্যরকম তা বোঝার জন্য রেডিয়ো চালাতে হয়নি নগেনকে ভোররাতের দিকে বাইরে হইচই শুনে ও ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল। গতকাল অনেক রাত করে ফিরেছে। কলকাতার বাইরে কাজের ডিউটি ছিল। ভেবেছিল, বেলা করে উঠবে। সকালের ডিউটি নেবে না। কিন্তু কপাল মন্দ। ঘুমের মধ্যেই বাইরে হইচই হচ্ছে শুনে তাড়াতাড়ি করে বাইরে এসে দাঁড়াল। বাইরে এসো যা দেখল, তাতে কিছুক্ষণ মুখে কোনো কথা এল না।

সবুজ, বেগুনি, নীল— নানান রঙের আলোয় রাতের আকাশ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। চারদিক দিনের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। রাস্তার সব আলো নিভে গেছে। যেন কোনো ম্যাজিশিয়ান আকাশের খোলা মঞ্চে ইচ্ছেমতো রঙের খেলা দেখাচ্ছে। অবাক হয়ে ও তাকিয়ে ছিল আকাশের দিকে। অনেকক্ষণ।

তারপর প্রায় চার ঘণ্টা কেটে গেছে। এখনও চারদিকে

লোডশেডিং। বাইরে এখনও অনেক লোক হতবাক হয়ে ঘোরাঘুরি করছে। চারদিকে ব্ল্যাকআউট। কেউই কিছু জানে না। শোনা যাচ্ছে, ট্রান্সফর্মার পুড়ে গেছে।

পাশের বাড়ির মহিমদাদু কলতলায় দাঁড়িয়ে নিমের দাঁতন দিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে বলে বেড়াচ্ছে, বুঝলি, এ হল কলির শেষ। এত অন্যায়, এত অন্যায়। আর কতদিন পৃথিবী সইবে বলো। শেষ সময় এসে গেছে। তা না হলে রাতের আকাশে ওরকম ভূতের আলোর নেত্য দেখতে হয়!

মহিমদাদুর ছেলে বেশ কয়েক বছর ধরে নিখোঁজ। দুই নাতি-নাতনি আর বউমা নিয়ে এখন মহিমদাদুর কষ্টের সংসার। সেসব থেকেই রাগ বোধহয়।

কিন্তু এটা ঘটনা যে চারদিকে সবাই হতভম্ব হয়ে গেছে।

নগেনের দু-তিনজন কলেজ পাশ বন্ধু আছে। তারা যদি কিছু বলতে পারে। কিন্তু ফোন করতে গিয়ে অবাক হয়ে গেল নগেন। নেটওয়ার্ক নেই। ফোন করা যাচ্ছে না। বাড়ি থেকে

বেরিয়ে চেনাজানা কয়েকজনের ফোন থেকে ফোন করতে গিয়ে দেখল, তাদের ফোনেরও একই হাল। কারোরই ফোনে নেটওয়ার্ক নেই।

বাড়ি থেকে পাঁচ মিনিট হাঁটলে বাজার। আজ হাট বসার দিন। কিন্তু হাট আজ তেমন জমেনি। মাত্র কয়েকজন তরিতরকারিমাছ নিয়ে বসেছে। বাজারে স্থানে স্থানে জটলা। সবার মুখে একই আলোচনা। কী হয়েছে? কী ব্যাপার?

পার্টির দাদারাও ভ্যাবাচ্যাকা মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে। রামু এ পাড়ার এক উঠতি দাদা। সিগারেটের ধোঁয়া নগেনের মুখের উপরে ছেড়ে রামু বলে উঠল, নিউক্লিয়ার অ্যাটাক। চীন ভারতকে আক্রমণ করেছে। আর কী? আমি আগেই জানতাম। কিছু করতে পারলাম না এই যা আপশোস রয়ে গেল।

—সে কী? আপনি কী করে জানলেন?

—আরে সেসব খবর আমাদের কাছে ঠিক চলে আসে। সব খবর তো আর তোদের দেওয়া যায় না। তবে এতো তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা যে ঘটবে তা আন্দাজ করতে পারিনি। বুঝলি, শেষদিন এসে গেছে। কাল আর দেখব কি না তা-ই সন্দেহ। তা পুজোর চাঁদাটা আজই দিয়ে দিস।—বলে হড়বড়িয়ে অন্যদিকে এগিয়ে গেল।

নগেনের এখনও বিয়ে হয়নি। ও একাই থাকে এই পাঁচমুড়ি গ্রামে। এখানে ও নতুন একটা ছোটো বাড়ি করেছে। এই দু-বছর হল। সত্যিই কি তবে আজ শেষ দিন?

যে মানুষটার জন্য পায়ের নীচে মাটি পাওয়া গেছে, শেষদিনে তাকে না দেখলে কী করে হবে? আজকের দিনে সেই দেবতুল্য মানুষটা ঠিক আছেন তো? শুনেছে, আগের বাড়ি ছেড়ে উনি এখন এক চব্বিশতলার ফ্ল্যাটের উপরতলায় একা থাকেন। কোনো বড়ো বিপদে পড়েননি তো?

নগেন মুহূর্তে ঠিক করে ফেলল, কলকাতায় যাবে সেই গৌতমবাবুর সঙ্গে দেখা করতে। গাড়ি চালিয়ে যেতে আড়াই ঘণ্টা লাগবে। আজকের এই গাড়ি-বাড়ি সবই ওঁর জন্যই। না হলে নগেনের যে কী হত বলা মুশকিল।

ওর বাড়িতে গাড়ি চালাত নগেন। বাবাকে খুব কম বয়সে হারায় নগেন। বাড়িতে রোজগেরে অন্য কেউ না-থাকায় মাত্র আঠেরো বছর বয়সে কাজে নেমে পড়তে বাধ্য হয়। গাড়ি চালানোর হাত ভালো ছিল না। সবে তখন শিখেছে। তবু গৌতমবাবু ওর অবস্থা দেখে ওকে ওর দামি গাড়ি চালানোর ভার দেন। একই সঙ্গে ওর এটা পছন্দ ছিল না যে নগেন পড়াশোনা না করে সারাজীবন শুধু গাড়ি চালিয়ে যাবে। এজন্য একটা ডিপ্লোমা কোর্সেও ভরতি করে

দেন। এমনকী মাইনে না কমিয়ে ডিউটির সময় অনেক কম করে দেন যাতে নগেন পড়াশোনা করার সময় পায়।

বলতেন, বুঝলি, ইচ্ছে থাকলে সবকিছুই করা যায়।

কয়েক বছর পড়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সে পড়াশোনা ওর আর হল না। ওর মাথায় ঢুকত না। বরঞ্চ ওই গাড়ির কলকবজার ব্যাপারটা ওর মাথায় সহজে ঢুকত। শেষে ঠিক করে নিজে গাড়ি কিনে ব্যাবসা করবে। তাতেও গৌতমবাবু উৎসাহ দেন। ওকে প্রায় জোর করে টাকা দিয়ে সাহায্য করেন, যাতে ও নিজে একটা গাড়ি কিনতে পারে।

সেই শুরু। কিছুদিন পরে রোজগার করে সে টাকা ফেরত দিতে গিয়েছিল নগেন। নেননি গৌতমবাবু।

আজ উনি একা দক্ষিণ কলকাতার একটা ফ্ল্যাটে থাকেন। এই বিপদের দিনে যদি আজ নগেন না ছুটে যায় ওর কাছে, তবে আর কবে যাবে?

গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল নগেন।

ঘটনার আট ঘণ্টা বাদে

ভেবেছিল, গাড়িতে করে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাবে। কয়েক মাইল যেতেই রাস্তায় ট্র্যাফিক জ্যামে আটকে পড়ল নগেন। সার দিয়ে গাড়ি পর পর দাঁড়িয়ে পড়েছে। কী ব্যাপার বুঝতে গাড়ি থেকে নেমে একটু হেঁটে এগিয়ে গেল নগেন। মাইলের পর মাইল জুড়ে লাইন। পেট্রোল পাম্পে তেল দেওয়া নাকি বন্ধ করে দিয়েছে। তা-ই নিয়ে কিছু দূরে রাস্তায় গণ্ডগোল বেধেছে। তেল নাকি আগামী কয়েকদিন পাওয়া যাবে না।

প্রায় সব দোকানেই বিশাল লাইন। একটা মুদির দোকানের সামনে তো রীতিমতো মারপিট চলছে। বাইরে বড়ো লাইন পড়ে গেছে। সবাই ঢুকতে চায়। বেশ কিছুদিনের জন্য খাবার কিনে রেখে দিতে চায় এ পরিস্থিতিতে। কী হবে, কেউ জানে না! নানান খবর বাতাসে উড়ছে।

এখনও সর্বত্র ব্ল্যাক আউট। সব ট্রান্সফর্মার নাকি পুড়ে গেছে। তাই রাস্তায় জায়গায় জায়গায় জটলা।

সবাই ভীতসন্ত্রস্ত। তবু তার মধ্যে ধৈর্য ধরে টিকটিক করে গাড়ি চালিয়ে এগোতে লাগল। অবশেষে এমন একটা জায়গা এল যেখানে গাড়ি আর প্রায় নো নড়নচড়ন। খবর নিয়ে জেনেছে, ট্রেনও চলছে না। তাই সব প্রেশার এসে পড়েছে সড়কব্যবস্থার উপরে।

নাহ, গাড়ি নিয়ে আর যাওয়া যাবে না। হেঁটে আর কত সময়ই বা লাগবে! কুড়ি মাইল বাকি আর।

হেঁটে, তারপরে সুযোগ বুঝে বাসে ওঠা গেলে ঘণ্টা খানেকের মধ্যে পৌঁছে যাবে। গাড়িটাকে রাস্তার ধারে রেখে হেঁটে এগিয়ে চলল নগেন।

এরকম অবস্থা আগে কখনো দেখেনি। লোকেরা যেন হঠাৎ করে কয়েকশো বছর পিছিয়ে পড়েছে। ফোনে নেটওয়ার্ক নেই, খাবার নেই, জল নেই, কোথাও বিদ্যুৎ নেই।

২

একটা সময় গৌতমবাবুর অনেক আত্মীয়—বন্ধু ছিল। উত্তর কলকাতার বিশাল বাড়িতে লোকেদের আনাগোনা সব সময় লেগে থাকত। কিন্তু আজ আর সে দিন নেই। স্ত্রী মারা গেছে বেশ কয়েক বছর। একটা সময় বিশাল ব্যাবসা একা হাতে সামলেছেন। এখন ব্যাবসার দায়িত্ব ভাইপোর হাতে ছেড়ে দিয়ে ব্যাবসার থেকে দূরে সরে এসেছেন।

অন্যদিন সকালে উঠে বিছানার পাশে হাত বাড়িয়ে কিশোরী আমোনকারের বিভাস রাগের সিডি-টা প্রথম চালান। বহুদিনের অভ্যাস। কিন্তু আজ মিউজিক সিস্টেমে গান চালু করতে গিয়ে বুঝলেন লোডশেডিং।

একই সঙ্গে বুঝলেন আজকের দিনটা যেন একটু অন্যরকম। একটা অন্য ধরনের সবজে—বেগুনি আলো জানলা দিয়ে এসে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে।

কিছুদিন আগে স্ট্রোকে ওর শরীরের বাঁদিকটা প্রায় অচল হয়ে গিয়েছে। সাহায্য ছাড়া তাই ঘরে হাঁটাচলা করতে পারেন না। খুব জলতেষ্টা পেয়েছে। অন্য ঘরের থেকে জল আনাটাও ওর কাছে আজ একটা অ্যাডভেঞ্চার।

ওর চব্বিশ ঘণ্টা দেখাশোনার জন্য দুজন নার্স আছে। প্রথমজন সকাল ছ-টা হলে চলে আসে। অন্যদিন দেরি করে না। আজ কিন্তু ছ-টা, সাড়ে ছ-টা বেজে গেল, তার আর দেখা নেই। অন্যদিকে বহুদিনের কাজের ফুলটাইম লোকটা গতকাল দু-দিনের জন্য ছুটি নিয়েছে। খবর পেয়েছে বাড়িতে মা-র শরীর খারাপ। আজ সকালে একজন নতুন লোক আসার কথা। তারও দেখা নেই। অবশ্য এখনও সময় আছে।

বেশ খানিকক্ষণ অপেক্ষার পরে অনেক কষ্ট করে হুইলচেয়ারে উঠে বসে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। ড্রয়িং রুমে আধ বোতল জল রাখা ছিল। খানিকটা জল খেয়ে হুইলচেয়ারে করে বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। বেরিয়ে এসেই বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন।

আকাশ জুড়ে এরকম আলোর খেলা উনি আগে দেখেননি। যেন প্রকৃতি আবিরের রঙের খেলায় মেতেছে। লক্ষ করলেন, অনেক লোক নীচে খোলা জায়গায় ছোটাছুটি করছে। এত উপর থেকে তাদের দেখা যায়, যোগাযোগ করা যায় না। এ যেন এখনকার জীবনেরই একটা ছবি।

কিছু একটা যে বড়ো ধরনের দুর্ঘটনা হয়েছে, তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। লোকে যেন ভীতসন্ত্রস্ত। আশপাশের ফ্ল্যাট থেকে অনেক লোকের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। কিন্তু উনি এটাও জানেন, এখান থেকে চেঁচালে ওর ডাক কেউ শুনতে পাবে না। এমনিতেও এ ধরনের উচ্চবিত্ত ফ্ল্যাটগুলোতে কেউ কারোর সাহায্যের জন্য চট করে এগিয়ে আসে না।

কিন্তু উপায়? এ ফ্ল্যাট থেকে কারোর সাহায্য ছাড়া বেরোবেন কী করে? এখন যদি ওর নার্স বা কাজের লোকটা না আসে! কেউ কলিং বেল বাজালে উনি রিমোট দিয়ে দরজা খুলে দিতে পারেন। কিন্তু কোথায় কে?

উনি সেলফোন বিশেষ ব্যবহার করেন না। তবু আজ সেলফোন থেকে চেনা পরিচিতদের ফোন করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু খেয়াল করলেন, ফোন যাচ্ছে না। অবাক হয়ে দেখলেন ফোনের নেটওয়ার্ক নেই। ল্যান্ড ফোনটাও ডেড। আশ্চর্য। এরকম তো কখনো হওয়ার কথা নয়। ওর মতো পৃথিবীরও কি শেষ সময় এসে উপস্থিত?

কী করবেন, কিছু না বুঝে সময়ের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। চুপ করে হুইলচেয়ারে বসে থাকলেন রঙের খেলা দেখতে।

৩

ঘটনার দশ ঘণ্টা বাদে

প্রথমদিকে ঘটনার আকস্মিকতা শ্রীজাতকে অবাক করে দিলেও, কী হয়েছে খবর পেতে শ্রীজাতর বেশি সময় লাগল না।

একটা বিশাল সোলার স্টর্ম বা সৌরঝড়। সেই সৌরঝড়ের সঙ্গে অস্বাভাবিক মাত্রায় করোনা মাস ইঞ্জেকশন অর্থাৎ চার্জড সৌরকণিকা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঢুকে পড়েছে। একই সঙ্গে পৃথিবীর চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের সঙ্গে মিলেমিশে খুব শক্তিশালী তড়িৎচৌম্বকীয় ক্ষেত্র তৈরি করেছে। তার জন্যই পাওয়ার গ্রিডের সব ট্রান্সফর্মার পুড়ে গেছে। একই সঙ্গে স্যাটেলাইটগুলো খারাপ করে দেওয়ায় টেলিফোনের নেটওয়ার্ক চলে গেছে।

মাথা তাই গরম শ্রীজাতর। কতদিন ধরে পারফেক্ট মার্ডারের প্ল্যান করেছিল। ভুল খবর দিয়ে বুড়োটার বিশ্বস্ত কাজের লোকটাকে গতকাল থেকে ছুটিতে পাঠিয়ে দিয়েছিল। আজকের জন্য নতুন কাজের লোকের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তারপর গতকাল শেষ মুহূর্তে আসতে বারণ করে দেওয়া হয়েছিল। একদিনের জন্য নার্সের ব্যবস্থা না করে, ভেবেছিল, আজকেই লঙ্কেশকে দিয়ে কাজটা সারবে।

লঙ্কেশের কাজটাও কিছু শক্ত নয়। এমনকী ধরা পড়ারও কোনো ভয় নেই। ওর কাজ ছিল শুধু গৌতমবাবুর শোয়ার ঘরটা রং করার। ঘরের রং করানোর কথা গৌতমবাবুই কদিন আগে

শ্রীজাতকে বলেছিল। তারপরেই শ্রীজাতর মাথায় আইডিয়া আসে।

রংমিস্ত্রি লঙ্কেশের পক্ষেও জানা থাকার কথা নয় যে, ও যে নীল রং ব্যবহার করবে, তাতে অনেক বেশি মাত্রায় সায়ানাইড আছে। এই নীল রঙের পেন্টে এমনিতেই সায়ানাইড থাকে। এটাতে আরেকটু বেশি ছিল আর কী! এ ব্যাপারে শ্রীজাতর নিজের অভিজ্ঞতা আছে। একসময়ে রং তৈরির ব্যবসা ও করেছে। একই সঙ্গে জানা আছে যে বুড়োটা সব সময় ঘরের জানলা-দরজা বন্ধ করে শোয়। দীর্ঘদিনের অভ্যেস।

সবই ঠিক ছিল। শুধু বাড়তি সাবধানতার জন্য লঙ্কেশকে আগে থেকে জানানো হয়নি কোথায় রং করতে হবে। অ্যাড্রেসও ইচ্ছে করে আগে থেকে জানায়নি লঙ্কেশকে। কিছুদিন আগে লঙ্কেশকে দিয়ে নিজের বাড়ি রং করানোর সময় প্ল্যানটা মাথায় আসে। নিজের বাড়ির কাজ এখনও শেষ হয়নি। কিনে আনা রঙের সঙ্গে বিশেষ মাত্রায় সায়ানাইড মিশিয়ে এই স্পেশাল রং নিজের হাতে তৈরি করেছে। সেটা লঙ্কেশের কাছে গতকাল দিয়ে এসেছে। ঘরে রং করে দরজা বন্ধ করে শুলেই ব্যাস। রং থেকে নিষ্কৃত সায়ানাইড গ্যাসে এক ঘণ্টায় কাজ সারা হয়ে যাবে।

কখন কোথায় কাজটা করতে হবে, সেটা সকালবেলা ফোন করে জানানোর কথা ছিল, শুধু বলা ছিল আজকেই কাজটা সারতে হবে। আর্জেন্ট। যে করে হোক আজকেই করতে হবে। অন্য কোনো কাজে লঙ্কেশ যেন হাত না দেয়। কিন্তু সে জানানোর উপায় এখন আর নেই। একমাত্র উপায় গাড়ি নিয়ে লঙ্কেশের বাড়ি গিয়ে জানিয়ে আসা।

এতদিনের প্ল্যান নষ্ট হয়ে যাবে ভেবে মাথা প্রথমে বেশ গরম হয়ে গিয়েছিল।

কিছুদিন বাদে গৌতমবাবুর বন্ধু প্রশান্তবাবু ফিরে এলেই উইল পরিবর্তন হয়ে যাবে।

এই মশলাপাতি— চাল এক্সপোর্টের ব্যাবসা গৌতমবাবুই শুরু করেন। গৌতমবাবু সম্পর্কে শ্রীজাতর জ্যাঠা হন। গৌতমবাবু ভাইকে অর্থাৎ শ্রীজাতর বাবাকে অর্ধেক সম্পত্তি দিয়ে গেছেন। কিন্তু ওর অংশ যদি চ্যারিটিতে দান করে দেন, তাহলে অর্ধেক সম্পত্তি শ্রীজাতর হাতছাড়া হয়ে যাবে। শ্রীজাতর পুরোটা চাই। পুরোটা।

মাথা ঠান্ডা করে আরেকবার ভাবল শ্রীজাত।

আচ্ছা, এ পরিস্থিতিতে সেরকম কিছু ব্যস্ততার কোনো দরকার আছে কি? এমনিতেও ওইরকম একটা ফ্ল্যাটে একটা মানুষ কতক্ষণ টিকে থাকতে পারবে? মনে তো হয় না কাউকে সাহায্যের জন্য যোগাযোগ করতে পারবে। এমনিতেও ওই কমপ্লেক্সে গৌতমবাবুর পরিচিত কেউ নেই যে ওর কথা খেয়াল রাখবে। আগ বাড়িয়ে সাহায্য করতে আসবে।

ধীরেসুস্থে আজকেই না হয় অন্য যেকোনো সময়ে লঙ্কেশকে দিয়ে রঙের কাজটা সারানো যাবে। কাল নার্স এসে গৌতমবাবুর মৃতদেহ আবিষ্কার করবে। এত কিছুর মধ্যে পুলিশের পক্ষে এ বিষয়ে তদন্ত করাও সম্ভব হবে না। শেষ এরকম বড়োসড়ো সৌরঝড়ের ঘটনা ঘটেছিল ১৮৫৯ সালে। যাকে বলা হয় ক্যারিংটন ইভেন্ট। তখন এভাবে টেকনোলজি মানুষের ঘাড়ের উপর চেপে বসেনি। না ছিল জি.পি.এস, না ছিলও সেলফোন, না ছিল ইলেকট্রিসিটি। শুধু সে সময় টেলিগ্রাফ সিস্টেম ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এখন শুধু একদিনে কত যে লুটপাটের ঘটনা ঘটবে, তার কি কোনো ইয়ত্তা আছে! পুলিশ সেটা সামলাবে, না এরকম একটা আপাতদৃষ্টিতে স্বাভাবিক মৃত্যুর তদন্তে লোক লাগাবে? তা ছাড়া এভাবে অপরাধীকে ধরার জন্য যে দক্ষতা লাগে, সে দক্ষতা যে কলকাতা পুলিশের নেই—সে ব্যাপারে শ্রীজাত নিশ্চিত।

আর ধরবেই বা কাকে? ওই রঙের কোম্পানির মালিককে? যার রঙে ও সায়ানাইড মিশিয়েছে। নিজের মনে হেসে উঠল শ্রীজাত।

আপাতত ওর একটাই কাজ। লঙ্কেশকে খুঁজে বার করা।

৪

ঘটনার ১৬ ঘণ্টা বাদে

এই এতক্ষণে একটা বেলের আওয়াজ যেন পেলেন গৌতমবাবু। ঠিক শুনেছেন কি? এরকম আগেও যেন দুবার শুনেছেন। দরজার কাছে গিয়ে কাউকে দেখতে পাননি। অথচ অন্য কোথাও যাওয়ারও উপায় নেই। বাইরে অনেক কষ্টে বেরিয়ে একবার দরজা খুলে গিয়ে দেখেছেন, লিফট কাজ করছে না। পাশে শর্মার ফ্ল্যাট। কিন্তু সেখানেও কেউ নেই। যাবেন কোথায়?

সকাল থেকে প্রায় কিছুই খাওয়া হয়নি। তাই শরীর খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে। জলতেষ্টায় বুক ফেটে যাচ্ছে। কোনো কলে জল নেই।

তবু আস্তে আস্তে হুইলচেয়ার নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। চেঁচিয়ে উঠলেন, কে? কে?

—আমি নগেন। আপনার গাড়ি চালাতাম। মনে পড়ে, কাকু?

ছেলেটার গলা চেনা-চেনা লাগছে। আচ্ছা, নগেন। কত বছর আগে ছেলেটা গাড়ি চালাত। অনেক কষ্ট—কসরত করে বেশ খানিকক্ষণ সময় নিয়ে কোনোরকমে দরজা খুলে দিলেন গৌতমবাবু।

কিন্তু খুলেই পড়ে যাচ্ছিলেন। নগেন ঘরে ঢুকেই গৌতমবাবুকে জড়িয়ে ধরে কোনোরকমে সামলে নিল। তারপরে ওকে ধরে সোফায় এনে বসাল নগেন। ও নিজেও ক্লান্ত হয়ে গেছে।

লিফট কাজ করছে না। চব্বিশতলা হেঁটে উঠেছে। তার আগে কুড়ি মাইল পথ হেঁটে এসেছে।

এ ফ্ল্যাটে আগে কখনো আসেনি নগেন। চারদিকে বৈভবের চিহ্ন। কিন্তু কোথায় যেন তবু শূন্যতা ছড়িয়ে আছে।

বাইরে যে কী তাণ্ডব চলছে, ঘরের মধ্যে থেকে তা এখনও বুঝতে পারেননি গৌতমবাবু। সব পাম্প থেমে যাওয়ায় কোথাও পানীয় জলও পাওয়া যাচ্ছে না। অনেক কষ্ট করে জল জোগাড় করেছে নগেন। একটা দোকান থেকে অনেক কষ্ট করে সামান্য খাবারও নিয়ে এসেছে।

অশক্ত হাতে খানিকটা জল আর খাবার খেয়ে খানিকটা ধাতস্থ হয়ে তবে কথা বললেন গৌতমবাবু।

—নেহাতই খুব খিদে পেয়েছিল, তাই খেলাম। তা না হলে খেতাম না। এতদিন আসিসনি কেন হতভাগা?— অভিমানী গলায় বলে উঠলেন গৌতমবাবু।

মাথা নিচু করে নগেন বলে উঠল, খুব ভুল হয়ে গেছে। একদিন এসেছিলাম। কিন্তু গেট থেকে ঢুকতে দেয়নি। আপনার ফোন নাম্বার আমার কাছে ছিল না। আপনি বাড়িতে নেই বলে জানিয়েছিল সিকিউরিটি। তাই ফিরে গিয়েছিলাম। ভয়ে আর আসিনি। এখানকার যা ব্যাপারস্যাপার।

—তা তোর গাড়ি কীরকম চলছে? রোজগার হচ্ছে?

—হ্যাঁ, চলে যাচ্ছে। একা থাকি। ভালোই চলে যায়।

—খুব ভালো। তা তোর কোন সাহায্য লাগবে?

—না, না, আগের টাকাই তো আপনি ফেরত নিলেন না। আমার বেশ চলে যাচ্ছে। কোনো কিছু লাগবে না।

—আমাকে একটু বাইরের বারান্দায় নিয়ে চল তো।

হুইলচেয়ার ঠেলে গৌতমবাবুকে আবার বাইরে বারান্দায় নিয়ে এল নগেন।

এখন সন্ধে হয়ে গেছে। অন্যদিনের মতো কমপ্লেক্স আজ আলোয় ঝলমল করছে না। পুরো শহরের মতো কমপ্লেক্স এখনও অন্ধকারে ঢেকে আছে।

—এরা জেনারেটর চালায়নি কেন সারাদিন জানি না!

—ওটাও শুনলাম নাকি পাওয়ার সার্জে পুড়ে গেছে।

—বেশ হয়েছে। পাশে বোস।

নগেন পাশে একটা চেয়ার টেনে এনে বসে।

নগেনের মাথায় হাত দিয়ে গৌতমবাবু বলে উঠলেন, বুঝলি, এত অন্ধকার না হলে আলো দেখা যায় না। তাই তো আজ তোকে আবার দেখতে পেলাম। নইলে যখন চারদিক আলোয় ঝলমল করে, তখন মানুষের দেখা পাই না।— একটু থেমে ফের বলে উঠলেন,— মাঝেমধ্যে এখানে আসিস। তা এরকম কতদিন চলবে, কিছু শুনলি?

—কেউ এখনও কিছুই জানে না। অনেককে জিজ্ঞেস করলাম। শুনলাম, সূর্য নাকি খেপে গেছে। কবে শান্ত হবে কে জানে? যতদিন সব স্বাভাবিক হচ্ছে, আমি কিন্তু আপনাকে রেখে এখান থেকে যাচ্ছি না। আপনার কাজের লোক গণেশ এখন নেই? কাউকে তো দেখলাম না!

—গতকাল দু-দিনের জন্য বাড়িতে গিয়েছিল। কাল ফিরে আসার কথা।

—আপনার শরীর কিন্তু একদম ভেঙে গেছে। আগে কত ভালো স্বাস্থ্য ছিল।

কথা বলতে থাকে নগেন। গৌতমবাবু মনে মনে হাসতে থাকেন। এই প্রিয় ছেলেটাকে যখন ড্রাইভার হিসেবে পেয়েছিলেন, তখন ওর বয়স সতেরো কি আঠেরো ছিল। কিন্তু তখনই ওর মধ্যে যে নিঃস্বার্থ সরল চরিত্র দেখেছিলেন, সেটা এখনও রয়ে গেছে। এক যুগ পরেও ছেলেটার অনর্গল কথা বলার অভ্যেসটাও যায়নি। একই সঙ্গে এই কম্পিটিশন আর চালাকির যুগে যে এই বোকাসোকা ছেলেটা টিকে আছে, সেটা দেখে উনি নিশ্চিন্ত বোধ করলেন।

মুশকিল হল, যাদের উনি অনেক কিছু দিয়ে যেতে চান, তারাই যে কিছু চায় না। জোর করে দিতে হয়।

৫

ঘটনার আটাশ ঘণ্টা বাদে

মাঝরাতে শ্রীজাত যখন ফিরল, তখন ও স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল না। সারাদিন লঙ্কেশের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেনি। ফোন নেটওয়ার্ক এখনও অচল। এখনও ব্ল্যাক আউট চারদিকে। পাওয়ার গ্রিডে যেরকম ক্ষতি হয়েছে, তাতে অবস্থা স্বাভাবিক হতে এখনও বেশ কিছু দিন লেগে যাবে। নেহাত বাড়িতে জেনারেটর আছে, তাই বাঁচোয়া।

শ্রীজাতর উপরমহলে ভালো জানাশোনা আছে। মশলাপাতির ব্যাবসা শুধু শুধু রমরমিয়ে চলছে না। ইতিমধ্যেই আগামী দু-মাসের জন্য বেশ কিছু খাবার কিনে মজুত করে রেখেছে। বাইরে মার্কেটে অলরেডি বিভিন্ন দৈনন্দিন নিত্যপ্রয়োজনীয় খাবার আউট অফ স্টক। এখন যে কদিন যাবে, সংকট আরও বাড়বে, শ্রীজাতর মতো লোকেদের ফায়দা আরও বাড়বে। পেট্রোল-ডিজেল ইতিমধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে না। পাইপলাইনে এর জন্য একটা বড়োসড়ো আগুন লেগে গেছে। যেসব পাইপের মাধ্যমে এসব জ্বালানি আসত, তা নাকি তাই আসা এখন বন্ধ হয়ে গেছে। সব জিনিসের দাম আরও চড়চড় করে বাড়বে। পরিবহণব্যবস্থা প্রায় অচল।

রাস্তাতে অনেক জায়গায় গুন্ডামি, লুঠের খবর পাওয়া গেছে।

আজ আঠেরোটা বিমান দুর্ঘটনা হয়েছে সারা বিশ্বে, তার মধ্যে একটা দিল্লিতে। আসলে বিমানবন্দরের এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার বেশ খানিকক্ষণ কাজ করছিল না। জাপানে আর জার্মানিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে লেন চেঞ্জ করতে না-পারার জন্য বেশ কয়েকটা ট্রেন দুর্ঘটনা হয়েছে। রাশিয়ায় একটা তৈলশোধনাগারে এর জন্য বড়োসড়ো দুর্ঘটনায় হাজার হাজার লোক প্রাণ হারিয়েছে।

অবশ্য এখনও অনেক খবর পাওয়াই যায়নি। সবে আসতে শুরু করেছে। নেহাত কিছু টিভি আর রেডিয়ো চ্যানেল এখন কাজ করতে শুরু করছে, তাই কিছু কিছু খবর এখন পাওয়া যাচ্ছে।

সবকিছুর উপরে একটা জগৎ আছে, যেখানে টাকা আর ক্ষমতা থাকলে ভয় পেতে হয় না। শ্রীজাত সেই জগতের লোক। তাই ও ঘাবড়ায় না। বরং এতে শ্রীজাতর অনেক সুবিধা। ওর নিজের ব্যাবসা আগামী কদিনে যে ফুলেফেঁপে উঠবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু একটাই খারাপ খবর তা হল, বুড়োটা নাকি এখনও বহাল তবিয়তে আছে। এরকমই খবর পাওয়া গেছে।

অর্থাৎ প্ল্যান A-টা এখনও বহাল রাখতে হবে। এসব কথা ভেবেই বন্ধুদের সঙ্গে একটু বেশি মদ্যপান করে ফিরেছে শ্রীজাত।

সোজা শোয়ার ঘরে ঢুকে বিছানায় শুয়ে পড়ল। আজ এসি চলবে না। জেনারেটরে শুধু আলো—পাখার ব্যবস্থা আছে। পাখা চালিয়ে শুয়ে পড়ল।

চাকর এসে জানাল, লঙ্কেশ নাকি বাড়িতে খোঁজ নিতে এসেছিল। তার নাকি কী একটা দরকারি রঙের কাজ ছিল, কিন্তু সে ব্যাপারে বাবুকে নাকি সারাদিন যোগাযোগ করতে পারেনি।

এই হল ফোনহীন জগৎ। দুজন দুজনকে খুঁজে বেড়িয়েছে সারাদিন। যোগাযোগ করতে পারেনি।

আজকের মতো কাজ সারার ভালো দিন আর ছিল না। আবার আরেকটা দিনের অপেক্ষা।

—বাবু, জানলা খুলে দেব?

—কোনোদিন আমি জানলা খুলে শুই— বেরো ইডিয়ট।

আরও কী বলতে যাচ্ছিল চাকরটা। ধমক দিয়ে বার করে দিল শ্রীজাত। এটা একটা বলার সময়! রাত একটা বাজে। নেশা কেটে যাচ্ছে।

বিছানায় শোয়ার খানিকক্ষণের মধ্যে বেহুঁশ হয়ে ঘুমোতে শুরু করে দিল। রাতের দিকে মিষ্টি একটা গন্ধ পেল। অলমন্ডের। ভারী হালকা সে গন্ধ। গভীর, আরও গভীর ঘুমে হারিয়ে গেল শ্রীজাত।

চাকরের শেষ কথাটা ওর আর শোনা হয়ে ওঠেনি। লঙ্কেশ কোথায় রং করতে হবে, জানতে এসেছিল। এ ঘরের রং খানিকটা বাকি ছিল। বাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পেরে এ ঘরেই ওই রং করে বিকেলের দিকে লঙ্কেশ বেরিয়ে গেছে। কাজটা আজকেই শেষ করার কথা ছিল যে!

১২ *ডিসেম্বর* ২০১৭

বাইবেল ও একটা ছবি

কিছু ঘটনা থাকে, যা যেরকম হয়েছিল, অনুভূতির রং না চড়িয়ে ঠিক সেরকমভাবেই বলা উচিত। ঘটনার কমা, ফুলস্টপ, জায়গা, চরিত্র—সব এক রেখে ঘটনা ঠিকভাবে তুলে ধরলে পাঠকরাই শেষে কী হয়েছিল, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

এক্ষেত্রে ঠিক কী হয়েছিল, সেটা আমিও জানি না। যে সম্ভাবনাগুলো থাকতে পারে, সেটা দিয়ে উপাদেয় গল্প তৈরি করা এক্ষেত্রে আমার উদ্দেশ্য নয়। সেটা পাঠকের হাতেই ছেড়ে দিলাম।

এটা কয়েক মাস আগের ঘটনা। আমি তখন আমেরিকায়। মে মাস।

হোটেলের রেস্টুরেন্টে ব্রেকফাস্টের জন্য আমার ও আমার এক সহকর্মীর ঠিক সাতটার সময় দেখা করার কথা ছিল।

কিন্তু দেখি, সাতটা বেজে পনেরো মিনিট হয়ে গেছে। তবু তার দেখা নেই।

আমার সহকর্মী মুরলীকে এরকম দেরি করতে আগে কখনো দেখিনি। খুব পাঙ্কচুয়াল। মিনিট সেকেন্ডের কাঁটা মেনে চলে। সে তখনও আসেনি দেখে ব্রেকফাস্ট শুরু করে দিলাম। দেরি করলে চলবে না। কিছুক্ষণ বাদেই অফিসে বেরোতে হবে।

এমন সময় দেখি, আমার সেই সহকর্মী বন্ধু মুরলী প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে আসছে। এসে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে আমার টেবিলে বসেই বলে উঠল—কাল রাতে একটা বড়ো কাণ্ড হয়ে গেছে।

—কী কাণ্ড? পড়ে গেছ?

মুখ-চোখের চেহারা দেখলেই অবশ্য বোঝা যায় যে কিছু একটা হয়েছে। উসকো খুসকো চুল। দু-চোখভরা ক্লান্তি।

অবশ্য ক্লান্তি আমারও আছে। আমিও গত দশ দিনে আমেরিকার একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত, এক স্টেট থেকে আরেক স্টেট মুরলীর সঙ্গে ছুটে বেড়াচ্ছি।

এখানে আমার ও আমার এই সহকর্মী মুরলীর সামান্য পরিচয় করিয়ে দেওয়া দরকার। আমি একটা বহুজাতিক কোম্পানির একটা ইউনিটের গ্লোবাল হেড। আমার সহকর্মী মুরলী পুরো আমেরিকার ব্যাবসার দায়িত্বে আছে। খুব বড়ো দায়িত্ব। আমাকেই রিপোর্ট করে।

কোনো বড়ো ধরনের ক্রাইসিস তৈরি হয়েছে কোথাও? অফিসের বা ফ্যামিলি সংক্রান্ত। সবরকম প্রশ্নই এল মাথায়। কিন্তু যে উত্তরটা পেলাম, তার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না।

আশপাশে তাকিয়ে মুরলী বলে উঠল, সাংঘাতিক এক ভূতের পাল্লায় পড়েছিলাম গতকাল রাতে।

এরকম এক উচ্চপদস্থ পঞ্চাশোর্ধ্ব ব্যক্তি, যে গত তিরিশ বছরে নানান দায়িত্বপূর্ণ কাজ করেছে, সে লস অ্যাঞ্জেলেসের এক অভিজাত হোটেলের মধ্যে দাঁড়িয়ে যে এরকম কথা বলতে পারে, ভাবতে পারিনি!

—কী বললে? ভূত?

—হ্যাঁ, সেটা ছাড়া তো অন্য কোনো কারণ থাকতে পারে না।

কাল অনেক রাতে এই হোটেলে এসে পৌঁছেছি। ডিনারেও একসঙ্গেই ছিলাম। সুতরাং ওর উপরে কোনো পানীয়ের প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা কম। তা সত্ত্বেও ও ভূত কীভাবে দেখল?

মুরলী ফের বলে উঠল, এরকম ঘটনা আমার জীবনে আগে হয়নি। কাল রাতে আপনার সঙ্গে কথা বলার পরে শুতে গেলাম। অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। আমার ঘরটা হোটেলের একদম শেষদিকের একতলার একটা ঘর। তার পাশেই চার্চ আর চার্চের কবরখানা।

—হ্যাঁ, তা দেখেছি। সে তো অনেক জায়গাতেই থাকে। তারপরে?

—ক্লান্ত ছিলাম। শোয়ার পর পরই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ একটা 'খটাস' করে মৃদু আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল।

আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছিলাম। উঠে আলো জ্বালিয়ে দেখি, আমার খাটের পাশে বেডসাইড টেবিলের উপরের ড্রয়ারটা খুলে গেছে। ভাবলাম, কোনো কারণে হয়তো খুলে গেছে।

ঠিকভাবে বন্ধ করে শুলাম। দশ মিনিট বাদে আবার সেই শব্দ।

আবার আলো জ্বেলে দেখি, সেই একই ড্রয়ার খুলে গেছে। ড্রয়ারের ভেতরে একটা বাইবেল রাখা।

আবার ড্রয়ার বন্ধ করলাম।

কী কারণে দুবার খুলে গেল, সেটা বোঝার চেষ্টা করলাম। খানিকক্ষণ এবারে বসে থাকলাম। আবার খোলে কি না দেখার জন্যে।



খুলল না।

খোলার কোনো কারণও ছিল না।

আবার শুয়েছি। আধ ঘণ্টা বাদে আবার সেই একই শব্দ। ড্রয়ার আবার খুলে গেছে। শুধু তা-ই নয়। সঙ্গে ঘরের একটা আলোও জ্বলে উঠেছে।

—আলো?

—হ্যাঁ, ঘরের অন্যদিকে যেখানে সোফাটা আছে, তার পাশের আলো। ভাবুন, এটা কখনো স্বাভাবিক ব্যাপার হতে পারে?

—কোনোভাবে সুইচটা কি অন হয়ে যেতে পারে? তা ছাড়া, ভূতেরা অন্ধকারই বেশি পছন্দ করে। হঠাৎ করে আলো জ্বালাতে যাবে কেন!

আমার ঠাট্টাটা গায়ে না লাগিয়ে কাঁপা হাতে কাপ তুলে কফিতে এক ব্যস্ত চুমুক দিয়ে বলে উঠল, না, সেরকম কোনো সম্ভাবনা ছিল না। কোনোভাবেই সুইচ অন আপনা থেকে হতে পারে না। তা ছাড়া আলো জ্বালানোর একটা কারণ থাকতে পারে। যাতে আমি তাকে দেখতে পাই।

—হ্যাঁ, তা ঠিক। তবে ড্রয়ারটা বার বার খোলার একটা ব্যাখ্যা আছে। হয়তো ঠিকভাবে লাগানো হয়নি। বইয়ের ভারে আস্তে আস্তে কিছুক্ষণ বাদে খুলে যাচ্ছে।

—আমার মনে হয় না সেটা হচ্ছিল। শুধু তা-ই নয়। আরও দুবার ওই আলোটাই হঠাৎ করে জ্বলে উঠল। টুওয়ে সুইচ। আমার বিছানার পাশের সুইচ দিয়ে নেভানো যাচ্ছিল। আমি ভয়ে আর খাট থেকে নামিনি। আরও দেড় ঘণ্টা এরকম ভূতুড়ে কাণ্ডকারখানা দেখে সোজা রিসেপশনে চলে গেলাম।

—রুম চেঞ্জ করার জন্য?

—হ্যাঁ, অত রাতে অনেক ঝামেলা করে রুম চেঞ্জ করেছি। রিসেপশনিস্ট প্রথমে বিশ্বাস করছিল না। এরকম ঘটনা নাকি ওই রুমে কখনো হয়নি। শেষ পর্যন্ত রাত চারটেতে ঘুমোই অন্য ঘরে গিয়ে।

—সবকিছুরই ব্যাখ্যা হয়। আলোর ব্যাপারটারও একটা সায়েন্টিফিক ব্যাখ্যা হয়। হয়তো ওই সুইচের উপরে এমন কিছু একটা রাখা ছিল, যার চাপে মাঝেমধ্যে জ্বলে উঠছিল। উঠে দেখলেই বুঝতে পারতে।

—সবকিছুর সায়েন্টিফিক ব্যাখ্যা হয় না—মুরলী যেন একটু রেগেই বলে উঠল, আমি নিশ্চিত এটা কোনো অতৃপ্ত আত্মা।

আমি বুঝলাম ওকে আর বুঝিয়ে কোনো লাভ নেই। এবারে মজার জন্যেই বলে উঠলাম, হয়তো কেউ চাইছিল, তুমি তার আত্মার শান্তির জন্যে বাইবেল পড়ো। সেজন্য বার বার বইটা বার করে দিচ্ছিল।

—কেন? কেন এরকম হবে?

—হয়তো বিশেষ কোনো অংশ পড়তে বলছিল। হয়তো ওই ঘরেই কেউ কোনোদিন মারা গিয়েছিল। বা পাশের কবরখানায় হয়তো এমন কেউ ছিল, যে চাইছিল সেই রাতে বাইবেল শুনতে। অথবা হয়তো এমন কেউ, যে তোমাকে আগে থেকেই চিনত।

ওর মুখটা দেখি, বেশ গম্ভীর হয়ে উঠল। মনে হল, এই ব্যাখ্যা ওর পছন্দ হয়েছে।

আমি আরেকটু ভয় দেখাতে বলে উঠলাম, তবে যে ঘরেই যাও-না কেন, এরকম আত্মা সহজে রেহাই দেয় না। আবার ফিরে আসবে। হয়তো তোমার সঙ্গে পরের ঘরেও যাবে।

—তা-ই নাকি?

দেখি, মুরলীর মুখ আরও গম্ভীর হয়ে উঠছে। ভিতুদের ভয় দেখিয়ে বেশ লাগে।

—তা কী উপায়? —ফের বলে উঠল।

একমাত্র উপায় হোটেল ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়া। তবে সেরকম আবার হলে, তবেই।

অফিসে যেতে দেরি হয়ে যাচ্ছিল। ব্রেকফাস্ট শেষ করে রেডি হয়ে অফিসের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম। সারাদিন আমাদের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ মিটিং ছিল। হোটেলে ফিরতে রাত হয়ে গেল। ও অন্য ঘরটায় যেখানে শিফট করেছিল,সেখানে শুতে গেল।

পরের দিন সকালে দেখি, আবার ব্রেকফাস্টের সময় ও আসছে না। কী ব্যাপার ভাবছি, ঠিক সেরকম সময় ওর ফোনটা পেলাম। এয়ারপোর্ট থেকে ফোন করেছে।

ও নাকি গতকাল রাতে যে ঘরে গিয়েছিল, সেখানেও রাত বারোটার থেকে একই রকম ঘটনা শুরু হয়েছিল, যার জন্য রাত দুটোর সময় হোটেল ছেড়ে চেক আউট করে বেরিয়ে যায়। রাত বলে আমাকে জানাতে পারেনি। বাকি রাত এয়ারপোর্টে কাটিয়ে সকালের ফ্লাইটে ফিরছে।

কী আশ্চর্য! এরকমও লোকজন হয়। ভূতে এভাবে বিশ্বাস করে! তবে কিছু একটা তো নিশ্চয়ই হয়েছে। তা না হলে এরকম ঘটনা ওর সঙ্গে আগেও হত।

আমি এবারে রিসেপশনে গিয়ে বললাম। এত বড়ো হোটেল। এসব কী শুরু হয়েছে এখানে যে আমার বন্ধুকে মাঝরাতে পালাতে হল?

রিসেপশনিস্টকে মহিলা না বলে বাচ্চা মেয়েও বলা যায়। বয়স বেশ কম। আঠেরোর কাছাকাছি। একেই এখানে এ কদিন দেখেছি।

আমি বলায় মেয়েটা অবাক হয়ে বলে উঠল, এরকম ঘটনা হোটেলের ইতিহাসে কখনো হয়নি। কী করে ওর কথা বিশ্বাস করি, বলুন।

বলে একটু থেমে ফের বলে উঠল, তবে একটা জিনিষ আপনি বলেননি। জানি না জানেন কি না। উনি খুব উত্তেজিত হয়ে পড়ায় আমিও গিয়েছিলাম ঘরে। দুবারই। ওই যে ড্রয়ারের কথা বললেন, সেখানে শুধু বাইবেল ছিল না, একটা ছবিও ছিল। সে ছবিতে একজন ভারতীয় মহিলা ছিল। আমার মনে হয়, ওই ছবি দেখেই যেন উনি বেশি ভয় পেয়েছিলেন।

—ছবিটা আছে?

—প্রথমবার ছবিটা দেখে উনি ছিঁড়ে ডাস্টবিনে ফেলে দিলেন। দ্বিতীয়বারেও অর্থাৎ গতকাল রাতেও ওই একই ছবি কোথা থেকে এল আমার দেখে একটু অবাক লেগেছিল, কিন্তু

তারপরে তো উনি বেরিয়েই গেলেন। কাল রাতে বেরিয়ে যাওয়ার পরে খুঁজে দেখেছি। কিন্তু সেই ছবি নেই। অথচ ওটা যে ড্রয়ারে ছিল, সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। এক মধ্যবয়সি ভারতীয় মহিলা, আচ্ছা, উনি কি বিবাহিত?

—হ্যাঁ, কিন্তু স্ত্রী মারা গেছেন।

আমার আর মুরলীর ফেসবুকেও যোগাযোগ আছে। সে সূত্রে ওর কভার ছবিতে ওর স্ত্রী-র ছবিও দেখেছি। সেটা বার করে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলাম,এই মহিলা কি?

—হ্যাঁ, এরকমই। —বলে আমার হাত থেকে ফোন নিয়ে হোটেলের রিসেপশনিস্ট ফের বলে উঠল, হ্যাঁ, এই মহিলাই।

তা তার ছবি ড্রয়ারে রেখে ঘুমোচ্ছিল মুরলী? নাকি ওই ছবিটা ওখানে ও আশা করেনি?

রিসেপশনিস্ট মেয়েটা ফের বলে উঠল, আমার তো মনে হচ্ছিল, এই ছবিটা দেখেই ভয় পাচ্ছিল আপনার বন্ধু। যেন ওই ছবিটা ওখানে আছে, বিশ্বাস করতে পারছিল না!

শুনেছিলাম ওর স্ত্রী কয়েক মাস আগে ক্যান্সারে মারা গিয়েছিল।

কিন্তু স্ত্রী-র মৃত্যু কি সত্যি ক্যান্সারে হয়েছিল?

যা-ই হোক, এর দশ দিন বাদে আমার সেই সহকর্মী রিজাইন করে। সেখানে সে জানিয়েছিল যে ব্যক্তিগত কারণে ভারতে ফেরার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

৩ আগস্ট ২০২২

কেনিলওয়ার্থ, ইংল্যান্ড

অপরিচিতা

পুষ্পেন দু-দিন হল মুম্বইতে অফিসের কাজে এসেছে। একটা অফিসিয়াল ট্রেনিং-এ। এই প্রথম ওর কলকাতার বাইরে আসা। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে ও। ছোটোবেলা থেকেই টানাটানির সংসার। ছোটো ব্যাবসা থেকে যেটুকু পারিবারিক রোজগার ছিল, কয়েক বছর আগে বাবা অসুস্থ হয়ে পড়ার পর থেকে সেটাও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তার পরের কয়েক বছরে পারিবারিক সব সঞ্চয়ও শেষ হয়ে গিয়েছিল বাবার চিকিৎসায়।

সেই সময়ে পড়ার পাশাপাশি প্রাইভেট টিউশনি করেই ওকে সংসার টানতে হয়েছে। সেই ঝড়ঝাপটার দিনগুলোর রেশ এখনও ওর উপরে থেকে গেছে। সেজন্যে ও অন্য অনেকের থেকে বেশি বিনয়ী। অন্যদের কথা সব সময় খেয়াল রাখে। জানে এ জীবন উত্থান-পতনের, যেকোনো সময় সবকিছু বদলে যেতে পারে।

পড়াশোনায় ও খুব ভালোই ছিল। সেজন্য জয়েন্টে একটা সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রথমবারেই চান্স পায়। সেখান থেকে পাশ করে প্রথম চাকরি পেয়েছে কয়েক মাস আগে। সে চাকরি কলকাতায়। সেজন্য ওকে গত চার মাসে কখনো কলকাতার বাইরে যেতে হয়নি।

এই প্রথম একটা বিশেষ ট্রেনিং-এর জন্য কলকাতার বাইরে আসা। মুম্বইতে। জুহুর কাছে একটা ভালো হোটেলে আছে ও। এরকম হোটেলে আগে কখনো থাকেনি ও। ফোর স্টার হোটেল। এর কাছাকাছি মানেরও কোন হোটেলে ওর কোনোদিন থাকার সুযোগ হয়নি। একদিকে সেজন্য যেমন আনন্দ লাগছিল, ঠিক তেমন একটা অস্বস্তি।

রাত বাড়তেই হোটেলের পাবে কোলাহল—চিৎকার বাড়তে শুরু করল। এ ধরনের পরিবেশে পুষ্পেন অভ্যস্ত নয়। অস্বস্তিটা আরও বাড়ল। ও শুনেছে হোটেলের খুব কাছেই জুহুর বিচ। সমুদ্র ওর খুব ভালো লাগে। সেখানে শান্ত পরিবেশ পাবে আশা করে সেদিকে এগোল ও।

বিচের খোঁজ পেতে সময় লাগল না। তবে তখন রাত হয়ে এসেছে। দিনের আলো প্রায় উধাও। এক কালো চাদরে সবকিছু যেন ঢেকে ফেলেছে।

ফোনে সময়টা দেখে নিল। রাত দশটা। বিচে লোক আছে, তবে কম। কিছু ছোটো ছোটো স্টল আছে। সেখানে পাওভাজি, পাপড়ি চাট, পানিপুরি—এসব বিক্রি হচ্ছে।

ও সমুদ্র তেমন দেখেনি। একবার বেশ কয়েক বছর আগে দিঘা গিয়েছিল। সেই বেড়ানোর কথা এখনও ওর মনে আছে। শেষ কয়েক বছর বাবার অসুস্থতা, চিকিৎসা—এসব নিয়ে ওরা সবাই এত ব্যস্ত যে কোথাও যাওয়ার কথা কখনো মনে হয়নি।

সমুদ্রের ধার দিয়ে ও আনমনে হাঁটতে লাগল। জলের দিকে বেশ খানিকটা এগিয়ে এল। এখন ও যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, চারদিকে পড়ে-থাকা ঝিনুক, শ্যাওলা-মাখা পাথরগুলো বলে দিচ্ছে যে সেখানে নিয়মিত জল আসে। সামান্য দূরে ঢেউয়ের পরে ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে বালুচরে। রাতের আলোয় জলের মধ্যে একসঙ্গে যেন লক্ষ হিরে চিকচিক করে জ্বলে উঠছে।

এই ঢেউয়ের যেন এক নিজস্ব ভাষা আছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বালির উপরে দাঁড়িয়ে ঢেউয়ের সে কথা শুনতে শুনতে সবকিছু ভুলে থাকা যায়।

—হোয়াট আ লাভলি নাইট, ইজন্ট ইট?

পুম্পেন চমকে উঠল প্রশ্নটা শুনে।

পাশে একজন মহিলা এসে দাঁড়িয়েছে। তারই প্রশ্ন। কালো জিন্সের উপরে একটা ছোটো টপ পরেছে। খুব লম্বা। মেয়েটার মুখ এই আলো-আঁধারিতে ভালো দেখা যাচ্ছে না। মিষ্টি সম্ভ্রান্ত কণ্ঠস্বর।

কে এই মেয়েটা? প্রায় ওরই বয়সি। হঠাৎ ওর খেয়াল হয় আজ যে ট্রেনিং শুরু হল, সেই ট্রেনিং-এ বেশ কয়েকজন মেয়েও ছিল। তাদের মধ্যেই হয়তো কোনো একজন হবে। প্রথম দিন বলে তেমনভাবে কারো সঙ্গে কথা হয়নি। পুম্পেন নিজে লাজুক টাইপের। আগ বাড়িয়ে আলাপ করতে পারে না। তেমনভাবে লক্ষও করেনি ওদের।

ও বলে উঠল, হ্যাঁ, সত্যি রাতের আলোয় সমুদ্র যেন অন্যভাবে ধরা দেয়। যেন হিরের অজস্র টুকরো কেউ জলের উপরে চারদিকে ছড়িয়ে দিয়েছে।

মেয়েটা এবারে হিন্দিতে বলে উঠল—ঠিক বলেছ। কিন্তু কাছে গেলে আবার হিরের টুকরোগুলো হারিয়ে যায়। ঠিক আমাদের মতোই। দূর থেকে যাকে হিরে বলে মনে হয়, কাছে গেলে মনে হয় সাধারণ।

পুম্পেন হিন্দি বেশ ভালো বলতে পারে। ইউনিভার্সিটিতে থাকার সময় ওর এক বন্ধু ছিল ইউ.পি.-র। লখনউ ঘরানার বিশুদ্ধ হিন্দিতে কথা বলত। তার কাছ থেকেই হিন্দিটা শিখেছে।

হিন্দি-ইংরেজি মিশিয়ে ওরা কথা বলতে থাকে।

মেয়েটা ওর সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে শুরু করেছে। নিশ্চয়ই ওকে চেনে। তা না হলে কি আর আগ বাড়িয়ে কথা বলত?

কিন্তু পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে দ্বিধা হয় পুপ্পেনের। নির্ঘাত সকালে অফিসে দেখা হয়েছে। এখন প্রশ্ন করলে চিনতে না-পারার জন্য কাল বন্ধুদের মধ্যে হাসাহাসি হবে।

—এরকম নির্মেঘ আকাশ খুব কমই থাকে। আজ পূর্ণিমার আলোয় চারদিক আরও সুন্দর লাগছে, তা-ই না? যেন কে এক আলোর চাদর ছড়িয়ে দিয়েছে চারদিকে। এরকম আকাশের নীচে দাঁড়ালে মনের সব মেঘ সরে যায়।

ওরা দুজনে মিহি বালুর উপর দিয়ে হাঁটতে শুরু করে।

—আমার এই বালির উপরে হাঁটতে খুব ভালো লাগে। তোমার?— মেয়েটা ফের বলে ওঠে।

—হ্যাঁ, আমারও।

—আমাদের জীবন যদি এরকম হত— যে পথ ধরে হেঁটেছি, সে পথের কোনো চিহ্ন না থাকত, সব হারিয়ে যেত, কী ভালো হত তা-ই না! আবার করে শুরু করতাম। মাঝেমধ্যে মনে হয়, কোথা থেকে এসেছি, কোথায় যাচ্ছি সবই মিথ্যে, শুধু মাঝের এই হেঁটে চলার নামই জীবন। যেমন এখন তোমার সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছি।

—তুমি খুব সুন্দর কথা বলো। তুমি কি কবিতা লিখতে?— পুপ্পেন বলে ওঠে।

—হ্যাঁ, এখনও লিখি। হিন্দিতে। আসলে খুব ভালো যে লিখি তা নয়। কারণ যে কথাগুলো ভাবি, সেগুলো লিখতে ঠিক পারি না। কিন্তু এখানে সমুদ্রের ধারে এসে সে কথাগুলো বলতে ভয় পাই না, কারণ সবাই এখানে শুধু সমুদ্রের কথাই শুনতে আসে। আমার কথা তখন শুধু আমার কাছেই থেকে যায়। সাহস বেড়ে যায়।

—আবার কবিতার মতো কথা!

—এখানে সমুদ্রের হাওয়া যা কথা বলে, তার কাছে আমি আর কোথায়! তুমি তো বাঙালি। বাংলায় খুব ভালো ভালো কবিতা পড়েছি আমি।

এবারে পুপ্পেন নিশ্চিন্ত হয় যে মেয়েটাকে নির্ঘাত অফিসেই দেখেছে। তা না হলে এটা ওর সম্বন্ধে এত নিশ্চিতভাবে জানা সম্ভব হত না।

মেয়েটা একটা ঝিনুক বালি থেকে কুড়িয়ে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বলতে থাকে — আমি যখন ছোটো ছিলাম, তখন মা-র-দিদিমার সঙ্গে এখানে এসে ঝিনুক, নুড়িপাথর কুড়োতাম। কত রকমের রঙের, কতরকম আকারের। দু-বছর আগে একদিন ব্যাগ ভরে এনে আবার এখানে সব ছড়িয়ে ফেলে দিয়েছিলাম। সমুদ্র ওদের টেনে নিয়েছিল। আর খোঁজ পাইনি।

—কেন? সমুদ্রে সব ছুড়ে ফেললে কেন?

—আসলে আমারই তো ঘরসংসার নেই, তো ওদের কীভাবে যত্নে রাখব, তা-ই না?

মেয়েটা মিষ্টি হেসে ফের বলে ওঠে, দূরে ওই যে সমুদ্রের ধার দিয়ে অত বাড়ি দেখছ, আলো-অন্ধকারে অস্পষ্ট ছায়ার শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কত উঁচু উঁচু সব বাড়ি, তা-ই না! তিরিশ-চল্লিশতলার। কিন্তু বেশির ভাগ বাড়ি কিন্তু এখনও ঘর হয়ে উঠতে পারেনি। মানুষকেও ঠিকভাবে আশ্রয় দিতে পারে না। আমি একটা ঘর খুঁজেছিলাম। পাইনি। শুধু চারদিকে ইট আর মার্বেলের দেওয়াল পেয়েছিলাম। শেষে কিছুই না পেয়ে ফের সমুদ্রের কাছে এসেছি।

মেয়েটার চোখ যেন ছলছল করে উঠল।

বিচের উপরে বেশ কিছু ডিঙিনৌকো পরপর রাখা আছে। সেটা দেখিয়ে পুপ্পেন বলে উঠল, জেলেদের নৌকো। তুমি গেছ কখনো ওদের সঙ্গে মাছ ধরা দেখতে?

—না, আমি আসলে ভালো সাঁতার জানি না। সেজন্য ভয় পাই। তবে যাওয়াই যায়, জীবনের সাঁতারেরও আমি কী-ই বা জানি! তবু সেখানে ডুবে যাবার ভয়ে তো চুপ করে বসে থাকি না। হয়তো সমুদ্রে যখন ডুবে যাব, তখন সমুদ্র আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে বলে উঠবে, তোমাকে আর নতুন করে কী ডোবাব! তুমি তো আগেই ডুবে গেছ।

মেয়েটার রহস্য ও কাব্যময় কথা পুপ্পেনকে আবাক করছিল। কী করছে মেয়েটা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে? ওর তো কবিতা-গল্প লেখা উচিত ছিল! আসলে এখনকার দিনে পড়াশোনায় ভালো হলেই একটা বড়ো অংশ ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে চলে আসে। নিশ্চিত রোজগারের সম্ভাবনায়।

মেয়েটা আরও অনেক গল্প করতে থাকে পুপ্পেনের সঙ্গে। ওর বাড়ির কথা, ওর বাবা-মা-র কথা। ওর বাড়ি এখান থেকে প্রায় তিন ঘণ্টা দূরে মহারাষ্ট্র ও কেরলের বর্ডারের এক গ্রামে। ও বলছিল ওর নানান শখের কথা, যা এখনও ও করে উঠতে পারেনি। মডেলিং করার খুব ইচ্ছে ছিল একসময়। কিন্তু তেমন সফল হতে পারেনি।

পুপ্পেনও অনেক কথা বলতে থাকে। ওর কলেজের কথা। বন্ধুদের কথা। বাবা-মা-র কথা।

আরও প্রায় এক ঘণ্টা বিচের ধার দিয়ে হাঁটার পরে পুপ্পেনকে মেয়েটা বলে উঠল, চলো, এবারে বালির উপরে বসা যাক।

এই অন্ধকারে এক প্রায় অপরিচিত মেয়ের সঙ্গে বসতে একটু লজ্জাই পেল পুপ্পেন। বলে উঠল, না, আমার হাঁটতে বেশ ভালো লাগছে। তুমি কি ক্লান্ত হয়ে পড়েছ?

বলেই চমকে উঠল মেয়েটার দিকে তাকিয়ে। এতক্ষণ সেভাবে তাকায়নি মেয়েটার মুখের দিকে। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে হেঁটে গেছে। আলোও তেমন ছিল না। একটা রাস্তার ল্যাম্পের আলো এসে পড়েছে মেয়েটার মুখে। কী অপূর্ব দেখতে। চোখ যেন শ্রাবণের মেঘের মতো গভীর। কী যেন সারল্য মিশে আছে মেয়েটার চোখে-মুখে।

ওর বিভোর দৃষ্টিটা মেয়েটা বুঝতে পেরেছিল।

আস্তে আস্তে বলে উঠল, অনেকক্ষণ হয়েছে। এবারে বসাই যাক। আমার রেট কত জানো তো? দিতে পারবে তো?

চমকে উঠল পুষ্পেন।—কী, কীসের রেট?

মেয়েটা ওর অবাক হয়ে-যাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, আমি কে, তুমি বুঝতে পারোনি? আমি তো দেহব্যাবসা করি। টাকা নেই তোমার কাছে?

প্রায় কথা বলা বন্ধ হয়ে গেছে পুষ্পেনের।

ওর আরক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে মেয়েটা বলে ওঠে। — ও তুমি এখানে একেবারে নতুন বুঝি? জানতে না?

একটু থেমে ফের বলে ওঠে, আসলে সমুদ্রের বিচের এদিকে যারা আসে, তারা সব জেনেবুঝেই আসে। এদিকে এরকম শরীর নিয়ে ব্যাবসা চলে, যদিও সবকিছু এখানে একটু বেশি সফিসটিকেটেড। বুঝতেই পারছ বড়োলোকদের এলাকা। আমি ভেবেছিলাম তুমি বোধহয় সেরকম কোনো খদ্দের। চলো, তোমাকে তোমার হোটেলে পৌঁছে দিয়ে আসি।

—না না, আমি নিজে খুঁজে নেব। আসলে আমি তোমাকে, মানে আপনাকে অন্যরকম ভেবে ভুল করেছিলাম। ভেবেছিলাম, আপনি আমার অফিসের বন্ধু। এখানে সবে এসেছি। ভেবেছিলাম, অফিসে হয়তো দেখা হয়েছে। আমি অনেক সময় মুখ ঠিক মনে রাখতে পারি না। আমি আপনাকে আপনার প্রাপ্য টাকাটা দিয়ে দিই।

জোরে হেসে বলে ওঠে মেয়েটা, না, না, টাকা লাগবে না। তবে আমাকে তুমি করে বলো।

—আমার কাছে কিন্তু টাকা আছে। কত লাগবে?

মেয়েটা আবার হেসে ওঠে—না, টাকা দিতে হবে না। যাক, কিছুক্ষণের জন্য তো আমাকে বন্ধু ভেবেছিলে! সেই সময়ের দাম কি আর তুমি টাকায় মেটাতে পারবে? আমারও মনে হচ্ছিল তুমি অন্যরকম। আমি মাত্র এক মাস হল বাধ্য হয়ে এ পেশায় এসেছি, সেজন্য বুঝতে ভুল হয়েছিল। সবাই এতক্ষণে আমার শরীর নিয়ে খেলা শুরু করে দিত, মনের খোঁজ না করে।

বলে মিনিটখানেক চুপ করে থাকে। ভারী গলায় বলে ওঠে, আমিও তো তোমার মতো বন্ধুই খুঁজেছিলাম সব সময়। পাইনি। সেজন্য এই সমুদ্রের কাছে বার বার আসি। না হয়, এ সমুদ্রতীরে শুধু কিছুক্ষণের জন্য তোমাকে সঙ্গে পেলাম। এখানে বালির উপরে অবশ্য সব পথই হারিয়ে যায়, সব অতীত হারিয়ে যায়। সমুদ্রের ঢেউয়ের কান্নাও এই শুকনো বালি

বেশিক্ষণ মনে রাখে না। তুমি হয়তো তার থেকে বেশিক্ষণ আমাকে মনে রাখবে। মনে রাখবে এই রাতের কথা।

পুম্পেনের হাত একবার ধরে মেয়েটা। কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে। তারপরে আস্তে আস্তে সে হাত ছেড়ে দেয় মেয়েটা। বলে ওঠে, আসলে আমি অনেক দূর চলে এসেছি। আজ যেখানে দাঁড়িয়ে, সেখানে তুমি আর আমি এক মাটিতে দাঁড়াতে পারব না। চাইলেও পারব না। সমুদ্র সবকিছু নাকি ফিরিয়ে দেয়। কিন্তু জীবন কখনো হারিয়ে-যাওয়া সময় আর মেয়েদের সম্মান ফিরিয়ে দেয় না।

জেনে নেয়, পুম্পেন কোথায় উঠেছে। এদিকটা তেমন ভালো নয়। ওকে খানিকটা পথ এগিয়ে দেয়। তারপর বলে ওঠে, এবারে এই পথ ধরে এগিয়ে যাও। তোমার হোটেলে পৌঁছে যাবে। যাক, আজকের পরে আমিও বলতে পারব যে আমি কাউকে ঠিক পথ দেখিয়েছিলাম।

পুম্পেন বলে ওঠে, তোমার নাম কী?

মেয়েটা বলে ওঠে, ঢেউ।

—আবার হয়তো কোনোদিন দেখা হবে।

মেয়েটা উত্তর দেয় না। কিছুক্ষণ চুপ করে ওর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। চোখ ছলছল করে ওঠে।

তারপরে মুখ নিচু করে আবার উলটোদিকে হাঁটতে শুরু করে।

৩ জুন ২০২২

কেনিলওয়ার্থ, ইংল্যান্ড

ভয়নিচের অজানা ভাষা

১

রাজর্ষি। আমি ওকে রাজু বলে ডাকতাম। ও ছিল অনেকটাই আমার মতো। আমার মতো একা। চুপচাপ। আমার স্কুলের সব থেকে প্রিয় বন্ধু। স্কুলের বেশির ভাগ সময়টাই আমার কাটত ওর সঙ্গে।

অবশ্য আমরা যে শুধু স্কুলেই একসঙ্গে থাকতাম তা নয়। স্কুলের পরে রোজই আমরা হাঁটতে হাঁটতে হয় পুকুরধারে গিয়ে, না হয় আমবাগানে, না হয় বটতলার মাঠে গিয়ে বসতাম। মাঝেমধ্যে ও যেন অন্য একটা জগতে হারিয়ে যেত। পুকুরের ধারে বসে জলের মধ্যে ব্যাঙাচিগুলোর লাফালাফি দেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিত। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে যখন রোদ্দুর গড়িয়ে আসত, ও তখন অবাক হয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকত। মনে হত যেন কারো ম্যাজিক শো দেখছে। আমি কিছু কথা বলতে গেলে ঠোঁটে আঙুল তুলে আমাকে কথা বলতে বারণ করত। আর উপরের গাছের দিকে দেখাত। আর সত্যি করেই তখন যেন ওর মতোই মুহূর্তের মধ্যে ওর চোখে অন্য জগৎটাকে দেখতে পেতাম। ধরা দিত সেই চোখের সামনের অজানা জগত।

গাছের পাতায় বিছিয়ে-রাখা মাকড়সার জালে আটকে-থাকা জলের ফোঁটা মুহূর্তে যেন মুক্তো হয়ে উঠত। পাতার উপরে হাত-পা তুলে নাচতে-থাকা ছোটো কালো পোকাকে দেখতে পেতাম। খানিক দূরে সবুজ পাতার উপরে ঝিমিয়ে পড়ে-থাকা ফড়িংটার মনের ভাব বুঝতে পারতাম। তিরতির করে হাওয়ায় কাঁপতে-থাকা পাতাগুলোর মধ্যের কথাও যেন শুনতে পেতাম। সেই সুরেলা শব্দের আড়ালে চড়ুই, দোয়েল, ঘুঘুর ডাকও যেন হারিয়ে যেত। ওদের সুরের সঙ্গে তাল-মেলানো হলুদ ঘাসফুলের মাথা নাড়া চোখে পড়ত। উপর থেকে ফুলের পাপড়ি নেমে আসত। আমাদেরকেও যেন ওদের উৎসবে কিছুক্ষণের জন্য শামিল করে নিত।

কখনো বা আমরা বটতলার মাঠের পাশে বসে একসঙ্গে খেলা দেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতাম। আমি নিজে খেলতে পারতাম না। আর ওর নিজের খেলার আগ্রহ ছিল না। গোল হলে সে যে দলেরই হোক-না কেন, আমরা দুজনেই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠতাম। আমাদের মতো একনিষ্ঠ দর্শক পেয়ে যেকোনো দলই খুশি হত, তা বলাই বাহুল্য। খেলা শেষ হলে ওরা যখন মাঠ থেকে বেরোত, আমি ওদের কাছ থেকে বলটা কয়েক মিনিটের জন্য

চেয়ে নিতাম। বলটা হাতে ছুঁয়ে কী যে ভালো লাগত, বলে বোঝাতে পারব না। মাঝেমধ্যে স্বপ্ন দেখতাম, আমিও ওদের মতোই বল নিয়ে ছুটে যাচ্ছি। একের পর একজনকে কাটিয়ে গোলে শট। গোল! ঘুম ভেঙে রোজ মন খারাপ হয়ে যেত। জানি, আমি ওদের মতো কোনোদিন ভালো খেলতে পারব না।

আরেকটা দিকেও আমাদের মিল ছিল। দুজনেরই স্কুল বিশেষ ভালো লাগত না। নিয়মমাফিক কিছুই ভালো লাগত না। তবে আমি পরীক্ষায় শেষের দিকে থাকলেও ও কিন্তু বেশ ভালো রেজাল্ট করত। বরাবর ফার্স্ট হত। কী করে করত, সেটা বুঝতে পারতাম না। মাঝেমধ্যে মনে হত, আগে থেকেই ও যেন সবকিছু জানে।

ওর বাবা-মা ছিল না। মাইল পাঁচেক দূরের একটা অনাথ আশ্রমে থাকত। ওখানে কাছাকাছি স্কুল না-থাকায় আমাদের এই স্কুলে ও অনেকটা হেঁটে পড়তে আসত। অন্যদের মুখে শুনেছিলাম ওর যখন দিন দশেক বয়স, কে যেন ওকে গ্রামের চার্চের বাইরে কাপড়ে মুড়ে রেখে গিয়েছিল। ওখানকার ফাদার মোজেস ওকে কুড়িয়ে অনাথ আশ্রমে দিয়ে দেন। ওখানে অনাথ আশ্রমের অন্য বাচ্চাদের সঙ্গে মানুষ হলেও ও কিন্তু ছিল একদম অন্যরকম। সব সময় একটা অজানা আনন্দে যেন বিভোর থাকত। আর মাঝেমধ্যে নিজের মনে বিড়বিড় করে হেসে বলে উঠত, ভারী মজা।

জিজ্ঞেস করলে বলে উঠত, শুনলি না, কী বলে গেল।

—কে?

—ওই যে—বলে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখাত। দেখতাম, দূরে কোনো পাখি উড়ে যাচ্ছে। আমি ওকে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করতাম, রাজু, তুই কি ওদের কথা বুঝতে পারিস?

—না, এখনও পারি না, তবে শেখার চেষ্টা করছি। শুধু মজার কথাগুলো যখন ওরা নিজেদের মধ্যে বলে আর নিজেদের মধ্যে ছোটোছোটো ব্যাপারে ঝগড়া করে, তখন ওদের হাবেভাবে যেন একটু একটু বুঝতে পারি। —বলে থেমে যেত। আবার যেন কীসের ভাবনার মধ্যে হারিয়ে যেত।

২

ও যে অন্যরকম, বলতে গেলে একদমই অন্যরকম— আস্তে আস্তে সেটা টের পেলাম।

আমার মনে হত, সবকিছুই যেন ও আগে থেকে জানে। কিন্তু প্রকাশ করতে চায় না। তখন আমরা ক্লাস ফাইভে পড়ি। আমাদের নতুন একজন অঙ্কের টিচার এলেন স্কুলে। সৌজন্যবাবু। সৌজন্য পাত্র।

কয়েক দিনের মধ্যেই ওর একটা ডাকনাম আমাদের মধ্যে প্রচলিত হয়ে উঠল। শূন্য। এর কারণ ওর কাছে যেকোনো পরীক্ষায় ভালো, খারাপ সব ছাত্রেরই একই অবস্থা হত। সব থেকে কম মার্কস শূন্য, সব থেকে বেশি মার্কসও শূন্য। আর উনি তা দেখে যেন ভারী তৃপ্তি পেতেন। নাম্বার বলার সময় ঠোঁটের কোণে একটা হাসি লেগে থাকত। আর সে আনন্দ পাওয়ার জন্যই কি না জানি না, মাঝেমধ্যেই পরীক্ষা নিতেন ক্লাসে।

তা উনি একদিন আমাদের ক্লাসে বেশ কিছু শক্ত শক্ত অঙ্ক দিলেন। সবার মতো রাজর্ষিও শূন্য পেল। কিন্তু রেজাল্ট দেওয়ার সময় সৌজন্যবাবু ওকে আলাদা করে ডাকলেন। ওর খাতা দেখে সৌজন্যবাবু খেপে আগুন। আমরা একটু অবাক হলাম। কারণ শূন্য পাওয়ার জন্য তো আর ওর উপরে ওর রাগ হওয়ার কোনো কারণ নেই। সেটাই নিয়ম।

ওকে সামনে ডেকে নিয়ে উনি চেঁচাতে শুরু করলেন, বলি, এটা কি ইয়ারকি হচ্ছে? তোমার সম্বন্ধে তো অনেক ভালো ভালো কথা শুনেছিলাম। তা তোমারও এই অবস্থা। এটা কী? অঙ্ক চেষ্টা করে পারোনি এক কথা, আর এসব হাবিজাবি লিখে রাখা আরেক কথা। অঙ্ক না করে এসব কী লিখেছ? বলি, কবি হওয়ার ইচ্ছে থাকলে বগলে খাতা নিয়ে এখনই রাস্তার ধারে বেলতলায় গিয়ে বসতে পারো।

বলে উনি আমাদের সবাইকে শুনিয়ে পড়তে শুরু করলেন, প্রথম অঙ্কের উত্তরের জায়গায় তুমি লিখেছ—

যেসব লোকে পদ্য লেখে
তাদের ধরে খাঁচায় রেখে
কানের কাছে নানান সুরে
নামতা শোনায় একশো উড়ে
সামনে রেখে মুদির খাতা
হিসেব কষায় একুশ পাতা।

আমরা সবাই হেসে উঠলাম। আমাদের দিকে একবার কড়া চোখে তাকিয়ে উনি ফের বলে উঠলেন, তাও নিজের কবিতা হলে বুঝতাম। মূর্খ হয়ে সুকুমার রায়ের কবিতা লিখলে চলবে সারাজীবন?

আসলে সৌজন্যবাবু ছিলেন ওড়িশার লোক। আমাদের মতো উনিও ভেবেছিলেন, ওকে নিয়ে ঠাট্টা করেই রাজর্ষি বোধহয় এটা করেছে। 'উড়ে' বলে লিখেছে।

আমি নিজে একটু অবাকই হয়েছিলাম। কারণ কাউকে অপমান করে কোন কিছু করতে ওকে কোনোদিন দেখিনি। সব শিক্ষককে ও দারুণ শ্রদ্ধা করে। হঠাৎ করে এটা ও করতে যাবে

কেন!

সৌজন্যবাবু ফের হুংকার করে উঠলেন, কী ব্যাপার? কী জন্য এসব রাবিশ লিখেছিলে?

রাজর্ষি মাথা নিচু করে বলে উঠেছিল, আসলে উত্তরটা ২১ এসেছিল, তাই ওই কবিতাটার কথাই মনে এসেছিল। তাই লিখে ফেলেছিলাম।

আমরাও সবাই বুঝলাম—ওই 'একুশে আইন'-এর কবিতাটা লেখার মূল কারণ। ওই অঙ্কের উত্তরও পেয়েছিল একুশ। আর একুশই ছিল ওই শক্ত অঙ্কটার ঠিক উত্তর।

সৌজন্যবাবুর মুখ যেন আনন্দে একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

উনি ফের বলে উঠলেন, তার পরের অঙ্কটার উত্তরে 'জল' লিখেছ? সেটা আবার কী? এর থেকে জলে ঝাঁপ দিলে ভালো করতে।

—আসলে উত্তরে ১৮ এসেছিল। ওটা জলের মলিকিউলার মাস নাম্বার বা ভরসংখ্যা। তাই জলের কথা মনে এল।

আমরা ক্লাস ফাইভে কেউই তার অর্থ বুঝিনি। তখন আমরা এসব কিছুই পড়িনি। পরে বুঝেছিলাম। কিন্তু স্যার তখন বুঝেছিলেন। ওই উত্তরটাও ঠিক। আর তাই আরও অবাক হয়ে ওর ঘাড়ে সস্নেহ হাত রেখে পরের প্রশ্নের উত্তরের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করেছিলেন।

পরে দেখা গেল সব ক-টা অঙ্কের উত্তরই ঠিক। আর সব ক-টা অঙ্কের উত্তরই ও ভালোমতো কষে বার করেছে পিছনের পাতায়।

সৌজন্যবাবুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল। ওঁর অভিজ্ঞতায় এই প্রথম। আর শুধু তা-ই নয়, সংকেতের মাধ্যমে এমনভাবে লিখেছে যে অনেক পণ্ডিত লোকও সে সংকেতের অর্থ বুঝতে হিমশিম খাবে। এখানে বলে রাখি, সেদিনের বেশির ভাগ অঙ্কের প্রশ্নই ছিল অনেক উঁচু ক্লাসের।

পরে একদিন আমরা যখন বটতলার মাঠে বসে খেলা দেখছি, তখন ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ও এত কিছু জানে কী করে!

ও বলে উঠেছিল, জানিসই তো আমি অনাথ আশ্রমে থাকি। ওখানে বেশ কয়েকটা দাদা আছে, যারা উঁচু ক্লাসে পড়ে। আমি মাঝেমধ্যেই ওদের বইগুলো নিয়ে বসে যাই। নাড়াচাড়া করি। অনেক কিছু জানা যায়।

—তা তোর এসব শক্ত লাগে না। নিজে থেকে বুঝতে পারিস?

—না, শক্ত আর কী? আর তেমন শক্ত লাগলে ওদের জিজ্ঞেস করে জেনে নিই।

কথাটা ও এত সহজভাবে বলেছিল যেন যে-কেউ চাইলেই অন্য ক্লাসের বই পড়ে বুঝে নিতে পারে। আমি তো আমার ক্লাসের বই পড়েই বুঝতে পারতাম না।

এসব কথার মধ্যেও হঠাৎ করে অন্যমনস্ক হয়ে গেল। বলে উঠল, এসব প্রশ্নের উত্তর তো অনেক সোজা। বিষয়টা একটু পড়ে নিলেই সব জানা যায়। কিন্তু অনেক কিছুর উত্তরই তো কোনো বইতে নেই। আর সেসব উত্তরই তো আমি খুঁজছি।

আমি অবাক হয়ে গেলাম। এমন কী থাকবে, যা বইতে নেই? বড়োদের বইতেও নেই!

ও উঠে দাঁড়াল। বলে উঠল, আয়, তোকে দেখাই। বলে মাঠের থেকে কিছু দূরে পার্থদের বাড়ির কাছে একটা বুড়ো হিমসাগর আম গাছের সামনে নিয়ে গেল আমাকে। জিজ্ঞেস করল, দেখতে পাচ্ছিস ওদের?

—কাদের?

—আরে, ওই ছোটো ছোটো লাল পিঁপড়েগুলোকে দেখ। সার বেঁধে কীরকম উঠছে। মাটির দিকে দেখিয়ে ও বলে উঠল, ওই ওখানে ওদের গর্ত। সেখান থেকে কীরকম সার বেঁধে গাছের উপর অব্দি উঠে গেছে। এবার একটা মজা দেখ। আমি ওদের যাওয়ার পথে সামান্য একটু বাধার সৃষ্টি করব।— বলে খানিক দূরের টিউবওয়েল থেকে হাতে করে খানিকটা জল নিয়ে এসে মাটির উপরে ওদের পথে ফেলে দিল। খুব সাবধানে সামান্য জল ফেলল, যাতে একটাও মারা না যায়। কিছু পিঁপড়ে শুধু ভেসে চলে গেল। খানিক বাদে ওরা আবার অন্য পথ দিয়ে ওই আম গাছের দিকে এগিয়ে গেল।

আমাকে এবার ও বলে উঠল, কী বুঝলি, কী হল?

—কী আবার? কয়েকটা পিঁপড়ে জলে ভেসে গেল আর তারপরে ওরা অন্য পথে এগিয়ে গেল।

রাজু হেসে উঠল। বলে উঠল, তুই সবই দেখেছিস। কিন্তু এটা ওরা কি করে করল তা ভাবিসনি। কয়েকটামাত্র পিঁপড়ে আক্রান্ত হল আর সঙ্গে সঙ্গে সে খবর চলে গেল অন্যদের কাছে।—গর্তের দিকে আঙুল তুলে বলে উঠল, ওই যারা ৪ ফুট দূরে, আছে তাদের সবার কাছেও ওই খবর চলে গেছে। এমনকী যে পিঁপড়েগুলো গাছের উপরে আছে, তাদের কাছেও খবর চলে গেছে। এটা কী করে সম্ভব হল বল তো? ওরা নিজেদের মধ্যে কী সুন্দর কথা বলে দেখেছিস? ওই ভাষা কি আর কোনো বইতে লেখা আছে? ওটাই শিখতে হবে। ভেবে দেখ, ওরা কত সুন্দরভাবে একসঙ্গে থাকে। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ পিঁপড়ে। তুই এত মানুষকে কখনো একসঙ্গে দেখেছিস? একসঙ্গে একটা কাজ করতে দেখেছিস?

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বলে উঠল,তাহলেই ভাব, ওরা কত এগিয়ে আছে! আর কত সুন্দর ওদের ভাষা।

আমি তখনও ওর কথার অর্থ বুঝছিলাম না। এ আর এমন কী শক্ত ব্যাপার! আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ও বলে উঠল, চল, এসব এখনই তোর মাথায় ঢুকবে না। আমরা খেলা দেখি গিয়ে।

আমরা আবার মাঠের দিকে ফিরে চললাম।

৩

আমি তখন ক্লাস সেভেনে। হঠাৎ মা মারা গেল। কদিনের জ্বরে। হঠাৎ করে মনে হল, আমার পৃথিবীটাই যেন বদলে গেছে। মনে হল, আমাদের ছোটো সংসারটার শিকড় কেউ যেন হঠাৎ করে মাটি থেকে উপড়ে তুলে নিয়েছে। স্কুলে যাওয়াই বন্ধ করে দিলাম। বাবাও তেমন কিছু বারণ করল না। এমনিতেই আমার পড়াশোনা ভালো লাগত না।

বাবার যে ছোটো টিমটিমে মুদির দোকানটা ছিল, সেখানে বসতে শুরু করলাম। বাবারও একটু সুবিধে হল। আমি রোজ খাতায় কেনা বেচার হিসেব করে দিই।

আর বেশির ভাগ সময় যখন দোকানে লোক আসে না, তখন উলটোদিকের বট গাছটার দিকে তাকিয়ে পাখিদের খেলা দেখি। বুঝতে পারি, রাজুর সঙ্গে থেকে থেকে ওদের ভাষা খানিকটা শিখেছি। ওদের কিছু কিছু কথা যেন বুঝতে পারি। পাখিগুলো যখন গাছে বসতে উড়ে আসে, নিজেদের মধ্যে কথা বলে, তখন ওদের হাবেভাবে, ডানার ওঠানো-নামানোতেই ওদের অনেক কথা বোঝা যায়। যখন রেগে থাকে, কাউকে আক্রমণ করতে চায়, ডানাটা যেন নীচে নামিয়ে কিছু লুকিয়ে রাখতে চায়। ওদের হাবভাব দেখে ঠিক বোঝা যায়, কখন ওরা আসল মারপিট শুরু করবে, কখন শুধুই বা ভয় দেখাতে চায়। কখন মজা করছে, কখন বা বন্ধুত্ব করতে চায়। ওদের মধ্যে দু-একটা পাখি মিথ্যেও ভালো বলে। এই যেমন সেদিন দেখি, একটা কাঠঠোকরা পাখি একটা বাবুইকে ভালো বাসা বানানোর জন্য কী সব বুঝিয়ে অন্য একটা গাছে পাঠিয়ে দিল। তারপরে দেখি, ওই গাছটার গুঁড়ি ঠুকরে ঠুকরে পোকা বার করে খাচ্ছে। বট গাছটায় কখন কোন পাখি আসে, সে রুটিনটাও আমার মুখস্থ হয়ে গেল।

এভাবে প্রায় এক মাস কেটে গেল। স্কুলে না গেলেও রাজুর সঙ্গে রোজই দেখা হত। ও স্কুলের পরে আমাদের দোকানে চলে আসত। তারপর ও আর আমি মিলে ভটচায্যিদের পুকুরধারে গিয়ে বসতাম। মাছ ধরা দেখতাম। ফাতনার ওঠা-নামা, ভেসে ওঠা। রোদ আর মেঘের আলোমছায়ার খেলা দেখতাম। আলো আরেকটু কমে এলে বাঁশের কচি পাতা চিবোতে চিবোতে বটতলার মাঠে বসে খেলা দেখতাম।

এ ক'দিন আমার মা চলে যাওয়ার পর থেকে অন্য অনেক কথা হলেও রাজু আমাকে কখনোই জিজ্ঞেস করেনি কেন আমি স্কুলে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ারও

কোনো চেষ্টা করেনি। একদিন হঠাৎ ওই পুকুরধারে বসে বলে উঠল, বুঝলি, ঝড় না এলে গাছের শিকড় শক্ত হয় না। ওই, ওই— সামনের বড়ো বট গাছটা দেখ। কত বছর পুরোনো। একশো-দেড়শো বছর তো বয়েস হবেই। কত ঝড়-জল ওর উপর দিয়ে গেছে। আর তাই ও কীরকম শক্ত শিকড় গেড়েছে দেখ। গাছ থেকে ঝুরি নেমে এসে মাটি আঁকড়ে ধরেছে। হাল ছাড়েনি। এটাই আসল শিক্ষা, বুঝলি। প্রত্যেকের জীবনেই ঝড় আসা উচিত। তা না হলে অনেক কিছু শেখা যায় না। জীবনের এই অন্ধকারে ঢাকা দিনগুলোই আমাদের আলোর সন্ধান দিয়ে যায়। আমাদের ভাবতে হবে, সেই ঝড়ের কাছে হেরে যাব কি না, নাকি এমনভাবে তৈরি হব, যাতে পরের ঝড়েও কিছু না হয়।

ও পকেট থেকে একটা ছোটো কাপড় বার করল। খুব পুরোনো একটা সাদা রুমাল। তাতে সেলাই করে কয়েকটা নকশা আঁকা।

—এটা কীজানিস?

—না। এটা কোথায় পেলি?

—আমাকে যখন চার্চের বাইরে পাওয়া গিয়েছিল, এ রুমালটাও তখন সেখানে পাওয়া গিয়েছিল। আমার মনে হয়, এটা আমার মা আমার জন্য রেখে গিয়েছিল। হয়তো এই নকশাটার অর্থ যখন খুঁজে পাব, তখনই আমার মা-কে খুঁজে পাব। আমি যাতে বড়ো হয়ে আমার মা-কে খুঁজে বার করতে পারি, সেজন্যই রেখে গিয়েছিল, তা-ই না?

—ঠিক বলেছিস।

দেখতে পেলাম, ওর চোখ ছলছল করে উঠল। ওর চোখে কখনো জল দেখিনি আগে।

বলে একটু থেমে ও ফের বলে উঠেছিল, কালকে আবার স্কুলে চলে আসিস। একটা মজা দেখাব।

—এতদিন বাদে হঠাৎ করে যাব কী করে! সবাই বকবে তো রে! প্রায় এক মাস কিছুই তো পড়িনি। সামনেই তো পরীক্ষা।

—আহা, এত ভাবিস কেন? আমি তো আছি। আর এই যে এক মাস স্কুলে যাসনি, তাতেও কি কম কিছু শিখেছিস?

সত্যি কথা বলতে আমি তখন এসব কথা বুঝিনি। শুধু আরেকবার মনে হয়েছিল ও অন্যরকম।

আর কী ভেবে জানি না আবার আমি পরের দিন স্কুলে গিয়েছিলাম। সেদিন টিফিনের বিরতিতে হঠাৎ আমাকে বলে উঠল, চল, তোকে যে বলেছিলাম, সেই মজার খেলাটা দেখাই।

বলে স্কুল থেকে একটু দূরে নিয়ে গিয়ে আমাকে একটা দেশলাই বাক্স আর একটা ছোটো কাগজ দিল। অবাক হয়ে ওটা দেখে বলে উঠলাম, এটা আবার কী?

কাগজটা একটা বড়ো কাগজ থেকে কাটা। ১ ইঞ্চি মতো চওড়া, চার ইঞ্চি লম্বা। ছোটো ছোটো করে বেশ কয়েকটা বাংলা অক্ষর তাতে লেখা আছে। কিন্তু কিছু কিছু অক্ষরের মধ্যে বেশি গ্যাপ থাকলেও পুরো লেখাতে কোনো অর্থবহ শব্দ নেই।

অচবট চকতলমেকাগাছেলিপি ঠেরনীচে

ও এবার ওই কাগজটা দেশলাই বাক্সের উপরে জড়িয়ে দিল। আর বলে উঠল, এটা আসলে একটা সাংকেতিক বার্তা। আজ থেকে আমি আর তুই যখন কোনো কথা বলব, এই দেশলাই বাক্সের সাহায্যেই বলব। দেশলাই বাক্স তো যেখানে ইচ্ছে পাওয়া যায়। শুধু মনে রাখবি, যেখানে 'ব' অক্ষরটা থাকবে, সেখান থেকে শুরু করবি আর সেটা দেশলাইয়ের পাশের দিকে প্রথম অক্ষর যেন হয়। এটা শুধু এ লেখাটার জন্যই নয়, আমার আর তোর মধ্যে ওটাই হবে কিওয়ার্ড। কী খেয়াল থাকবে তো?

—বলে ও ওই আবোল-তাবোল অক্ষর-লেখা কাগজটা দেশলাই বাক্সের উপর দিয়ে সেভাবে জড়িয়ে দিল।

আর তারপরে বলে উঠল,'ব' অক্ষরটা যেখানে থাকবে, সেখান থেকে শুরু করবি। আর দেশলাইয়ের ঠিক পাশের দুটো দিকে যেটুকু পাবি, সেটুকুই পড়বি। বাকি অংশতে, অর্থাৎ দেশলাইয়ের সামনে বা পিছনে যে লেখা থাকবে তা দেখবি না। আর সেটুকু অংশের মধ্যে অর্থপূর্ণ শব্দ খুঁজবি। একই শব্দের দুটো অক্ষরের মধ্যে ফাঁকও থাকতে পারে।

সেরকম করে দেখলাম। তাতে যে তিনটে শব্দ ধরা পড়েছে তা হল —

বট গাছের নীচে।

—বট গাছের নীচে—সে আবার কী?

—চল, গিয়ে দেখাই যাক-না। এখানে তো একটাই বট গাছ আছে।

এখানে বলে রাখি আমাদের স্কুলের পাশেই একটা খেলার মাঠ, আর সেখানে একটা বড়ো বট গাছ ছিল। সেখানে গিয়ে ও বলে উঠল, এবার মাটিটা একটু সরিয়ে দেখা যাক।

বট গাছের নীচে কিছুটা জায়গা জুড়ে আলগা মাটি ছিল। যেন কেউ কিছুক্ষণ আগেই খুঁড়ে কিছু রেখেছে। সেই আলগা মাটি খানিকটা সরাতেই আমি আমার পুরোনো ভাঙা টিফিন বক্সটা খুঁজে পেলাম। কিছুদিন আগে দিপু আমার থেকে মজা করে ওটা ছিনিয়ে নিয়েছিল। কোথায় রেখেছিল জানতাম না। ভারী দুষ্টু ছেলে। সব সময় অন্যদের খেপিয়ে তবে শান্তি পেত।

বলেছিল, ওই ভাঙা টিফিন বক্সটা এমন জায়গায় লুকিয়ে রাখবে যে আমি আর কোনোদিন খুঁজে পাব না।

—তা তুই কী করে জানলি?

—আরে, আমি ওর পিছন পিছন লুকিয়ে এসে দেখে গিয়েছিলাম।

আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল। আমার মায়ের গন্ধ এখনও লেগে আছে ওতে। ওতে করেই রোজ মা খাবার দিত।

রাজু শুধু বলে উঠেছিল, দেখলি, আমি আর তুই কীভাবে সাংকেতিক ভাষায় কথা বলতে পারলাম। এই লেখা কাগজ অন্য কারোর হাতে গেলেও সে কিছুই বুঝতে পারত না। তবে আমাদের দুজনের কাছেই একই রকম দেশলাই বাক্স থাকতে হবে। আর জানতে হবে, কোন অক্ষরটা থেকে শুরু করতে হবে।

একসময় গ্রিকরাও এরকমভাবে কোডের মাধ্যমে কথা খুব গোপনীয় তথ্য পাঠাত। শত্রুপক্ষের হাতে গেলেও কেউ কিছু বুঝতে পারত না।

—তা আমরা কি যুদ্ধে যাচ্ছি? আমাদের এসব কোডের কি দরকার পড়বে?—আমি হেসে বলে উঠেছিলাম।

ও বলে উঠল—কে জানে কখন দরকার হবে? তবে এ সংকেতের ভাষা হবে শান্তির ভাষা। যদি কোনোদিন খারাপ দিন আসে, ভালো লোকেদের উপর অন্যায়-অত্যাচার করা হয়, সেদিন হয়তো আমাদের এ ভাষারই দরকার পড়বে।

আবার ওর কথা কিছুই বুঝলাম না।

৪

যত দিন যাচ্ছিল, আমার মনে হচ্ছিল, রাজর্ষি যেন অন্য একটা জগতে হারিয়ে যাচ্ছিল। ও যেন আরও চুপচাপ হয়ে যাচ্ছিল। কথা আরও কম বলত। তাও যা বলত, তা বলতে গেলে শুধুই আমার সঙ্গে। বেশির ভাগ সময় আমাদের স্কুলের লাইব্রেরিতে কাটাত। ওখানে কয়েকটা কম্পিউটার ছিল। ও সারাক্ষণ কী সব সার্চ করে দেখত ওতে। এটুকু শুধু বুঝতে পারতাম যে ও যা দেখত তা খেলার কিছু নয়। আবার পড়ার বই সম্পর্কিত কিছুও নয়।

একদিন ওকে দেখলাম খুব খুশি। বলে উঠল, কাজ ভালোই এগোচ্ছে। আর- একটু এগোলেই আমি ওদের ভাষা বুঝতে পারব। তবে যা ভেবেছিলাম, শুধু আমিই না, আমার আগে অনেকেই এ ভাষা শেখার চেষ্টা করেছে। ভাগ্যিস ওই 'ভয়নিচ ম্যানাস্ক্রিপ্ট'-এর কিছু অংশ নেটে পাওয়া গিয়েছিল। তা না হলে আমি জানতেও পারতাম না। ২০০ পাতার এই

বইয়ের অর্থ আমেরিকার মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সও এত বছরে বার করতে পারেনি। এ বই কী নিয়ে লেখা, কেন লেখা, তার কারণ গত ৮০০ বছরেও কেউ উদ্ধার করতে পারেনি।

—ভয়নিচ? সেটা আবার কী?

ও একটু হেসে বলে উঠল, তুই অত বুঝবি না। সংক্ষেপে বলতে গেলে এটা একটা সংকেতে লেখা বই। খুব সম্ভবত ১২০০ সাল নাগাদ রজার বেকন নামের এক অসাধারণ প্রতিভাবান ইংরেজ এটা লিখেছিলেন। উনি ছিলেন এককথায় জিনিয়াস। বহু হাত ঘুরে রোমান সম্রাট দ্বিতীয় রুডলফের কাছেও এ বইটা যায়। এটা বহু বছর ধরে প্রাগে ছিল। তারপরে এটা ভ্যাটিকানে চার্চের হাতে আসে। সেখান থেকে এটা কেনে উইলফ্রিড ভয়নিচ নামের একজন পুরোনো বইয়ের ডিলার। বইটা অসাধারণ। রজার বেকনের সারাজীবনের রিসার্চের ফসল। আমি যা খুঁজছি, তার সম্বন্ধেও খানিকটা তথ্য আছে।

—তা তুই কী করে জানলি? এত বছর কেউ যা পড়তে পারেনি, তা তুই কী করে উদ্ধার করলি?

—আসলে যেকোনো কোড ব্রেক করতে গেলে, যে লিখেছিল, তাকে ভালো করে জানতে হয়। সে সময়টাকে ভালো করে বুঝতে হয়। 'কিওয়ার্ড'গুলো ভালো করে বুঝতে হয়। মনে আছে আমার আর তোর মধ্যে যেমন 'ব' অক্ষরটা একটা 'কিওয়ার্ড'। এটা তো অন্য কারো পক্ষে জানা সম্ভব নয়। তাই 'কিওয়ার্ড' না জানলে সংকেত উদ্ধার এত শক্ত হয়ে যায়। আমি ওই বইয়ের 'কিওয়ার্ড'গুলো কিছুটা আবিষ্কার করেছি আর সেভাবেই মনে হয়, খানিকটা পড়তে পারছি। ইন্টারনেটে বইয়ের কিছু জায়গা তুলে দিয়ে সেটা পড়ে উদ্ধার করার বিষয়ে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছিল। আর এর জন্য বড়োরকম পুরস্কারও ছিল। কিন্তু আমি তো আর সেজন্য বইটা পড়ছি না। আমি পড়ছি, যাতে আমি ওদের ভাষা ভালো বুঝতে পারি।

—কাদের ভাষা?

—কাদের ভাষা, সেটা তো এখনই বলা যাবে না। পুরো বইটা না পেলে এর পুরো অর্থ বুঝতে পারব, সেটাও এখনই বলা যাচ্ছে না। কিছু কিছু জায়গায় ভালো ল্যাটিন না-জানার জন্যও বুঝতে একটু অসুবিধে হয়েছে। আসলে এ বইটা পড়া এত শক্ত কেন জানিস? লেখার সময় পুরো অন্য একটা নতুন হরফ ব্যবহার করা হয়েছিল, যেটা এ বইয়ের বাইরে কোথাও ব্যবহার হয়নি। সেটা খানিকটা ল্যাটিন থেকে নেওয়া, খানিকটা গ্রিক থেকে নেওয়া, খানিকটা একদম অন্য ধরনের। আর সেই হরফটাই আমি উদ্ধার করার চেষ্টা করছি।

—তা এখন ওটা আছে কোথায়?

—আমেরিকার ইয়েল ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরিতে ওটা রাখা আছে। আমি একটা পাতার অর্থ খুঁজে বের করে ওদের জানিয়েছি। আর বইয়ের আরও কিছু পাতা যাতে আমাকে পাঠানো হয়,তার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলাম। ওরা আমার কাজে খুব খুশি। তাই আরও কিছু কিছু অংশ পাঠিয়েও দিয়েছে। দেখা যাক, কী হয়।

—তাই? কই, দেখা আমাকে।

ও আমাকে কম্পিউটারের আছে নিয়ে গেল। মেইল থেকে একটা ফাইল খুলে দেখাল। তাতে দেখলাম বেশ কিছু গাছ, ফুল, পাতার ছবি। কোনোটাই চেনা গাছ, ফুল বা পাতা নয়। আর তাতে অদ্ভুত সব রং। লাল, নীল, সবুজ, হলুদ, খয়েরি। কিন্তু ছবিগুলো এত যত্ন সহকারে সমস্ত ডিটেলসের সঙ্গে আঁকা যে দেখেই বোঝা যায় এটা সামান্য কোনো বই নয়। আর সামান্য কোনো কারণেও লেখা নয়। ছবির মাঝেমধ্যে লেখাও আছে।

ও ফের বলে উঠল,শুনেছি এরকম ১১৩টা সম্পূর্ণ অপরিচিত গাছ, ফুল,পাতার ছবি আছে। তুই বল। আমরা তো কত গাছ দেখেছি। এরকম একটা গাছ কখনো দেখেছি? আসলে একই গাছের থেকে ফুল, ডাল, পাতা নেওয়া হয়নি। বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন প্রজাতির গাছ থেকে নেওয়া হয়েছে। তোকে বইয়ের অন্য একটা সেকশন থেকে ছবি দেখাই। —বলে ও অন্য একটা ছবিতে গেল। —এটা অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল সেকশন।

কিছুই বুঝলাম না। কিছু বৃত্ত আঁকা। কিছু মহিলা, পুরুষের ছবি ওই বৃত্তের গায়ে। চাকার মতো দেখতে ছ-টা তারার ছবি।

আমাকে অবাক হয়ে দেখতে দেখে ও বলে উঠল, বহু লোক এটা পড়ে বোঝার চেষ্টা করেছে। পৃথিবীর সেরা ক্রিপ্টোগ্রাফাররাও এর অর্থ বুঝে উঠতে পারেনি। ক্রিপ্টোগ্রাফার মানে বুঝেছিস তো? যারা এরকম সাংকেতিক ভাষা নিয়ে চর্চা, গবেষণা করে। তবে এতে যে খুব মূল্যবান তথ্য লুকিয়ে রাখা আছে তা নিয়ে কারো কোনো সন্দেহ নেই। আর তাই সম্রাট দ্বিতীয় রুডলফ প্রচুর মূল্যে তখনকার দিনে এই বই সংগ্রহ করেছিলেন।

—তা পৃথিবীর সেরা সেরা বিশেষজ্ঞ যেখানে পারল না, তুই পারবি?

ও হেসে বলে উঠল, পারতে তো হবেই। আর এটা জানলেই ওদের ভাষার সন্ধান পাব। এর আসল রহস্য হল এর অক্ষর, কৃত্রিম একটা ভাষা, যাকে তৈরি করা হয়েছিল শুধু এই বইয়ের জন্য। যে লিখেছে আর যার জন্য লেখা, তারা ছাড়া এই কৃত্রিম ভাষা আর কেউ জানত না। —এতটা বলে থামল রাজর্ষি।

কথা বলতে বলতেই দেখলাম, ও কয়েকজন মহিলার ছবি দেখে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে। একদৃষ্টে আবার তাকিয়ে আছে কম্পিউটারের দিকে। শুধু বিড়বিড় করে যেন বলে উঠল, তা-

ই তো, এটা তো ভেবে দেখিনি! 'ভদ্রমহিলা'কে যেন কী বলা হত ল্যাটিনে—ফেমিনা বা ম্যাট্রোনা। তার মানে ওরা কি—আবার যেন কথাটা হারিয়ে গেল। আমি আর কথা না বলে বেরিয়ে এলাম।

ওদিকে আমাদের গ্রাম যেন খুব তাড়াতাড়ি পালটে যাচ্ছিল। বেশ কিছু নতুন নতুন লোকের যাতায়াত শুরু হয়েছিল গ্রামে। কেন জানি না। তাদের মধ্যে অনেকে আমাদের গ্রামের ভাঙা রাজবাড়ির কাছাকাছি থাকা শুরু করল। দিনেদুপুরে ওখানে লোক দেখা যেতে লাগল। আর তাদের মুখ-চোখ দেখলেই মনে হয় চোর বা ডাকাত।

শুনেছিলাম, বহু আগে আমাদের গ্রামে নাকি এক খুব বড়ো রাজা থাকত। সেটা অবশ্য হাজার বছর আগের কথা।

একদিন রাজর্ষিকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম।

ও বলল, হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস। ওরা কেন আসছে, জানিস? আমার মনে হয় গুপ্তধনের খোঁজে। লোকগুলোর চেহারা দেখে একটাকেও ভালো মনে হয় না।

আসলে কিছুদিন আগে কাগজে একটা লেখা বেরিয়েছিল এখানকার রাজবাড়ি নিয়ে। এখানে নাকি পাল রাজবংশের রামপাল ও তার পরেও রামপালের পরের কয়েক প্রজন্ম থাকত। রাজরাজড়াদের ব্যাপার বুঝতেই পারছিস। গুপ্তধন থাকার হাই চান্স। তারপর থেকেই ওদের আসা শুরু হয়েছে।

—তা ভালোই তো। ওরা গুপ্তধন খুঁজে পেলে আমাদের গ্রামটার চেহারাই পালটে যাবে। কী সুন্দর হত বলতো যদি এখানে ওই গুপ্তধনের টাকায় ভালো হাসপাতাল তৈরি হত। ভালো স্কুল তৈরি হত। আমাদের স্কুলের বিল্ডিংটারও যা অবস্থা, কোনদিন না ভেঙে পড়ে।

—তুই কী ভাবছিস, ওরা ওই গুপ্তধন দিয়ে গ্রামের সাধারণ মানুষদের জন্য কিছু করবে! ওরা আরও বন্দুক কিনবে, আরও বোমা কিনবে, আরও অনেক লোককে মারবে। ওরা আমাদের দেশের ভালো চায় না।

—তা সেটা তুই কী করে জানলি?

—আমি ওদের কথা লুকিয়ে শুনেছি। সবাই এসেছে গুপ্তধনের সন্ধানে। আর ওরা একই দলের লোক। ওদের একটা বড়ো অংশ সীমান্ত পেরিয়ে এসেছে। আমার মনে হয়, এ দেশে বড়ো কোনো টেররিজমের ঘটনা ঘটাতে চায়। তার জন্য দরকার অনেক টাকা। সেটা এই গুপ্তধন পেলে সহজেই ওদের হাতে চলে আসবে।

—ওরেবাবা! তোর কী সাহস! তা তোর কী মনে হয়? ওখানে গুপ্তধন সত্যি আছে?

—নিশ্চয়ই ওদের কাছে খবর আছে। তা না হলে কি আর ওরা এমনি এমনি আসত? আর ওদের অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে। ওদের সঙ্গে কানাইও আছে।

কানাই হল আমাদের গ্রামের কুখ্যাত গুন্ডা। খুনোখুনি, মারামারি আর যত রকমের খারাপ কাজ হয়, তার মূল পান্ডা হল কানাই। বেশির ভাগ দোকান থেকে জোরজুলুম করে নিয়মিত টাকা আদায় করে। কেউ না দিলে দোকান ভেঙে দেয়।

—কী করা যায় বলত?

—আমরা আর কী করতে পারি? তবে ওদের থেকে দূরে থাকাই ভালো। অত সহজে ওরা গুপ্তধনের সন্ধান পাবে না। এত বছর যা কেউ খুঁজে পায়নি, তা কি অত সহজে যেখানে-সেখানে মাটি খুঁড়লেই পাওয়া যায়?

৫

এর কিছুদিন পরের কথা। চায়ের দোকানে দুটো লোক কথা বলছিল। একটা বেঞ্চির উপরে বসে চায়ের ভাঁড়ে চুমুক দিতে দিতে কথা বলছিল। আমি পাশের একটা বেঞ্চিতে বসে একটা সদ্য-পাওয়া গল্পের বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছিলাম। আর অপেক্ষা করছিলাম বিকেলের শেষ আলোর। তখন লাল হয়ে-যাওয়া আকাশটা যেভাবে সামনের বড়ো পুকুরে ডুব দেয়, আমার খুব ভালো লাগে। আর তাই মাঝেমধ্যে মুখ তুলে দেখছিলাম।

—এই ছেলেটা, শোন এদিকে।

হঠাৎ মনে হল, পাশের বেঞ্চির লোক দুটোর মধ্যে একজন আমাকে ডাকছে। ওদিকে তাকাতে আঙুল নেড়ে ডাকল।

কাছে যেতে বলে উঠল, আচ্ছা, তোর সঙ্গে যে ওই ছেলেটা থাকে, তার নাকি ভারী বুদ্ধি। তাকে বলিস তো আমাদের সঙ্গে দেখা করতে। আমরা ওকে একটা কাগজ পড়তে দেব। তার অর্থ বুঝতে পারলে অনেক অনেক টাকা দেব। তোকেও দেব। পারবে বলে মনে হয়? অবশ্য কাজটা কিন্তু সোজা নয়।

আমি উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলাম, পারবে না মানে, অবশ্যই পারবে। যা-ই লেখা থাকুক-না কেন, ও ঠিক বলে দেবে। ওর প্রচণ্ড বুদ্ধি। যেকোনো সংকেতের অর্থ উদ্ধার করে দিতে পারে।

লোক দুটোর মুখ যেন খুশিতে চকচক করে উঠল। মোটা কালো ভোঁতা মুখের লোকটা শুধু গম্ভীরভাবে বলে উঠল, ঠিকই শুনেছি তাহলে। তাহলে আজকেই ওকে চাই।

উত্তেজনার বশে বলে ফেলেছিলাম। আমার মনটা যেন হঠাৎ করে বলে উঠল, ভুল করেছি। ভুল করে ওদের বলে ফেলেছি। সামলাতে বলে উঠলাম, তবে সব সময় যে পারবেই, তেমন

কোনো কথা নেই।

লোক দুটো একবার আমার দিকে কড়া চোখে তাকাল। তারপরে কিছু কথা না বলে উঠে দাঁড়াল। দোকানের চায়ের দাম মিটিয়ে চলে গেল।

যা ভয় পেয়েছিলাম, ঠিক তা-ই।

এরপরে কয়েকদিন রাজর্ষির আর খোঁজ পেলাম না। আমি স্কুলে হেডস্যারকে জানালাম। উনি আমাকে অঙ্কের স্যার তরুণবাবুর সঙ্গে ওই অনাথ আশ্রমে পাঠালেন।

রাজর্ষি ওখানে নেই। শুনলাম, দু-দিন আগে সকালে ওর এক মামা এসে নিয়ে গেছে কয়েকদিনের জন্য। কথাটা আমার বিশ্বাস হয়নি। ওর তো কোনো মামা আছে বলে জানতাম না। কিন্তু আমার কথাতে কেউ তেমন কান দিল না। আসলে ওকে নিয়ে চিন্তা করার কারো সময় ছিল না। আমি একা পুরো গ্রাম, আশপাশের এলাকা, যেখানে যেখানে যেতে পারে সব তন্ন তন্ন করে খুঁজে এলাম। কিন্তু কোথাও খুঁজে পেলাম না।

তিন দিন বাদে ও আবার স্কুলে এলো।

আমি যা ভয় পেয়েছিলাম, ঠিক তাই। ওকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, ওরাই ধরে নিয়ে গিয়েছিল রাজর্ষিকে। কিন্তু কাউকে জানালে ওকে মেরে ফেলবে বলে ভয় দেখিয়েছে। তাই আমার বাইরে এ কথাটা আর কেউ জানল না। শুনলাম ওরা একটা খুব পুরোনো কাগজ নাকি ওকে দেখায়। কিন্তু অনেক চেষ্টার পরেও রাজর্ষি সেটা পড়ে উদ্ধার করতে পারেনি। কয়েকদিন ওরা রাজর্ষিকে আটকে রাখে। পরে ছেড়ে দেয়।

ও যতই বলুক-না কেন, আমার কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিল না যে ও পারেনি। ওকে আরও জিজ্ঞাসা করতে ও শুধু ওর জামাটা তুলে ধরল। দেখলাম সারা পিঠে বেল্ট দিয়ে মারার দাগ। তাকানো যায় না। বলে উঠল, পারলে কি আর এমনভাবে মার খেতে হত রোজ?

—তোকে ওরা মারত?—আমার মাথার মধ্যে যেন হঠাৎ আগুন জ্বলে উঠল। —কিন্তু কেন? তুই ওটা সলভ না করতে পারলে কী করার আছে?

ও কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল।

—কে? কে মারত তোকে?

—কানাই।

৬

ক্লাস টেনের পরে ও আর পড়াশোনাই করল না। স্কুলে আসা ছেড়ে দিল। অনেকের ধারণা হয়েছিল যে ওর মাথা একদম খারাপ হয়ে গেছে। যে অত ভালো পড়াশোনায়, সে হঠাৎ করে এভাবে মাঝপথে পড়া ছেড়ে দেয়।

যার পড়ার কথা ছিল না, সেই আমি কিন্তু ওর উৎসাহেই পড়া ছাড়িনি।

মাধ্যমিকে মোটামুটি ভালোই রেজাল্ট করলাম। আর তা নিয়ে ওর কীআনন্দ।

আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠল, জানতাম, তুই পারবি।

আমি অভিমানে ওর সঙ্গে মাঝে বেশ কিছুদিন কথা বলিনি। আসলে খুব রাগ হত যে ও হঠাৎ করে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছিল। আমার কোনো কথাই শোনেনি।

তা আমি সে কথা বলতে ও হেসে বলে উঠল, পরীক্ষা দিইনি বটে, তবে পড়াশোনা কিন্তু ছাড়িনি। আমার ওদের নিয়ে পড়াশোনার জন্য অনেক সময় দরকার ছিল। পরীক্ষা দিলে তো আর সে সময় পেতাম না।

—কাদের নিয়ে?

ওর মুখে সেই চিরকালের ছেলেমানুষি হাসি। বলে উঠল, একদিন বুঝবি। তা আমি স্টেশনের কাছে একটা নতুন দোকান খুলেছি। একদিন চলে আয় দেখতে।

—দোকান? কীসের?

—দোকান ঠিক নয়। মাটির উপরে বসছি। ছবি বিক্রির।

—বলিস কীরে? তুই আবার ছবি আঁকতে শিখলি কবে? আর এত কিছু থাকতে ছবি আঁকার শখ আবার কবে থেকে হল?

—আসলে কিছু একটা করে পড়াশোনাটা চালাতে হবে তো! আর টাকা কোথায় পাব! তাই ভাবলাম, স্টেশনের সামনে বসে ছবি আঁকলে লোকে দু-একটা কিনবে। এখন আর অনাথ আশ্রমে থাকা যাবে না। একটা ছোটো ঘর ভাড়া করেছি। কোনোরকমে দু-বেলার খাওয়াটা চলে গেলেই হয়।

—তা তুই তো আরেকটু পড়াশোনা করে নিলেই ভালো চাকরি পেয়ে যেতিস। তার পাশাপাশি না হয় এসব করতিস। তোর মতো এরকম একজন ছাত্র পড়াশোনা ছেড়ে দিলে হয়! আমাদের টিচারদের সবার তোর জন্য মন খারাপ।

ও খানিকক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর বলে উঠল, আসলে সামনে সমুদ্র থাকলে, তখন আর পুকুরে যাওয়ার ইচ্ছে হয় না। তা সে যাক গে। তুই ছবি দেখতে অবশ্যই আসিস একদিন।

৭

গিয়েছিলাম। তবে বেশ কয়েকদিন বাদে। সেদিন সন্ধে হয়ে এসেছিল। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের একপ্রান্তে বসে দেখি, ও একমনে এঁকে চলেছে। দুটো নোংরা হাফপ্যান্ট-পরা বাচ্চা পাশে বসে

আঁকা দেখছে। একজন উবু হয়ে বসে আছে। আরেকজন উপুড় হয়ে প্ল্যাটফর্মের উপরে শুয়ে গালের নীচে হাত দিয়ে ছবি আঁকা দেখছে। যেন এমন ছবি আগে কখনো দেখেনি।

রাজু এত মন দিয়ে আঁকছিল যে আমাকেও খেয়াল করেনি। আমিও চুপচাপ পাশে বসে দেখছিলাম। একটা অদ্ভুত ধরনের ছবি। একটা গাছের ডালের উপর দিয়ে সার বেঁধে বেশ কয়েকটা পিঁপড়ে হেঁটে চলেছে। তাদের প্রত্যেকের হাতে ছোটো ছোটো পাতা। ছবিটা এত জীবন্ত, এত সুন্দর রঙের ব্যবহার যে দেখে মুগ্ধ না হয়ে থাকা যায় না। ও যে কবে এত, ভালো ছবি আঁকতে শিখল, জানি না।

আমাকে দেখে ওর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলে উঠল, যাক, তাহলে রাগ একটু কমেছে। আমি তো ভাবছিলাম, তুই আসবিই না বুঝি।

—না, সত্যিই আসতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। নেহাত এদিকে এসেছিলাম তাই। তা তোর ছবি বিক্রি হয়?

—হ্যাঁ, ওই দিনে দুটো-তিনটে ছবি বিক্রি হয়। তাতেই ভালো চলে যায়। দাম কমই রেখেছি। এখানে তো আর সেরকম বড়োলোক কেউ কেনার নেই। তা ছবিগুলো কীরকম হচ্ছে দেখে বল তো!

ওর পাশে আরও বেশ কয়েকটা ছবি ছিল। দেখলাম। অবাক কাণ্ড। বেশিরভাগ সব পিঁপড়ের ছবি। কোনোটায় ফুলের উপরে বসে আছে। কোনোটায় শুধু একটাই পিঁপড়ে খাবার মুখে করে আনছে। কোনোটাতে আবার দুটো পিঁপড়ে নিজেদের মধ্যে মারপিট করছে। একটাতে বেশ কয়েকটা পিঁপড়ে পর পর হাত ধরাধরি করে দুটো ডালের মাঝের ফাঁকা অংশে একটা ব্রিজ তৈরি করে একটা ডাল থেকে আরেকটা ডালে যাওয়ার চেষ্টা করছে। সব ক-টা ছবিতেই রঙের অদ্ভুত সুন্দর ব্যবহার। আর তাতে দারুণ সূক্ষ্মডিটেলসও ধরা পড়েছে।

একটা ছবি দেখে বলে উঠলাম, পিঁপড়েটা যেন হাসছে বলে মনে হচ্ছে। কী করে এরকম ছবি আঁকলি তুই?

ও দেখলাম, খুশি হয়ে নড়েচড়ে বসে বলে উঠল, যাক, আমার সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়ে তোর একটু দৃষ্টিশক্তি হয়েছে দেখছি। আসলে যে কারো ছবি আঁকতে হলে তাদের কথা বুঝতে হবে আগে। তা না হলে কি আর আঁকা যায়? তারা মনে মনে কী ভাবছে, সেটা কি বোঝানো যায়?

—তা তুই কি ওদের কথা বুঝিস?

—হ্যাঁ, বুঝি না মানে! ওটাই তো শিখতে এত সময় লেগে গেল। ওই যে সামনে দেখ, এখনও একটা বসে আছে। আমার সঙ্গে খানিক আগেও কথা বলছিল।

আমি সত্যি দেখলাম, একটা কাঠপিঁপড়ে ও যে ছবিটা আঁকছে, তার মাথার কাছে বসে আছে। আর শুঁড় দোলাচ্ছে।

—ও এখন তোকে দেখছে খেয়াল করে। আমার সঙ্গে কথা বলছিস তো। আমি ওদেরকে কিছু কিছু জিনিস শিখিয়েছি। কীভাবে আমরা কথা বলি। কীভাবে আমরা মনের নানান ভাব প্রকাশ করি। হাসলে কি হয়, কাঁদলে কি হয়, হাঁচলে কি হয়—এরকম। এসব শিখতে ওদের সময় লাগবে। তবে একটা জিনিস দেখেছি, একজন শিখে ফেললে ওদের বাকিরাও সেটা খুব তাড়াতাড়ি শিখে নিতে পারে। এদের মধ্যে দলবদ্ধভাবে শেখার প্রবণতা খুব বেশি। —ও বলে উঠল।

আমার কেমন যেন মনে হল ও আর স্বাভাবিক নেই। ওর কি সত্যি মাথা একদম খারাপ হয়ে গেছে! তা না হলে এরকম সব কথা বলে!

আরও আধ ঘণ্টা বাদে ওর ওই আঁকা শেষ হল। বাচ্চা দুটো এতক্ষণ কোনো কথা না বলে মন্ত্রমুগ্ধের মতো ছবি দেখছিল। আমরা রাজুর বাড়ির দিকে হাঁটা শুরু করলাম। স্টেশন থেকে বেশ খানিকটা দূর। পাশে একটা ইটের ভাঁটা আছে। ও আর ওখানকার দুজন শ্রমিক একসঙ্গে থাকে একটা ছোটো বাড়িতে। কী করে ওর মতো একজন এদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে পারে, সেটাই অবাক লাগল।

তা যা-ই হোক, পরের দিন আবার ওর ছবি আঁকা দেখতে গেলাম। আবার তার পরের দিন। এভাবে প্রায় রোজই যেতাম। ভাবতাম, এমনিতেও আর পড়ে কি হবে! আমার যা অবস্থা!

বিকেলের দিকে যেতাম আর সন্ধে অব্দি থাকতাম ওর সঙ্গে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারছিলাম, ও যা আঁকছে তা নেহাত ছবি নয়। একটা ভাষা। একটা সাংকেতিক ভাষা। সে ভাষা কে ঠিক বোঝে, তা আমার জানা নেই। তবে কেউ নিশ্চয়ই বোঝে। আর তাই ছবির মধ্যে খুব ছোটোখাটো ডিটেলসও এত যত্ন নিয়ে ও ফুটিয়ে তোলে।

ও মাটির উপরে বাবু হয়ে বসে যখন তুলির টানে রং করত, আমি এটুকু বুঝতাম যে ওর আঁকা ছবি পৃথিবীতে আঁকা বাকি সব ছবির থেকে একদম আলাদা। এখানে রং আর রেখায় ও যা আঁকে, তা হল অজানা এক ভাষা, অজানা এক হরফ। ওর ছবি দেখতে রোজই কোনো না কোনো দেড়-দু-বছরের খুব ছোটো বাচ্চা এসে বসত। আর আবিষ্ট হয়ে ওকে কোনোরকম বিরক্ত না করে বসে বসে ছবি আঁকা দেখত। তার কারণ কি এই যে ওরা তখনও অন্য কোনো ভাষা শেখেনি? আর তাই প্রকৃতির মধ্যে লুকিয়ে-থাকা এই আদি অকৃত্রিম ভাষাকে তারা বুঝতে পারে! কে জানে?

আর দেখত পিঁপড়ের দল। অবাক হয়ে দেখতাম যে ও যেখানে আঁকে, সেখানে সেই জায়গায় ওকে ঘিরে পিঁপড়ে আর পোকার সংখ্যা অনেক বেশি। তারা শুধু যে ওর ছবিকে ঘিরে বসে থাকে তা-ই নয়, ওর হাতে, পায়ে, গায়ে ঘুরে বেড়ায়। আর তাতেও রাজু কোনো ভ্রূক্ষেপ না করে ঘাড় নিচু করে এঁকে যায়।

ছবি যে একদম বিক্রি হত না, তা নয়। কিন্তু খেয়াল করতাম, কিছু ছবি ও বিক্রি করত না। যেগুলো বিক্রি করত, সেগুলো নিছক নানান রকমের জীবজন্তু, গাছপালার ছবি। সেগুলো ওর আঁকতে বেশি সময় লাগত না। কিন্তু তার বাইরে সারাদিন ধরে যেসব ছবি এত যত্ন নিয়ে আঁকত, সেগুলো ও আলাদা করে সরিয়ে রাখত। সেগুলো বিক্রির জন্য ছিল না। সেখানকার রং যেন চোখে দেখা রং নয়, জীবনের নানান ধরনের অনুভূতির রং। আর তাই সে রং অচেনা।

একদিন ও দেখলাম, একটা ছবি আঁকছে, যেখানে একদল লাল পিঁপড়ে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মাঝে যে বৃত্ত, সেটার দু-দিকে দু-রকম রং। পিঁপড়েগুলো যেন কীরকম অদ্ভুতভাবে অন্যদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে আছে। প্রত্যেকের মুখের প্রকাশ ভিন্ন। ছবিতে দূর থেকে একটা ছোটো জলের ধারা গড়িয়ে আসছে। ছবিটা এত সুন্দর, যে তাকালে আর চোখ ফেরানো যায় না।

জিজ্ঞেস করলাম, এর অর্থ কী?

—এটা হল বিভেদের রং। ওদের মধ্যে এখন আলোচনা হচ্ছে কে কোন দলের, কে কোন রঙের। জলের ধারায় অবশ্য সব রং মুছে যাবে। সব এক হয়ে যাবে।

ও আমাকে আঁকতে আঁকতে বলে উঠল, জানিস, বিখ্যাত শিল্পী পাবলো পিকাসো কী বলেছিলেন? বলেছিলেন, 'যা তুমি ভাবতে পারবে, তা-ই সত্যি।' কথাটার অর্থ আগে বুঝিনি। এখন বুঝতে পারি।

বলে ও একটা অন্য ছবি বার করে দিল—এটা দেখেছিস?

ছবিটা আগে দেখিনি। একটা লোক উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। খালি গায়ে। আর লোকটার পিঠের উপর দিয়ে সারি সারি পিঁপড়ে যাচ্ছে। তার মধ্যে কয়েকটা আবার আকাশের দিকে শুঁড় আর দু-হাত তুলে মুখ উপরের দিকে করে দাঁড়িয়ে আছে। যেন যুদ্ধজয়ের পরে আনন্দে মেতেছে।

—কীরকম লাগল ছবিটা?

—অসাধারণ। কিন্তু লোকটাকে কেমন যেন চেনা-চেনা লাগছে।

ও হেসে বলে উঠল, সবটাই কি আর আমি বলে দেব?

ও ফের বলে উঠল, জানিস, ১৩০০০-এর বেশি পিঁপড়ের প্রজাতি আছে। ওরা আমাদের অনেক আগে থেকে এ পৃথিবীতে আছে। ডাইনোসরদের সময় থেকে। উত্তর মেরু, দক্ষিণ মেরু আর সামান্য কয়েকটা দ্বীপ বাদ দিলে ওরা পৃথিবীর বাকি সব প্রান্তে আছে। আমাদের থেকে বহু হাজারগুণ বেশি সংখ্যায় আছে। আর মানুষ যেখানে পৌঁছেছে, সঙ্গে সঙ্গে ওরাও সেখানে পৌঁছে গেছে। এই ধর আর্জেন্টাইন পিঁপড়ে। ওরা আগে থাকত আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলে। এখন সেখান থেকে ওরা পৃথিবীর অন্য প্রান্তে—জাপানে, অস্ট্রেলিয়াতেও পৌঁছে গেছে। আর শুধু পৌঁছেছে যে তা-ই না! লক্ষ লক্ষ বসতিও তৈরি করে ফেলেছে। আর সেই এক-একটা বাসায় হাজারে হাজারে এরা থাকে।

আমার অবাক-হওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে ও বলে উঠল, তুই কখনো পাঁচ কোটি মানুষকে একসঙ্গে একই উদ্দেশে চালিত করতে পারবি? পাঁচ হাজার মানুষকেও এক পথে চালিত করতে গিয়ে বড়ো বড়ো নেতা হিমশিম খায়। এরা কিন্তু তা সহজেই পারে। চাইলে পাঁচ কোটি পিঁপড়ে যত শক্ত কাজই হোক-না কেন, একসঙ্গে করে ফেলতে পারে।

—কিন্তু ওরা তো এইটুকু এইটুকু?— আমি হেসে বলে উঠলাম।

—তাহলেই ভাব ওদের সুবিধে কত বেশি! যেখানে চায়, চলে যেতে পারে। লুকিয়ে থাকতে পারে। সরু সরু ফাটলের মধ্যে দিয়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলে যেতে পারে। এই যে স্টেশনে বসে আছি, এখানেই একত্রিশ ধরনের পিঁপড়ে আছে। আর সংখ্যায় আছে প্রায় পঁচিশ লাখের মতো। ভেবে দেখ, কী হবে যদি এরা আমাদেরকে একসঙ্গে অ্যাটাক করে!

একটু থেমে বলে উঠল, সব থেকে বড়ো কথা কী জানিস। রজার বেকন যেটা লক্ষ করেছিলেন, সেটা ঠিক। আগে পিঁপড়ের এক প্রজাতির সঙ্গে আরেক প্রজাতির সম্পর্ক ভালো ছিল না। আর তাই ওরা নিজেদের মধ্যে সমানে মারপিট করত। কিন্তু তারপরে ওদের মধ্যে আসে উন্নত ভাষা। যে ভাষা খানিকটা তৈরি হয় রজার বেকনের হাতেই। ভয়নিচের ভাষা। আমরা সে ভাষা শিখে নিতে পারিনি। কিন্তু ওরা খুব দ্রুত শিখে নেয়। আর তারপর থেকেই ওদের আসল বিপ্লব শুরু হয়। আজকে আফ্রিকায় কী হচ্ছে, সে খবর ভারতে থাকা পিঁপড়েদের কাছে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যায়। ওদের দলে কিন্তু মৌমাছি, ভিমরুল এরাও পড়ে। এদেরও একই ভাষা।

—তা তোকে এত কিছু বলছে কে?

—আমিও তো ওদের ভাষা জানি। আর তাই ওদের সঙ্গে আমার সারাক্ষণ কথা চলে।

কী বলব, বুঝলাম না। অবাক হয়ে দেখলাম—ছবির লোকটার পিঠের উপরে দুটো পিঁপড়ে দাঁড়িয়ে ঠিক একইভাবে শুঁড় আর হাত নাড়ছে। যেন আমাদেরই দেখিয়ে।

—আচ্ছা, লোকটা কে বল তো? ঘাড় ঘুরিয়ে শুয়ে থাকলেও পাশ থেকে যেন খুব চেনা লাগছে। লম্বা জুলপি, ছোটো করে ছাঁটা চুল, ঝোলা গোঁফ। চোখের নীচটা বসা।

—তোর তা দিয়ে কী হবে? ছবিতে একজন কাউকে আঁকলেই হল।—বলে ও হেসে উঠল।

আমি শুধু দেখলাম, শুধু দুটো নয়, আরও লাইন করে বেশ কয়েকটা পিঁপড়ে ওই ছবিটার দিকেই এগিয়ে আসছে।

ও আমাকে বলল, চল, আমি আজকে তোকে খাওয়াব। আজকে ভালোই রোজগার হয়েছে। —বলে আমাকে পাশের একটা দোকানে নিয়ে গেল। আমরা সেখানে মুড়ি আর চপ খেলাম।

রাত হয়ে এসেছিল। তাই তারপর আজ আর ওর সঙ্গে ওর বাড়ি না গিয়ে আমার বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম।

৮

পরের দিন স্কুল ছিল না। বাবার দোকানে বসে ছিলাম। হঠাৎ বেলা এগারোটা নাগাদ রাস্তায় হইচই শুনে বাইরে এসে শুনি, কানাই মারা গেছে।

কৌতূহলবশত কানাই-এর বাড়ির কাছে গিয়ে দেখি সেখানে বেজায় ভিড়। ওর দলের প্রচুর লোক বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আর তারা সবাই খুব উত্তেজিত। কানাইয়ের মতো খারাপ লোকেরই শাগরেদের সংখ্যা বেশি হয়। ভালো লোকের এরকম শাগরেদের দরকার হয় না। কানাই কী করে মারা গেছে,সেটাই রহস্য। ভোরবেলা উঠতে দেরি হচ্ছে দেখে ডাকতে গিয়ে ওর কাজের লোক দেখে, মাটির উপরে পড়ে আছে। সাড়া নেই। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার ডাকা হয়। কিন্তু তখনই প্রাণ ছিল না। শুধু নাকি সারা গায়ে লাল লাল দাগ। যেন পোকার কামড়।

আমি ওখানে বেশিক্ষণ দাঁড়াইনি। কালকের ছবির ওই লোকটাকে কেন চেনা লেগেছিল, বুঝেছিলাম। ওটা ছিল কানাইয়েরই ছবি। নেহাত কানাইকে বেশি দেখিনি, তাই তখন খেয়াল হয়নি।

ভ্যানে করে স্টেশনে যখন পৌঁছালাম, তখন দেড়টা বাজে।

দেখি, রাজু ওই আগুন-লাগা রোদেও প্ল্যাটফর্মে বসে একমনে ছবি এঁকে যাচ্ছে। কয়েকটা লোক ওকে ঘিরে ওর আঁকা ছবি দেখছে। তাদের মধ্যে তিনটে ছোটো বাচ্চাও আছে। সবে কোনো ট্রেন এসেছে মনে হয়।

আমি খানিকক্ষণ অপেক্ষা করলাম।

তারপর একা হলে জিজ্ঞেস করলাম, কালকের ওই ছবিটা কোথায়?

ও মুচকি হেসে বলে উঠল, নেই। তা তুই কানাইয়ের ওখান থেকে দেখে এলি নাকি?

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে ও বলে উঠল, কীরকম দেখলি? আমি নিজেও জানি না কীভাবে ওরা আক্রমণ করে। শুধু জানি, ওরা দায়িত্ব নিলে ব্যর্থ হয় না। যাক, একটা খারাপ লোকের সংখ্যা কমল। আমার ওর উপর কোনো ব্যক্তিগত রাগ ছিল না। কিন্তু ওরা আমাদের দেশের অনেক বড়ো ক্ষতি করতে প্রস্তুতি নিচ্ছিল। আর সময় ছিল না।

একটু থেমে ও জামার পকেট থেকে একটা সরু কাগজ বার করে বলে উঠল, এই কাগজটা রাখ। তোকে তো শিখিয়েছিলাম, কীভাবে আমার লেখা সংকেত বুঝতে হয়। ঠিক একইভাবে এটা পড়বি। বুঝতে পারবি, কোথায় রাখা আছে পাল বংশের গুপ্তধন। আগে অবশ্য আরও অনেক শক্ত জায়গায় ওটা লুকোনো ছিল। আমি নিজে ওটা উদ্ধার করে সরিয়ে রাখি। কীভাবে বুঝেছিলাম, জানিস?

—কীভাবে? ওই আমাকে দেওয়া কাগজটার মতো?

—না না, এখানে সংকেতের ভাষা অন্যরকম ছিল। বেকেট যেভাবে সাংকেতিক হাইরোগ্লিফস ব্যবহার করতেন—অনেকটা সেরকম স্টাইলেই। বেকেট কে জানিস?

—না, মিশরের কেউ?

—হ্যাঁ, মিশরের। বলতে পারিস পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম ক্রিপ্টোগ্রাফার হলেন বেকেট। উনি মিশরের বিশাল ধনী দ্বিতীয় খুমহোতেপের রাজকোষ রক্ষার ও সমাধি তৈরির দায়িত্বে ছিলেন। উনিই প্রথম প্রচলিত হাইরোগ্লিফসের বদলে সাংকেতিক হাইরোগ্লিফস ব্যবহার করেন। যাতে সবাই না বোঝে তাই দু-ধরনের টেকনিক ব্যবহার করেন। এক, সাংকেতিক ছবির ব্যবহার। যেমন ধর নৌকোর ছবি—যাকে মিশরীয় ভাষায় বলা হত 'খেনতে'। উনি ছবিতে যখন নৌকো ব্যবহার করেন, তার অর্থ কিন্তু অন্য। কে অধিকর্তা বা কে মূল বিষয়ের দায়িত্বে আছে তা বোঝাতে উনি নৌকোর ছবি ব্যবহার করেন। এ ছাড়া আরেকটা টেকনিক ব্যবহার করেন, যাকে বলে অ্যাক্রোফনি। কোনো পশুর ছবি ব্যবহার করে উনি আসলে সেই পশুর নামের প্রথম অক্ষর নির্দেশ করেন। ধরা যাক ষাঁড়—যার মিশরীয় নাম ছিল 'অ্যালেফ'। উনি 'অ্যা' বোঝাতে তা ব্যবহার করেন। বুঝলি? অজগরের ছবি এঁকে 'অ' বোঝানোর মতো।

—তা সে না হয় বুঝলাম। কিন্তু তুই কী করে গুপ্তধন বার করলি?

—রাজা রামপালও একইভাবে সাংকেতিক ছবি এঁকে আর সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করে মোহর ভরতি ঘড়া মন্দিরের নীচে লুকিয়ে রেখেছিলেন। আমি ওই দুষ্টু লোকগুলোকে কিছুই বলিনি। ওই কাগজে কী লেখা ছিল, কোথায় গুপ্তধন ছিল তা উদ্ধার করতে আমার কোনোই

কষ্ট হয়নি। শুধু ওদেরকে বলে দিইনি। কারণ ওরা তো আর সেটা দিয়ে ভালো কোনো কাজ করত না। এখন যেখানে সরিয়ে রেখেছি, সেখান থেকে তোর পেতে কোনো অসুবিধে হবে না। বলতে পারিস, আমার সঙ্গে এতদিন থেকে কীরকম কী শিখলি তা পরীক্ষা করার জন্যই সরিয়ে রেখেছি। একজনের কাছে তোর কথা বলে একটা চাবি রেখে এসেছি। —বলে ও ফের ছড়ার সুরে বলে উঠল—

কারুর যদি দাঁতটি নড়ে,
চারটি টাকা মাশুল ধরে,
কারুর যদি গোঁফ গজায়,
একশো আনা ট্যাক্স চায়—
খুঁচিয়ে পিঠে গুঁজিয়ে ঘাড়,
সেলাম ঠোকায় একুশবার। ।
—কার কথা বলছি, বুঝলি তো?

আমি 'সুকুমার রায়' বলতে গিয়ে মাঝপথে বুঝতে পেরে বলে উঠলাম, সৌজন্য স্যার। ঠিক তো?

ও হেসে বলে উঠল, দারুণ! এই তো শিখে গেছিস। দেখ, আমি আর তুই ছাড়া এটা খুব কম লোকই বলতে পারত। তোকে যে কাগজটা দিয়েছিলাম, ওটা থেকে বাকিটা উদ্ধার করতে হবে। ওর কাছ থেকে চাবি নিয়ে সে চাবি দিয়ে কী খুলবি, কোথায় সেটা লুকোনো আছে, সেটাই লেখা আছে এই কাগজে। —বলে ও হাসল।

—কিন্তু এ তো তোর। আমি কী করব ওসব দিয়ে?

—এই তো! আমি টাকা দিয়ে কী করব? আমি তো ওদের ভাষা জানি। আরও নতুন নতুন অনেক ভাষা আমায় শিখতে হবে। আমি জানি, তুই ও টাকার সদব্যবহার করবি। তুইই তো বলতিস যে এখানে ভালো স্কুল হলে, ভালো হাসপাতাল হলে কত ভালো হত, তা-ই না? ভালো হাসপাতাল হলে, ভালো চিকিৎসাব্যবস্থা হলে তোরও তো পা দুটো স্বাভাবিক হত!

ও একটু থেমে থাকল, তারপরে বলে উঠল, তোকে আরেকটা ছবি দেখাই। কয়েকদিন আগেই আঁকা।

বলে অনেকগুলো ছবির তলা থেকে ও ছবিটা বার করে দিল—একটা ছেলে ফুটবল পায়ে ছুটে যাচ্ছে। মুখটা ঠিক আমার মতো। আমি রোজ যে লাল হাফহাতা শার্টটা পরি, ঠিক সেটাই পরে আছে। শুধু পা-টা তার একদম স্বাভাবিক। আমার মতো পোলিও আক্রান্ত সরু সরু দুর্বল পা নয়।

আমার চোখ ভিজে হয়ে উঠেছিল। ছবিটার রং-তুলির দাগ সব আস্তে আস্তে মুছে যাচ্ছিল।

ও বলে উঠল, মনে আছে, কতদিন আমরা দুজন বটতলার মাঠে বসে একসঙ্গে খেলা দেখতাম, তোর চোখের সেই স্বপ্ন আমি দেখিনি বুঝি? বার বার তুই গোল হলে আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠতিস। বল পাশ দিয়ে গেলে উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে ওঠার চেষ্টা করতিস। আর তারপরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে আবার বসে পড়তিস। আমি তোর সেসব না-বলা কথার ভাষা ঠিক বুঝতাম। এবারে তুই যেদিন খেলবি, আমিও সেদিন নামব। প্রথমবার ফুটবল। কী আর এমন শক্ত হবে বল! আর ওদেরকে বলে দেব। আমাদের হয়ে খেলবে। বিপক্ষ দলের সব প্লেয়ারের পা কামড়ে দেবে। বেশ হবে তা-ই না।—ও হেসে উঠল।

আরেকটা ট্রেন এর মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছিল। অনেক লোক ওঠা নামা করছিল। কিন্তু তাদের কারো কথা শুনতে পারছিলাম না।

ফের ওর গলা শুনলাম—যা তুই ভাবতে পারবি, মনে রাখবি, কাল সেটাই সত্যি হতে চলেছে। ঠিক এই ছবির মতো। আমি তো আজও আমার মায়ের রাখা রুমালের নকশা উদ্ধার করতে পারিনি। কিন্তু আজও আশা ছাড়িনি। হয়তো কোনোদিন পারব। আর তখনই ঠিক খুঁজে নিতে পারব আমার মা-কে।

আমি ওর সামনে কাঁদতে চাইছিলাম না। তাই চোখের জল লুকোতে উঠে দাঁড়ালাম। হাতে ভর দিয়ে পা টেনে শরীরটাকে উপরে তুলে আনলাম। আর তখনই আমাকে যেন লক্ষ-কোটির কোনো এক অজানা বাহিনী সমস্বরে বলে উঠল আমার মনের ভাষায়—ছোটো তন্ময়, ছোটো। তুমি পারবে। আমরা তোমার সঙ্গে আছি।

প্রথমবার, হ্যাঁ প্রথমবার মনে হল, আমিও ছুটতে পারি।

'Everything you can imagine is real.' – Pablo Picasso

ভয়নিচের অজানা দেশে

১

১৮ এপ্রিল

দিন ঠিক কত ঘণ্টায় হয়? একটা মাসে ঠিক কতদিন থাকে? উত্তরটা ব্যক্তিবিশেষের উপরে নির্ভর করে আলাদা হওয়া উচিত।

ঠিক যেমন আজকাল আমার মনে হয়, দিন যেন শেষই হয় না।

একটা বালিঘড়ির বালি পড়া যেন মাঝপথে থেমে গেছে। সময়কে একটা খাঁচার পাখির মতো বন্দি করে রাখলে যেরকম হয়, ঠিক তেমনই। সবকিছু থেমে গেছে।

আর তখন প্রত্যেকটা থেমে-থাকা মুহূর্ত আমাকে মনে করিয়ে দেয়, আমি ব্যর্থ, আমি সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

আগে এরকম মনে হত না।

আমি কোনোদিন পড়াশোনায় খুব ভালো ছিলাম না। বলা যায় অতি সাধারণ। সেরকম হলে যা হয়, গ্র্যাজুয়েশন করে চাকরির অপেক্ষায় বসে আছি। প্রতিবছর নানান পরীক্ষা দিই। কিন্তু সাফল্য আর আসে না।

আগে প্রত্যেকবার রেজাল্ট বেরোনোর পরে বাবা খুব আশা করে জিজ্ঞেস করত। এখন দেখি, আমি উত্তর দিতে যতটা লজ্জা পাই, বাবা তার থেকে বেশি লজ্জা পায় এ ব্যাপারে প্রশ্ন করতে।

তবে আমি আশা না হারিয়ে আবার চেষ্টা করি। যেরকম আরও অনেকে করে। বাবার ম্রিয়মাণ মুদির দোকানে বসে আরও ম্রিয়মাণ আশা নিয়ে আবার পরের বছরের জন্য পড়াশোনা শুরু করি।

মনে হয়, এই বার বার ব্যর্থতা এখন যেন আমার অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে। লটারির টিকিট কাটার পরে যেমন না-পাওয়াটাই অভ্যেস হয়ে দাঁড়ায়।

বন্ধু আমার সেভাবে কেউ নেই। ছোটোবেলা থেকেই আমি একা একা থাকতে ভালোবাসতাম। একজনই বন্ধু ছিল। খুব বন্ধু। কিন্তু সে-ও হারিয়ে গেল হঠাৎ করে। রাজু। রাজুর কথা তো তোমাদের আগেই বলেছি।



ছোটোবেলা থেকে আমরা দুজনে একসঙ্গে সব জায়গায় যেতাম। ও ছিল ঠিক আমার মতো। আমার মতো একা। আমার মতো চুপচাপ। স্কুলের পরে আমরা হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে পুকুরধারে গিয়ে বসতাম। কোনোদিন বা যেতাম বটতলার মাঠে ফুটবল খেলা দেখতে।

ওর একটা অদ্ভুত অন্য জগৎ ছিল। সেই জগতে ও হারিয়ে যেত। আমাদের চারদিকে ছড়িয়ে-থাকা গাছগাছালি, পাখপাখালিকে যেভাবে ও দেখতে পেত, আমি কখনো সেভাবে দেখতে পেতাম না। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে আসা রোদ্দুরের নকশা ও অবাক হয়ে দেখত। ওর চোখে গাছের পাতায় বিছিয়ে-রাখা মাকড়সার জালে জলের ফোঁটা মুক্তো হয়ে উঠত। বাতাসে তিরতির করে কাঁপতে-থাকা পাতাগুলো মোৎজার্টের মতো সুরকার হয়ে উঠত। মনে হত ও যেন কোনো ম্যাজিশিয়ানের শো মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছে। ওর সঙ্গে থাকলে ওর চোখেই অন্য অজানা জগৎটাকে দেখতে পেতাম।

ওর বাবা-মা ছিল না। কিছু দূরে একটা অনাথ আশ্রমে থাকত। অন্যদের মুখে শুনেছিলাম, ওর যখন দিন দশেক বয়স—কে যেন ওকে গ্রামের চার্চের বাইরে কাপড়ে মুড়ে রেখে গিয়েছিল। ওখানকার ফাদার মোজেস ওকে কুড়িয়ে এনে অনাথ আশ্রমে দিয়ে দেন।

ওখানে কাছাকাছি স্কুল না-থাকায় আমাদের স্কুলে অনেকটা পথ হেঁটে পড়তে আসত। সব সময় যেন এক অজানা আনন্দে বিভোর হয়ে থাকত। মাঝেমধ্যে কী যেন দেখে নিজের মনে বিড়বিড় করে হেসে বলে উঠত, ভারী মজা। মনে হত, ও যেন পাখিদের মধ্যে কথাও বোঝে। শুনতে পায় চারপাশের প্রকৃতির মধ্যে মিশে-থাকা সেসব শব্দ, যা আমরা কেউ শুনতে পাই না।

ও বলত, আমার একটাই ঈশ্বর। সেটা হল প্রকৃতি, সেজন্য তাকে বোঝা এত শক্ত। কিন্তু জরুরিও। দেখ, যারা ওর কথা আর গান শুনতে চায়, তাদের জন্য উনি যেন সব সুরের আয়োজন চারদিকে করে রেখেছেন। সামনের দুটো গাছ দেখিয়ে বলে উঠত, কে বলতে পারে, ওই যে দুই গাছের মধ্যে দিয়ে যে পথ চলে গেছে, সেটাই হয়তো গিয়ে পৌঁছেছে অন্য কোনো ছায়াপথে।

বলে বিভোর হয়ে আবার শুনত।

এ ছাড়া ওর আরেক অসামান্য ক্ষমতা ছিল। ও যেকোনো সংকেত উদ্ধার করতে পারত। ওর কাছ থেকেই শিখেছিলাম সাংকেতিক বার্তায় নিজেদের মধ্যে কথা বলতে। আমাদের মধ্যের সে কথা আমি আর ও ছাড়া অন্য কেউ বুঝবে না।

ও বলেছিল, ওর আর আমার মধ্যে এই সংকেতের ভাষা হবে শান্তির ভাষা। যদি কোনোদিন খারাপ দিন আসে, ভালো লোকেদের উপর অন্যায়-অত্যাচার হয়, তখন আমাদের এই ভাষার দরকার হবে।

এভাবেই একদিন ও উদ্ধার করতে পারল ভয়নিচের ম্যানাস্ক্রিপ্টের থেকে এক অজানা ভাষা। এটা নাকি ইংল্যান্ডের এক জিনিয়াস রজার বেকন লিখেছিলেন ১২০০ সাল নাগাদ। এত বছর ধরে সেই সাংকেতিক ভাষায় লেখা বই এর অর্থ কেউ উদ্ধার করতে পারেনি। কিন্তু ও পেরেছিল।

পেরেছিল সেই বইয়ের মধ্যে লুকিয়ে-থাকা ভাষা উদ্ধার করতে। সেই ভাষাই ওকে শেখাল পিঁপড়েদের কথা বুঝতে, ওদের সঙ্গে কথা বলতে। ও-ই বলেছিল যে-এই ভাষায় এক পিঁপড়ে আরেকটার সঙ্গে কথা বলে। এই ভাষা লক্ষ লক্ষ পিঁপড়েকে সংঘবদ্ধ করতে শেখায়। শুধু পিঁপড়ে কেন, মৌমাছি, ভিমরুল এদেরও ভাষা নাকি একই রকম।

কিন্তু এসব করতে গিয়ে ও পড়াশোনা ছেড়ে দিল। অথচ ও ছিল ক্লাসের সেরা ছাত্র। বরাবর ফাস্ট হত। কিন্তু সেসব ছেড়ে হারিয়ে গেল সম্পূর্ণ অন্য এক জগতে। তারপরে একদিন হঠাৎ করে আমাদের গ্রাম ছেড়ে দূরে কোথায় চলে গেল অনেক খুঁজেছি তারপরে, ওর অনাথ আশ্রমে, আশপাশের গ্রামে, কোথাও খুঁজে পাইনি।

ও জীবনের স্বপ্ন দেখিয়েছিল আমাকে। সেজন্য ওর চলে যাওয়ার পরে সে স্বপ্নই আস্তে আস্তে হারিয়ে গেল। বুঝলাম আমার চারদিকের বাস্তব অনেক কঠিন। বিশেষ করে আমার মতো একজন প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য, যার পা দুর্বল, পোলিও আক্রান্ত। যে সাহায্য ছাড়া হাঁটতে পারে না।

তারপর থেকে রাজুর সঙ্গে আর কোনো যোগাযোগ হয়নি। মাঝে দশ বছর কেটে গেছে।

জানি না রাজুর কোনো বিপদ হয়েছে কি না। ও কী করে যে আমাকে ভুলে গেল এটা আমার খুব অবাক লাগে, রাগও হয়।

এই বিপদের সময়ে ও যদি আমার পাশে থাকত, তাহলে আমার এতটা অসহায় লাগত না। এত ভয়ও লাগত না।

২

১৫ মে

এবারে গরম আরও বেশি পড়েছে। তবে আমাদের গ্রামে তার জন্য খুব অসুবিধে হয় না। চারদিকে বড়ো বড়ো গাছ। গাছের ছাওয়ায় গিয়ে বসলেই তখন আর গরম লাগে না। সেরকমই আজ বাসুদার পুকুরের ধারে একটা গাছের তলায় অনেকক্ষণ বসে ছিলাম। ঠিক যেমন আমি আর রাজু বসে থাকতাম। চোখ বন্ধ করে পাতার গানের সুর শুনলাম। কত অজানা-অচেনা শব্দ ধরা পড়ল। কত পাখির ডাক। বেশ খানিকক্ষণ বসার পরে মনটা একটু স্থির হল।

আসলে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিলাম কিছুক্ষণের জন্য। এত কিছুর চাপ নেওয়া খুব শক্ত।

কিছুদিন হল, বাবার ক্যান্সার ধরা পড়েছে। বেশ কিছুদিন ধরে মাঝেমধ্যে জ্বর আসত। দু-সপ্তাহ আগে জানা গেছে ব্লাড ক্যান্সার। লিউকেমিয়া। তবে শুরুর দিক। ভালো চিকিৎসা হলে ঠিক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

কী করব, কিচ্ছু বুঝছি না। কোনো একটা ভালো হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে হবে। কিন্তু আমাদের অত টাকা কোথায়? মা বহু বছর আগে মারা গেছে। যখন আমি স্কুলে পড়তাম।

এসব আমাকেই করতে হবে শহরের হাসপাতালে গিয়ে খোঁজখবর নিয়ে। বাবা অবশ্য যেতে চায় না। জানে চিকিৎসার জন্য অনেক টাকার দরকার। সে টাকা আমাদের নেই।

আমাদের ছোটো মুদির দোকান থেকে খুবই কম আয় হয়। আগে যা হত, এখন আরও কমে গেছে। আসলে এখানে এখন দুটো বড়ো বড়ো স্টোর হয়েছে। তাদের স্টক অনেক বেশি। আমাদের দোকানে অনেক কিছুই থাকে না। তার মধ্যে এক নতুন সমস্যা শুরু হয়েছে। সমস্যা শুরু হয়েছিল গত বেশ কয়েক বছর ধরেই। তবে এখন সেটা ভালো করে বোঝা যাচ্ছে।

আমাদের এই গ্রাম বাংলাদেশের থেকে বেশি দূরে নয়। অনেক নতুন নতুন লোক তাই মাঝেমধ্যেই দেখা যায়, যারা ওপার থেকে আসে। থেকেও যায়। বেশ কয়েক বছর ধরেই বেশ কিছু খারাপ লোক আস্তানা গেড়েছিল এই গ্রামে। রাজনৈতিক মদতে তারা এখন বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।

আমাদের গ্রামে একটা শিশুদের শিক্ষা ও বিকাশকেন্দ্র ছিল। বহু বছরের। হঠাৎ করে সেটা ভেঙে এখন ওখানে একটা মদের দোকান হয়েছে। বাবার মতো কয়েকজন সেটা নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিল এখানকার পঞ্চায়েতে। তারপর থেকে ওরা আমাদের উপরে খেপে গেছে।

বাবা এমনিতে বেশ নিরীহ গোবেচারা মানুষ। কিন্তু একই সঙ্গে সততার প্রতি এমন একটা গভীর টান আছে যে কোনোরকম অন্যায় সহ্য করে না। প্রতিবাদ করতে দ্বিধা করে না। সে প্রতিপক্ষ যতই শক্তিশালী হোক-না কেন!

তবে এদের বিরুদ্ধে আমাদের মতো সাধারণ লোকেদের কিছুই করার থাকে না। উলটে এখন আমাদের এখানে থাকাই মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরপরে ওরা দু'দিন দোকানে এসেও ভয় দেখিয়ে অপমান করে গেছে। আজও এসেছিল কয়েকজন মিলে। আমাদের দোকানে রাখা বিস্কুটের বাক্সটা টেনে নিয়ে বেশ কয়েকটা খেয়ে বাকি বিস্কুটগুলো সামনের রাস্তায় ফেলে দিয়ে হাসতে হাসতে চলে গেল।

বাবা দেখি, চুপ করে বসে আছে। চলে যাওয়ার পরেও বেশ কিছুক্ষণ কথা বলল না। তারপরে বলে উঠল, এখন আর সৎ লোকদের বাঁচার কোনো উপায় নেই। আমরা মনে হয় না এই গ্রামে বেশিদিন থাকতে পারব।

৩

২২ মে

সামনে এখন অনেক জল। আমার দিকে আরও এগিয়ে আসছে। একটু একটু করে কোমরের উপরে উঠছে। জোয়ার আসছে। আমি সাঁতার ভালো জানি না বলে আমার যে ভয়টা

চিরকাল ছিল, সেটা এখন আর নেই।

যখন কেউ সবকিছু হারিয়ে ফেলে, তখন তার নতুন করে হারানোর কোনো ভয় থাকে না। আমার এখন ঠিক সেরকম অবস্থা।

এর জন্য আমি কাউকে দায়ী করি না। এর জন্য আমিই দায়ী। এর জন্যে দায়ী আমার দুর্বল পা, স্বাভাবিক বুদ্ধি—কমন সেন্সের অভাব।

বাবার শরীর গত কয়েকদিনে আরও খারাপের দিকে যাচ্ছিল। সেটা নিয়েই গত পরশু পাশের শহরের হাসপাতালে এসেছিলাম বাবার সব টেস্ট রিপোর্ট আর ডাক্তারের চিঠি নিয়ে। কিন্তু ওরা ভরতি নিল না। কারণ ওরা জানে, আমরা চিকিৎসার টাকা দিতে পারব না।

কিন্তু চিকিৎসা কিছু একটা করতেই হবে। বাড়িতে, ব্যাঙ্কে সব মিলিয়ে পঞ্চাশ হাজার টাকা জোগাড় হল। সেটা নিয়েই আজ এসেছিলাম। কিন্তু ওরা দু-লক্ষ টাকার কম ডিপোজিট নিয়ে ভরতি করবে না। অনেক অনুরোধেও রাজি হল না।

বেরিয়ে আসব, গেটের কাছে দেখি, হাসপাতালের পোশাকে দুজন কর্মচারী দাঁড়িয়ে আছে। আমার কাঁদো কাঁদো মুখের দিকে তাকিয়ে ওরা হয়তো আমার অসহায় অবস্থা বুঝতে পেরেছে।

আমার সব কথা ওরা ধৈর্য ধরে শুনল। তারপরে একজন বেশ উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, কেন হবে না! এত বড়ো অন্যায়। সবার ঠিক চিকিৎসার অধিকার আছে। ভরতি করতেই হবে।

ঠিক এটাই আমি বলতে চাইছিলাম।

বলল, হাসপাতালের প্রধানের সঙ্গে কথা বলবে, যাতে আমার বাবাকে ভরতি করা যায়। বলে আমার থেকে পুরো টাকাটা চেয়ে নিয়ে নিল। তারপরে ওখানেই অপেক্ষা করতে বলে ওরা দুজনে হাসপাতালের ভেতরে ঢুকল।

কিন্তু সেই যে ঢুকল, দুজনেই দেখি, আর ফেরে না। প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করার পরে আবার রিসেপশনে গিয়ে কথা বললাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝলাম পুরোটাই লোক-ঠকানো। এরকম ঘটনা আগেও হয়েছে। কিন্তু তাহলে কী করে এরা হাসপাতালের মধ্যেই হাসপাতালের কর্মচারীদের পোশাকে ঘুরছিল, বুঝলাম না। চেহারা-মুখের বর্ণনা দেওয়ার পরেও ওরা কেউ চিনতে পারল না। অথচ ওরা তো এখানেই ছিল। বুঝলাম, কিছুই করা যাবে না।

আমার শরীর খুব খারাপ লাগছিল। তাহলে কি আমার বোকামিতে বাবাকে ভরতি করার যে সামান্য সম্ভাবনা ছিল, তাও আর সম্ভব হবে না? তা ছাড়া দোকান চালানোর জন্য এরপরে

ধার করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। আর আমি বা আমার বাবা—আমরা কেউ কোনোদিন লোকের কাছে ধার চাওয়ার কথা ভাবতেও পারি না। এখন ঠিক করে নিয়েছি, কী করতে হবে। আমি আর বাড়ি ফিরতে পারব না। সে জন্যে এখানে এসেছি। পাশের নদীতে।

জল বাড়ছে। আমার দিকে এগিয়ে আসছে একটা বড়ো জলস্রোত, বড় ঢেউ এগিয়ে আসছে আমার দিকে। হঠাৎ কিছু বোঝার আগেই মনে হল, পায়ের তলার মাটি যেন হারিয়ে গেছে। দূর থেকে কিছু লোকের চিৎকার কানে এলে। আমি বুঝলাম, আমি জলের তলায় একটু একটু করে হারিয়ে যাচ্ছি। হাত-পা ছুড়ে ভেসে থাকার খানিকক্ষণ চেষ্টা করলাম। কিন্তু জলের স্রোত আমাকে তখন আরও গভীর জলের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আরও দূরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

এখন বুঝছি, এটা আমি চাইনি। বাবা কী করবে আমার মৃত্যুর খবর পেলে? মুহূর্তের ভুলে এরকম ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেছিলাম। প্রাণপণ চেষ্টা করলাম হাত-পা ছুড়ে ঘাটের দিকে ফেরার। কিন্তু যেন আরও দূরে সরে যাচ্ছি ঘাটের থেকে। একই সঙ্গে আমার পুরো শরীর এখন জলের তলায়। মাথা ডুবে যাওয়ায় নাকে-মুখে জল ঢুকছে। একটু একটু করে যেন জ্ঞান হারাচ্ছি আমি। সবকিছু অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে আমার চেতনা, আমার চেনাজানা পৃথিবী। মুছে যাচ্ছে জীবন আর মৃত্যুর মাঝের রেখাগুলো।

মনে হল আমি যেন মারা যাচ্ছি। এ এক অদ্ভুত অনুভূতি। যেন আমার মতো সুখী মানুষ আর কেউ নেই। কোনো চিন্তা নেই, কোনো ভাবনা নেই। কী অপূর্ব এক অপার্থিব শান্তি। মনে হল, একটা অন্ধকার টানেল দিয়ে কোথায় যেন ভেসে যাচ্ছি। তারপরে হঠাৎ মুখের উপরে পড়ল উজ্জ্বল এক আলো। এত উষ্ণতা মাখা সে উজ্বল আলো যে মনে হল, এ আলোয় আমি চিরকাল থাকতে পারি।

৪

তারিখ জানি না

এটা কোথায়? আমি একটা সমুদ্রের ধারে বসে আছি। পায়ের কাছে হালকা সামান্য উষ্ণ জলের ঢেউ এসে মিশছে। চারদিকে মিহি সাদা বালি। আমি কোনোদিন সমুদ্র দেখিনি। একেই কি সমুদ্রতট বলে?

এরকম দেখেছি শুধু সিনেমায়। অনেক ভিডিয়োতে। অভাবের সংসারে কখনো কোনোদিন যাওয়া হয়নি।

মনে আছে, একবার বাবা পুরী যাওয়ার কথা বলেছিল। কিন্তু শেষে কী কারণে যেন যাওয়া হয়ে ওঠেনি। মন খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

এখানে আমি এলাম কী করে?

জলে ভেসে কি আমি নদীর অন্য ধারে গিয়ে উঠেছি? কিন্তু সামনে এটা তো নদী নয়। তাহলে অন্যদিক দেখা যেত। সামনে যদ্দূর দেখা যাচ্ছে শুধু জল আর জল। এত সমুদ্র!

চেনা কোনো জায়গার সঙ্গে এর মিল খুঁজে পেলাম না।

মাথার উপরের আকাশ ঘন নীল। শুধু ছেঁড়া কিছু সাদা মেঘ ভাসছে।

উঠে দাঁড়ালাম। পা যেন মিহি বালির মধ্যে ডুবে আছে। কী আরাম! আমাদের গ্রামের মতো এখানে গরম নেই। মিষ্টি হাওয়া বইছে।

এটা কি কোনো দ্বীপ? সমুদ্রতট দিয়ে কিছুটা হাঁটার পর দ্বীপের ভিতরদিকে হাঁটতে শুরু করলাম। কিছুটা হাঁটার পর দেখতে পেলাম সমুদ্রের ধার দিয়ে পর পর কিছু বাড়ি। সব এক ধরনের। কিন্তু বাড়ির রংগুলো আলাদা আলাদা, লাল, নীল, হলুদ, সবুজ— কত রঙের। কী সুন্দর সুন্দর দোতলা বাড়ি। আমাদের গ্রামের পল্টুদার বাগানবাড়ি যেরকম, সেরকম!

প্রত্যেকটা বাড়ি ঘিরে পাইনের বন। তা ছাড়া বট, অশ্বত্থ, নারকেল, খেজুর গাছও আছে। কিন্তু আশপাশে কোনো লোক দেখতে পেলাম না।

একটা বাড়ির দরজা দেখি খোলা। কেউ আছে কি বাড়িতে! জিজ্ঞেস করতে এগিয়ে গেলাম। অবাক হলাম। বাড়ির দরজা হাটখোলা। কিন্তু ভেতরে কোনো লোক নেই।

ঢুকেই সামনে একটা বড়ো ঘর পড়ল।

দেখি একটা টেবিলের উপরে নানান খাবার সাজানো। তার মধ্যে অনেকগুলোই আমার বেশ পছন্দের খাবার। লুচি, মাংস, কাটলেট।

খুব খিদে পেয়েছিল। সারাদিন শহরে ঘুরেছি। কিছু খাওয়া হয়নি। সকালে শুধু মুড়ি খেয়ে বেরিয়েছিলাম।

তা ছাড়া এরকম চমৎকার চিংড়ির কাটলেট আগে কোনোদিন খাইনি। এমন লুচি আর কষা মাংসও খাইনি। কিছুক্ষণ আগেই যেন করা হয়েছে। গরম লুচি। ক-টা লুচি খেলাম কে জানে! শেষ লুচিটা খাচ্ছি, চোখে একটা সাদা কাগজ পড়ল। দূরে টেবিলের উপরে রাখা আছে। হাতে নিয়ে উলটে দেখি তাতে একটা কবিতার কয়েকটা লাইন। সেটা পড়ার পরেই কী হল জানি না, ছুটে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম।

তাতে লেখা ছিল।

রোজ দেখি খেয়ে গেছে, জানিনেকো কারা সে—
কালকে যা হয়ে গেল ডাকাতির বাড়া সে!
পাঁচখানা কাটলেট লুচি তিন গন্ডা,
গোটা দুই জিবেগজা, গুটি দুই মন্ডা,

আরও কত ছিল পাতে আলুভাজা ঘুগনি—
ঘুম থেকে উঠে দেখি পাতখানা শূন্যি!
তাই আজ খেপে গেছি—আর কত পারব?
এতদিন সয়ে সয়ে এইবারে মারব।
খাড়া আছি সারাদিন হুঁশিয়ার পাহারা,
দেখে নেব রোজ রোজ খেয়ে যায় কাহারা।

পালিয়ে আসার আগে খেয়াল হল, আরে এত সুকুমার রায়ের সেই 'চোর ধরা' কবিতা। মনে পড়তেই ছুটতে ছুটতে বেশ হাসি পেল। এখানে আবার কে লিখল সেই কবিতা! কোন পাগল লোক থাকে ওই বাড়িতে! আমি আবার ঠিক তারই খাবার খেয়ে ফেলেছি। পরে দেখে কী করবে কে জানে! নিজের মনে খানিক হেসে নিলাম।

এই কবিতাটা আমার খুব প্রিয় ছিল। পুরো কবিতাটা এখনও মুখস্থ আছে সুকুমার রায়ের অন্য অনেক কবিতার মতোই।

পিছনে তাকিয়ে দেখলাম, কেউ পিছু নিয়েছে কি না! না, কেউ আসছে না।

আমি কোথায় এসে পড়েছি, কিছুই বুঝতে পারছি না। কিন্তু সবই যেন আমার পছন্দের। যেন আমার স্বপ্নরাজ্যে এসেছি। কী সুন্দর ফাঁকা ফাঁকা রাস্তা। দু-ধার দিয়ে নানান রঙের গাছ। তাতে আবার সব বিভিন্ন ধরনের ফুল।

বেশ কিছু হাঁস, হাঁসের বাচ্চা ঘুরে বেড়াচ্ছে। কত পাখি এখানে! কোকিল, দোয়েল, তিতির, কাঠঠোকরা, বসন্তবৌরি, টিয়া। দূরে গাছে একটা বিশাল রাজধনেশ পাখি বসে আছে। কিছু দূরে একটা ময়ূর ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এত সুন্দরও কোনো জায়গা হয়?

কিন্তু কোনো লোক নেই কেন! হঠাৎ খেয়াল হল, দূরে একটা বেঞ্চিতে একটা লোক কালো পাঞ্জাবি পরে বসে আছে। লোকটা হাতে একটা খাতা আর পেন নিয়ে বসে কী যেন ভাবছে। কবি বা লেখক হবে হয়তো।

লোকটার সামনে গিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, এই জায়গাটার নাম কী? এটা বারাসাত থেকে কতদূরে? এখান থেকে বারাসাতের বাস পাওয়া যাবে?

কিন্তু লোকটা মুখ তুলে তাকাতেই ভয়ে আর প্রশ্নটা দ্বিতীয়বার করলাম না—

লোকটার চোখে-মুখে বিরক্তি।

কী আশ্চর্য, এরকমও মিল হতে পারে! অবিকল সুকুমার রায়ের সেই 'গোঁফ চুরি' কবিতার বড়োবাবুর মতো দেখতে। মাথাভরা টাক। শুধু দু-কানের পাশে কিছু চুল। কপালে বেশ

কয়েকটা ভাঁজ পড়েছে আমাকে দেখে। খ্যাংড়া কাঠির মতো বিশাল গোঁফ। আমার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়েছে।

হেড আফিসের বড়োবাবু লোকটি বড়োই শান্ত,

তার যে এমন মাথার ব্যামো কেউ কখনো জানত?

আমার মনে এই দুটো লাইন যেন সঙ্গে সঙ্গে চলে এল। আর জিজ্ঞেস না করে, সরে এলাম। লোকটা কীসব বিড়বিড় করে বলে আবার কী সব লিখতে শুরু করল।

আর তখনই চোখে পড়ল কিছু দূরের হালকা হলুদ রঙের বাড়িটা। তার দরজায় দেখলাম বড়ো বড়ো করে লেখা আমার আরেক প্রিয় কবিতার কয়েকটা লাইন, যা দেখলেই আমার সবার আগে আমার বন্ধু রাজুর কথা মনে পরে।

একটা অঙ্কের উত্তরে ঠিক এই কবিতাটা লেখার জন্য স্কুলে রাজু অঙ্কের শিক্ষক সৌজন্যবাবুর কাছে খুব বকুনি খেয়েছিল। ওর ধাঁধার মাধ্যমে হেঁয়ালি করে সবকিছু বলার বা উত্তর দেওয়ার একটা প্রবণতা ছিল। একটা অঙ্কের উত্তর ২১ আসায় ও তার বদলে লিখেছিল এই কবিতা।

যেসব লোকে পদ্য লেখে,
তাদের ধরে খাঁচায় রেখে,
কানের কাছে নানান সুরে
নামতা শোনায় একশো উড়ে,
সামনে রেখে মুদির খাতা—
হিসেব কষায় একুশ পাতা।

একুশে আইন— কবিতার কয়েকটা লাইন লিখে বোঝাতে চেয়েছিল যে সে অঙ্কের উত্তর 'একুশ'। প্রথমে না বুঝে সৌজন্যবাবু খুব রেগে গিয়েছিলেন রাজুর উপরে।

কিন্তু কোনো জায়গায় বাড়ির দেওয়ালে এরকম কবিতা লেখা থাকতে আমি কখনো দেখিনি।

তা ছাড়া এখানে সবকিছুর সঙ্গে সুকুমার রায়ের ছড়ার এরকম যোগাযোগ কেন? রাজু থাকলে দেখে খুব মজা পেত। আপনমনে 'রাজু' বলে উঠলাম।

দেখি, ইতিমধ্যে দরজা দিয়ে কে একজন বেরিয়ে আসছে। একটু ভয়ই পেয়েছিলাম। কিন্তু তারপরেই সেই অতি পরিচিত হাঁটা, মাথা ভরতি ঝাঁকড়া চুল, আর মুখের হাসিটা দেখে কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলাম না।

তারপরে চেঁচিয়ে বলে উঠলাম, রাজু!

রাজু আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে। একটু যেন মোটা হয়েছে।

৫

—রাজু! তুই এখানে? ছুটে গেলাম ওর দিকে।

ওর মুখে সেই চেনা হাসি। ওর সেই সারল্য।

—আমি তো এখানেই থাকি। তুই এসেছিস শুনে ছুটে এলাম।

—মানে? তুই এখানে থাকিস? এই জায়গার নাম কী? এরকম কোনো জায়গা আছে, সেটাই জানতাম না? কী সুন্দর। সবকিছু যেন আমার ইচ্ছের মতো। এটা বারাসাত থেকে কতদূর? আমিই বা কী করে এলাম?

—আরে দাঁড়া। ওয়েট কর। এতগুলো প্রশ্ন। তুই আগে চুপ করে বোস। চল, ওই বেঞ্চিতে গিয়ে বসি। গল্প করা যাক। কতদিন তোর সঙ্গে গল্প হয়নি।

বলে আমাকে নিয়ে বাড়ির সামনে একটা ভারী সুন্দর কাঠের বেঞ্চিতে গিয়ে বসল। এখান থেকে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে।

মাথার উপর দিয়ে দুটো কাক ক্যা ক্যা করে উড়ে গেল। তাদের যেতে দেখে ও হেসে বলে উঠল, এই দুটো সারাক্ষণ ঝগড়া করে যায়।

বুঝলাম, ও কিছুই পালটায়নি।

বলে উঠলাম, কতদিন তোকে খুঁজেছি। তুই যে হাবড়া স্টেশনে বসে ছবি আঁকতিস, সেখানেও গেছি কতদিন। কেউই জানে না তুই এখন কোথায়।

—হ্যাঁ, আসলে এই ভাষা শেখাটা অনেকটা নেশার মতো। তোকে তো বলেছিলাম, আমি পিঁপড়েদের ভাষা শিখে নিয়েছিলাম। ওরা সবাই ভালো। ওদের থেকে অনেক কিছু শিখেছিলাম। এখনও আমার সঙ্গে ওদের নিয়মিত কথা হয়। আমি ইচ্ছেমতো ওদের সঙ্গে কথা বলতে পারি।

কিন্তু ওই যে 'ভয়নিচ ম্যানাস্ক্রিপ্ট', সেখানে আরেকটা ভাষার কথাও ছিল। তবে সে ভাষাটা উদ্ধার করতে আরও সময় লাগল। রজার বেকন লোকটা সত্যি জিনিয়াস ছিল।

—সেটা আবার কীসের ভাষা?

—বলছি। একটু বাদে। সেটা উনি যে পুরোটা জানতেন তা নয়। কিন্তু শুরুটা উনি করেছিলেন। পুরোটা বুঝে উঠতে পারেননি। আমি তার পরের অংশটা আবিষ্কার করি। সেটা আবিষ্কার, হ্যাঁ, আবিষ্কারই বলা চলে। সেজন্যেই আমাকে গ্রাম ছাড়তে হয়। এই ভাষাটা আরও অনেক বেশি শক্তিশালী। কী জন্য ব্যবহার করা হয়, সেটা আমি প্রথমে বুঝিনি। কিন্তু ব্যবহার শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম। আর সে ভাষা শিখেছিলাম বলেই তো তোর

সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারলাম। এখন আর ভয় নেই তোর, আমি সঙ্গে আছি। ওরাও সঙ্গে থাকবে।

—ওরা মানে?

—বলছি। তার আগে এই জায়গাটা ভালো করে দেখাই। সবার আগে আমার বাড়িতে চল।

৬

দুপুরে রাজুর বাড়িতে কাটালাম। ওর বাগানটা বেশ বড়ো। নানান ধরনের গাছ। চেনা-অচেনা নানান পাখির কূজনে বাগান যেন মুখর হয়ে আছে। ওর পড়ার ঘরে দেখলাম বইয়ের স্তূপ। তার মধ্যে অনেক বই সংকেতের উপরে। বুঝলাম, এই বিষয়ে আমার বন্ধুর উৎসাহ সামান্যতম কমেনি।

বলে উঠলাম, তোর কি এখনও সব সাংকেতিক বার্তার অর্থ খুঁজে বার করতে ভালো লাগে?

—হ্যাঁ, ওটাই তো আমার নেশা, আমার জীবন। আমাদের চারদিকে অজস্র সংকেত ছড়িয়ে আছে। কিন্তু কিছু সংকেত উদ্ধার করা খুব শক্ত। প্রকৃতি চায় না যে তার সব রহস্য আমরা কোনোদিন জেনে যাই। তা ছাড়া ওদের সঙ্গে আমার সব কথা তো এরকম সাংকেতিক ভাষাতেই হয়।

—কাদের সঙ্গে? আচ্ছা, তুই যে সমানে 'ওরা', 'ওদের' বলে যাচ্ছিস, ওরা কারা?

—আচ্ছা, তোর কী মনে হয়, এই মহাবিশ্বে শুধু আমরাই একমাত্র বুদ্ধিমান প্রাণী? শুধু এই পৃথিবী ছাড়া এই মহাবিশ্বে অন্য কোথাও প্রাণ নেই?

—হ্যাঁ, সেরকম কোনো বুদ্ধিমান প্রাণীর প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তা-ই না?

—আচ্ছা, তোর কী ধারণা, সত্যিকারের বুদ্ধিমান কোনো অ্যালিয়েন কোনোদিন সরাসরি মানুষের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করবে? সেটা না-করাই তো ওদের বুদ্ধিমত্তার সব থেকে বড়ো প্রমাণ।

যদি বলি, এই বিশ্বের সব খেতে শুধু একরকম ফসল হয়, শুধু একরকম ফুল হয়, তুই সেটা বিশ্বাস করবি! নিশ্চয়ই করবি না! মহাবিশ্বের মধ্যে এই পৃথিবীতে আমরাই একমাত্র বুদ্ধিমান জীব, এটা ভাবাও ঠিক সেরকমই।

অ্যালিয়েন আছে। আমি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতেও পেরেছি। যদি এবার বলি, এই অ্যালিয়েনরা এমন একটা উন্নততম সাংকেতিক ভাষা তৈরি করেছে, যা শুধু অত্যন্ত বুদ্ধিমান হলেই বোঝা সম্ভব, সেটা জানলেই তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব, তাহলে?

এই ভাষা জানলে শুধু ওদের সঙ্গে যোগাযোগ নয়, আরও অনেক কিছু করা যায়, যেমন তোর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারলাম।

—কী বলছিস? আর সে ভাষা তুই জেনে গেছিস? ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছিস?

—হ্যাঁ, এখন জেনে গেছি। সে বিষয়ে পরে আরও বলব। তবে তার আগে তোকে আরেকটু দেখাই এই জায়গাটা। তুই বাড়ির কথা বল। গ্রামের কথা বল।

এবারে আমাদের মধ্যে অন্য অনেক কথা হল। অনেক গল্প। অনেক দিনের জমে-থাকা গল্প। গ্রামে এখন কী হয়েছে, কীভাবে কিছু খারাপ লোক আমাদের গ্রামের সবার জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে, সেসব নানান কথা। একই সঙ্গে অনেকদিন পরে আবার আমরা বাগানে বসে একসঙ্গে পাখির ডাক, গাছ-ফুল-পাতার গল্পও শুনলাম।

—আমার এই জগৎটা খুব ভালো লাগে। কারণ কী জানিস?

—সে তো লাগবেই, এমন সুন্দর পরিবেশ, এমন সুন্দর সমুদ্র, বাড়ি, সবকিছুই খুব সুন্দর এখানে।

ও হেসে বলে উঠল, আরে না, না, সেজন্য নয়। এ জগতে চারদিকে ছড়িয়ে আছে ধাঁধা, সংকেত। ঠিক যেজন্য তুই ওই কবিতা দেখে আমার কথা ভাবতে পারলি, আমকে খুঁজে বার করতে পারলি, এখানে ঠিকভাবে ডিকোড করতে পারলে সবকিছু খুঁজে পাওয়া যায়।

—সেরকম আবার হয় নাকি!

ও হেসে বলে উঠল, হ্যা, এখানে তো হয়। আচ্ছা, চারদিকে কত সংকেত ছড়িয়ে থাকে, তা জানিস? আমাদের বিশ্বেই ধর। আমরা খবর রাখি না বলে জানি না।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফলও নির্ধারণ করেছিল সংকেত উদ্ধারের ক্ষমতা, সেটা নিশ্চয়ই জানিস। তুই জোহানেস ট্রিথেমিয়াসের নাম শুনেছিস?

ঘাড় নাড়িয়ে না বলতে ও বলে উঠল, ট্রিথেমিয়াস ছিল খুব প্রতিভাবান একজন ম্যাথামেটিশিয়ান, যিনি ক্রিপ্টোগ্রাফির উপরে প্রথম বই লেখেন। নাম ছিল 'স্টেগ্যানোগ্রাফিয়া'। ভ্যাটিকান অর্থাৎ চার্চ থেকে নিষিদ্ধ বইয়ের তালিকায় ওই বইটাকে ঘোষণা করলেও বইটা খুব জনপ্রিয় হয় ওঠে। কোনো সাংকেতিক বার্তা কীভাবে গোপনভাবে পাঠানো যায়, সে বিষয়ে নানান পদ্ধতি বলা হয়েছিল বইটাতে।

ভয়নিচের ম্যানাস্ক্রিপ্টের বাইরে এরকম অনেক সংকেত রহস্য আমাদের চারদিকে লুকিয়ে আছে আর নানান কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে, যাতে গোপনে কিছু খবর পাঠানো যায়। সে বার্তা অন্যরা পেলেও কিছু বুঝতে পারবে না।

—কিন্তু তুই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কথা কী বলছিলি?

—হ্যাঁ, বলছি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে একদিকে তখন ইংল্যান্ড আর ফ্রান্স, অন্যদিকে জার্মানি। দু-দিকেই প্রচুর হতাহত। দীর্ঘ যুদ্ধ চলছে, তো চলছেই। এত সেনা মারা যাচ্ছে যে যার দিকে কমবয়সি সেনা বেশি পড়ে থাকবে, সে-ই জিতবে। আমেরিকা যদি কোনো একটা দিকে যোগ দেয়, তাহলে একটা নির্ণায়ক ফলাফল হবে। কিন্তু আমেরিকা দু-দিক থেকেই সমদূরত্ব রেখে নিউট্রাল থাকতে চাইছিল। ইউরোপে যুদ্ধ যত বেশিদিন চলে, তাতে আমেরিকার লাভও তত বেশি। দু-তরফেই অস্ত্রের সাপ্লাই আসে ওদের থেকে। তাতে ওদের ব্যাবসা আরও ফুলেফেঁপে উঠছিল।

ঠিক সেই সময় একটা সাংকেতিক বার্তা উদ্ধার হল, আর তার জন্য পালটে গেল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভবিষ্যৎ। ওই সাংকেতিক বার্তার আড়ালে লুকোনো তথ্য জানার পরেই আমেরিকা আর নিরপেক্ষ না থেকে ফ্রান্স আর ইংল্যান্ডের দিকে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

—কী ছিল সেই সংকেতে?

—জার্মানি একটা এনক্রিপ্টেড মেসেজ পাঠিয়েছিল মেক্সিকোর কাছে যে মেক্সিকো সাহায্য করলে জার্মানি মেক্সিকোর সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমেরিকা আক্রমণ করবে। প্রতিদানে টেক্সাস, নিউ মেক্সিকো, অ্যারিজোনা, আরও কিছু জায়গা মেক্সিকোকে আমেরিকার থেকে উদ্ধার করে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল জার্মানি।

এসব সাংকেতিক মেসেজ পাঠানো হত জার্মানির এক বিশেষ কোডবুকের সাহায্য নিয়ে, যার নাম ছিল '০০৭৫'। কিন্তু জার্মানি থেকে মেক্সিকো টেলিগ্রাফের মাধ্যমে পাঠানো সেই মেসেজ দুই ক্রিপ্টোগ্রাফার উইলিয়াম মন্টগোমারি ও নাইজেল ডি গ্রে উদ্ধার করে ফেলেন। সে খবর আমেরিকার কাছে যায়। তখনই আমেরিকা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের দিকে যোগ দেয়। ওরা যুদ্ধ জেতে।

দেখ, সামান্য একটা সাংকেতিক বার্তা এভাবে একটা যুদ্ধের ফলাফল পালে দিল।

—বাপস রে! সত্যি তাই, তুই এখন ওখানে না-থাকায় এসব কথা জানতেই পারি না।

—এরকম কত যে উদাহরণ আছে। পৃথিবীর ইতিহাসে সব বড়ো ঘটনার পিছনেই খোঁজ নিলে দেখবি, এরকম কোনো সাংকেতিক বার্তা আছে। অনেক ক্ষেত্রে আমরা জানিই না।

বলে ফের বলে উঠল, এই যে ধর, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকার যোগদান, তার মূলেও কী ছিল বল তো?

—জাপানের পারল হার্বারে অ্যাটাক?

—হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস। সেখানেও কিন্তু ব্রিটিশ কোডব্রেকাররা আগে থেকেই জাপানের কোড ব্রেক করে জানতে পেরেছিল যে এরকম হবে। কিন্তু ইচ্ছে করে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি বা জানায়নি, যাতে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ফ্র্যাঙ্ক রুজভেল্টের জন্যযুদ্ধে যোগ দেয় ও জাপান আক্রমণ করে। ওই ঘটনায় ২৪০০ আমেরিকার সেনা মারা যায়। সেজন্য আমেরিকার জাপান আক্রমণ না করে কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু ইচ্ছে করলেই আগে থেকে ব্যবস্থা নেওয়া যেত।

বলতে পারিস, ইতিহাস দেখলে দেখা যাবে, অনেক রাজারাজড়ার, সেনাপতি বা রাজনীতির লোকের থেকেও এসব ক্রিপ্টোলজিস্টের ভূমিকা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তারাই ইতিহাস পালটেছে বার বার।

—কীরকম? সে আবার কী করে হয়? যুদ্ধ তো হয় রাজাদের মধ্যে, সেনার মধ্যে।

—ধর এডওয়ার্ড ওয়াইলসের কথা। অসম্ভব প্রতিভাবান ক্রিপ্টোলজিস্ট। আমি যখন ওর কাজ দেখি, ওর প্রতিভা দেখে খুব অবাক হই। সেই সময়ে সুইডেনের একটা পরিকল্পনা ছিল ইংল্যান্ডে বিদ্রোহ ও গৃহযুদ্ধ শুরু করার। সেজন্য আড়ালে থেকে বিভিন্ন ঘটনা ঘটাচ্ছিল। একটা ৩০০ পাতার জটিল সংকেত উদ্ধার করে সেটা এডওয়ার্ড ওয়াইলস বুঝতে পেরে যায়, ও সেটা যাতে না হয়, সে ব্যাপারে রাজাকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে বলে।

এভাবে একের পর এক সংকেত উদ্ধার করে এডওয়ার্ড ক্ষমতার কেন্দ্রে উঠে আসে। ও এই সংকেত উদ্ধারের কাজটাকে প্রায় ফ্যাক্টরির পর্যায়ে নিয়ে যায়। ফ্রেঞ্চ, রাশিয়ান, পোর্তুগীজ, জার্মান, ইতালিয়ান, গ্রিক, ডাচ, সুইডিশ— পৃথিবীর যেকোনো ভাষাতেই সাংকেতিক বার্তা থাকুক-না কেন, সেটা থেকে সহজ সরল ইংরেজিতে সেই সংকেতের আসল অর্থ ও একদিনের মধ্যে বার করে নিতে পারত। সেজন্যে সেই সময়ে ইংল্যান্ড সারা বিশ্বের মধ্যে এত শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই সংকেত উদ্ধারের ক্ষমতা এতটাই দরকারি ছিল, আজও আছে।

একটা উদাহরণ দিই। ১৭৬১-তে স্পেনের দূতেদের মধ্যে এক গোপন সাংকেতিক বার্তা উদ্ধার করে এডওয়ার্ড বুঝতে পারে যে ইংল্যান্ড আর ফ্রান্সের মধ্যে দীর্ঘ যুদ্ধে স্পেন ফ্রান্সের দিকে যোগ দেবে। বুঝতেই পারছিস, এরকম খবরের তাৎপর্য কত?

কিন্তু সেই এডওয়ার্ডও সারাজীবন চেষ্টা চালিয়ে গেছে এই ইউনিভার্সাল ল্যাঙ্গুয়েজ বা ভাষা উদ্ধারের জন্য, যার কথা আমি আগেই বললাম। পারেনি শেষে।

পরে সাংকেতিক বার্তা আদানপ্রদানের কাজ করেছে অনেক ক্রিপ্টোলজিস্ট স্পাই বা গুপ্তচর, যাদের জন্য অনেক দেশের ভবিষ্যৎ, এই বিশ্বরাজনীতি, ক্ষমতার চালচিত্র—সব

পালটে গেছে।

—ক্রিপ্টোলজিস্ট স্পাই?

—হ্যাঁ, ঠিক এরকম একজন স্পাইয়ের কথা বলি, যাকে এখনও এত বছর পরেও চিহ্নিত করা যায়নি। কিন্তু আমি নিশ্চিতভাবে বুঝতে পেরেছি, সে কে ছিল। বলতে পারিস, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারের বা জার্মানির হারের মূলেও সে ছিল। তার কোড নেম ছিল 'ওয়েরদার'। এই কোড নেমের আড়ালে আসলে কে ছিল, সেটা কেউ আজও বুঝতে পারেনি।

কিন্তু তার মাধ্যমেই জার্মানির সব খবর চলে যেত রাশিয়ার কাছে, স্ট্যালিনের কাছে, অনেক আগে থেকে। এমনকী জার্মান আর্মি কুরস্কে কবে আসবে, সঙ্গে ক-টা ট্যাঙ্ক থাকবে, কত সেনা থাকবে, এসব আগে থেকেই এভাবে জেনে যেত রাশিয়ান আর্মি। জার্মানির যুদ্ধের সব কলাকৌশল, প্রস্তুতি—সব ডিটেলস এভাবেই পৌঁছে যেত রাশিয়ার মিলিটারির কাছে। পুরো এই তথ্য আদানপ্রদান হত জটিল সাংকেতিক বার্তায়। আমি সেসব উদ্ধার করে পরে বুঝতে পারি যে 'ওয়েরদার' আর কেউ নয়, ছিল স্বয়ং মার্টিন বোরম্যান, হিটলারের ডেপুটি, কিন্তু আসলে ছিল রাশিয়ার স্পাই, যার খোঁজ নাৎসিরা পায়নি। শুধু ভেবে দেখ, সরকারের কেন্দ্রে বসে আছে একজন অন্য দেশের গুপ্তচর, তাও আবার জার্মানির মতো এক দেশে হিটলারের চোখের সামনে যে হিটলার নিজের ছায়াকেও বিশ্বাস করত না। এরপরে আর কেউ জিততে পারে! সেই অসাধারণ প্রতিভাবান গুপ্তচর মার্টিন বোরম্যানও এই মহাবিশ্বের গোপন সাংকেতিক ভাষা খুঁজতে খুঁজতে শেষে ব্যর্থ হয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ২৭ বছর পরে রাশিয়ায় আত্মহত্যা করে।

আমি সেসব তথ্য জানতে পেরেছি, যদিও সারা বিশ্বের সামনে এটা এখনও রহস্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে উনি কোথায় ছিলেন, কোথায় গেলেন তা আজও কেউ জানে না। আমি কিন্তু সব জানতে পেরেছি। সাংকেতিক বার্তা উদ্ধারের ক্ষমতা থাকলে এই সুবিধে, তুই সবকিছুর পিছনের আসল সত্যটা জানতে পারবি।

—কিন্তু আমাকে আজ হঠাৎ করে এসব বলছিস কেন?

ও মুচকি হেসে পাশের কৃষ্ণকমল ফুলটাতে হাত বোলাতে বোলাতে বলে, এর থেকেই বুঝতে পারছিস, যদি কোনো শক্তি সত্যিকারের শক্তিশালী হয়, তাহলে তারা এমন সাংকেতিক বার্তায় কথা বলবে, যা আর কেউ বুঝতে পারবে না। যার সাংকেতিক বার্তা যত উন্নত হবে, সে তত শক্তিশালী হবে। সেজন্যই ইউনিভার্সাল ল্যাঙ্গুয়েজ বোঝা এত শক্ত। এটা কোনো জীবের বুদ্ধিমত্তা বিচার করার এক মাপকাঠিও বলতে পারিস।

আমি অবাক হয়ে শুনছিলাম।

একটু থেমে রাজু ফের বলে উঠল, আমি আসলে এসব বিষয় নিয়ে সব সময় মেতে থাকি বলে তোকেও অনেক কথা বলে ফেললাম। অন্য প্রসঙ্গে যাই। তোর কার কথা সব থেকে বেশি মনে পড়ে?

আমি অবাক হয়ে বলে উঠলাম, হঠাৎ করে? কে জানে! আমি নিজেই ঠিক জানি না।

ও মুচকি হেসে বলে উঠল, তোর বলার দরকার নেই। আমি জানি। তাহলে চল, বাইরে ঘুরে আসি। তুই একটা সারপ্রাইজের জন্য রেডি থাক।

৭

আমরা এবারে বাইরে বেরিয়ে এলাম। মনে হচ্ছে, এই দ্বীপটা যেন সত্যি সেরা সবকিছু দিয়ে সাজানো হয়েছে। কী নেই এখানে! কী মিষ্টি ঠান্ডা হাওয়া বইছে। দূরে সামান্য পাহাড়, উপত্যকা, জঙ্গল দেখা যাচ্ছে। মাথার উপরে নীল আকাশ। বাতাসে জুঁই আর গোলাপের মিষ্টি গন্ধ মিশে আছে।

আমরা রাস্তা দিয়ে এগোতে থাকলাম। এখানে কিন্তু কোনো লোকের দেখা পেলাম না। কিছুটা এগোনোর পরে যে জায়গায় এসে পৌঁছোলাম, সেখানে আমাদের গ্রামের মতোই চেনা নানান গাছ। একটা বড়ো পুকুর, পুকুরের ঘাট। পুকুরের জল কাচের মতো এত স্বচ্ছ পরিষ্কার যে একদম নীচ অব্দি দেখা যাচ্ছে।

উলটোদিকে একটা নীল রঙের বাড়ি। নীল রং আমার মা-র খুব পছন্দ ছিল। সে বাড়ির কিছু ঘরে আলো জ্বলছে।

রাজু বলে উঠল, চল, ওই বাড়িটাতে যাওয়া যাক, দেখা যাক কে থাকে!

আমি বলে উঠলাম, ধুর, ওরকম যার-তার বাড়িতে ঢুকে যাওয়া যায় নাকি! কী বলছিস!

রাজু শুনে মুচকি হাসল। বলে উঠল, হতেও তো পারে যে তুই তাকে চিনিস!

আমি ওর সঙ্গে বাড়ির বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম। দরজা বন্ধ।

আমাকে বলে উঠল, এখানে এটাই নিয়ম। সব বাড়ির দরজা খুলবে তখনই, যখন তুই বাড়ির জন্যে ঠিক কোড বলবি। বা বাড়িতে যে থাকে, তাকে ঠিকভাবে ডাকবি। ঠিক যেমন আমার সময়ে তুই প্রায় খেয়াল না করেই আমার নাম বলেছিলি। ওটা শুনেই আমি এগিয়ে এসেছিলাম।

—তা তুই বলে দে-না। তুই নিশ্চয়ই জানিস। আমি কী করে জানব!

রাজু ঘাড় নাড়ল— উঁহু, আমি বললে চলবে না। তুই কী করে এ বাড়িতে ঢুকবি? আমাকে তো সবাই চেনেই। ভেবে বল।

আমি চুপ করে ছিলাম খানিকক্ষণ। কিছুই মাথায় আসছিল না। কিন্তু বাড়ির বাইরের বাগান, সূর্যমুখী আর জুঁই ফুলের গাছটা দেখে আপনা থেকে কেন জানি বলে উঠলাম, মা। মা-র খুব পছন্দ ছিল এই দুই ফুল।

বলতেই দরজা খুলে গেল। খোলা দরজা দিয়ে রাজু আমাকে নিয়ে ঢুকল। কিছুটা এগিয়ে বাঁদিকে একটা ঘরে ঢুকতেই বুঝলাম এটা রান্নাঘর। এ ঘরে আলো একটু কম।

সেই ঘরে ঢুকেই পাথরের মতো দাঁড়িয়ে পড়লাম। ঘরের অন্য প্রান্তে মা দাঁড়িয়ে আছে। রান্না করছে। মা-র বেশি শাড়ি ছিল না। সেই যে হালকা নীল শাড়িটা পরে রান্না করত, সেই শাড়িটাই পরে আছে।

আমি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না। মা কী করে এখানে আসবে মৃত্যুর এত বছর পরে! কিন্তু এত সত্যি মা। হ্যাঁ, স্পষ্ট, আমার মা আমার থেকে দশ হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছে।

আমার দিকে ঘুরে তাকিয়েছে। চোখে জল। চোখ ছলছল করছে।

—বাবুন!

—মা তুমি?— ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলাম মা-কে। —তুমি এখানে কী করে?

মা-র চোখে জল, একসঙ্গে হাসি।

কত কতদিন বাদে দেখলাম মা-কে। কিন্তু পরক্ষণেই আবার অবিশ্বাসের চোখে তাকালাম। এ কী করে হয়! মা তো মারা গিয়েছিল যখন আমি ক্লাস সিক্সে। হঠাৎ করে কদিনের জ্বরে আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

তারপরে কত দিনরাত মা-কে খুঁজেছি। মা-র জন্য কত রাত একা কেঁদেছি। একসময় পড়াশোনাও ছেড়ে দিয়েছিলাম এজন্য।

রাজু বলার পরেই আবার স্কুলে যাওয়া শুরু করেছিলাম। সেই মা, আমার সামনে! মা-কে আমি স্পর্শ করতে পারছি। রাজুকে জিজ্ঞেস করে উঠলাম, এ কী করে সম্ভব!

রাজুর চোখেও জল। শুধু বলে উঠল, না। সেসব কথা পরে বলব। এখন বলা যাবে না।

আমিও আর কিছু বললাম না। আজ অনেক কিছুই হচ্ছে, যাকে লজিক দিয়ে বোঝানো যায় না। কিছু সময় হৃদয়ের কাছে বুদ্ধির হার মানা ভালো।

সেইদিন, সেই সারারাত শুধু মা-র আর রাজুর সঙ্গে কথা হল। কত কথা। মা-র সেই সরল প্রশ্নগুলো—ঠিক করে খাস তো?

—মন দিয়ে পড়াশোনা করছিস তো?

বললাম যে সেসব পর্যায় আমি অনেকদিন আগে পেরিয়ে এসেছি। এখন চাকরি খুঁজছি।

—বড্ড রোগা হয়ে গেছিস। ঠিক সময়মতো খাচ্ছিস তো? বলেছি না সকালে খালি পেটে একদম বেশিক্ষণ থাকবি না।

—মা, আমি আগের থেকে অনেক মোটা হয়েছি, সবাই বলে। তুমি সব সময় আমাকে রোগাই দেখো।

আমাদের মধ্যে কথা চলতেই থাকে। কত বছরের জমে-থাকা কথা। কত বছরের অপ্রাপ্তি, কত বছরের স্বপ্ন। মা ঠিক আগের মতোই আছে।

ভোর যখন হয়ে এল, তখনও বুঝিনি যে অনেক কথাই বলা হয়নি। আমরা তখনও ওই কিচেনে বসে গল্প করে যাচ্ছি। মায়ের হাত ধরে কথা বলে যাচ্ছি তখনও। এই হাত আমি কখনো ছাড়ব না।

রাজু হঠাৎ বলে উঠল, এবারে যেতে হবে। আর সময় নেই।

—কোথায় যেতে হবে? আমি এখানেই থাকতে চাই। বাবাকেও এখানে নিয়ে আসব।

—তা তো হয় না। তোকে এবারে সব বোঝাই। এবারে তুই আবার ভালো করে চারদিকে চেয়ে দেখ। কেউ কোথাও নেই।

চারদিকে তাকালাম।

মুহূর্তের মধ্যে যেন সবকিছু হারিয়ে গেল ফের। আমি আর্তনাদ করে উঠলাম, মা— মা কোথায়?

দেখি, শুধু রাজু দাঁড়িয়ে আছে, আমি সেই সমুদ্রের ধারে বসে আছি।

রাজু বলে উঠল, ওরা চাইলে তোর পছন্দের জগৎ তৈরি করে দিতে পারে। যা দেখছিলি— যা শুনছিলি, সব ওরা তোর জন্যেই করেছিল। এটা তোর তৈরি করা জগৎ, তুই যা চাইছিলি মনের গভীর থেকে, সেটা বুঝেই ওরা ঠিক সেরকম তৈরি করে দিচ্ছিল।

আমার কথাতেই ওরা অনুরোধ রেখেছে। ওদের তৈরি মেটাভার্স শুধু তোর জন্য, যার আসল কোনো অস্তিত্ব নেই। ওরা এটা পারে। এটা না করলে তুই ফিরে আসতেও পারতিস না।

—কারা ওরা? আমি কোথায় ফিরে আসব?

—ওরা অন্য জগতের লোক। বহু ছায়াপথ দূরের এক গ্রহে ওরা থাকে। কিন্তু আমার ভাষার মাধ্যমে আমার সঙ্গে ওদের যোগাযোগ থাকে। তোকে বলছিলাম না। এ এক ইউনিভার্সাল ল্যাঙ্গুয়েজ—সাংকেতিক ভাষা। যা বিশ্বের সেরা ক্রিপ্টোগ্রাফাররা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে উদ্ধার করার চেষ্টা করে গেছে। কিন্তু পারেনি। আমাকে 'ভয়নিচ ম্যানাস্ক্রিপ্ট'

কিছুটা সাহায্য করেছিল। রজার বেকন এ নিয়ে বেশ ভালো কাজ করেছিল, যদিও শেষ পর্যন্ত এই ভাষা নিজে উদ্ধার করতে পারেনি। একইভাবে যাদের সবার কথা বললাম, এরা সবাই একটু একটু করে এগিয়েছিল, কিন্তু কেউ শেষ পর্যন্ত উদ্ধার করতে পারেনি। মজার কথা কী জানিস, আমাদের শ্রুতিবেদ-এও এর উল্লেখ আছে। হয়তো সে সময়ে কোনো সাধু বা ঋষি এটা জানতেন। কিন্তু পরে এই জ্ঞান হারিয়ে গিয়েছিল। আমার কাজে সেসব সাহায্য করেছে। সে ভাষা জানি বলেই তোকে বাঁচাতে পেরেছি।

—মানে? আমার কী হয়েছিল?

—তুই মারা গিয়েছিলি জলে ডুবে। তখনই আমি আসি। তোর সঙ্গে যোগাযোগ করি। আচ্ছা, তোর খেয়াল হল না এতক্ষণ তোর সঙ্গে ক্র্যাচ নেই? তুই দিব্যি হেঁটেচলে ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছিস। এবারে তোর জেগে ওঠার সময়। ভালো থাকিস। মনে রাখবি। সঙ্গে আছি। তুই ভয় পাস না।

ভালো লোকেরা চুপ করে থাকলে শুধু অন্যায়ের কথাই শোনা যায়। আমি তোর সঙ্গেই এবারে যাব আমাদের গ্রামে। ওরাও সঙ্গে থাকবে, সামনে না এলেও। তবে বহু আলোকবর্ষ দূরে থাকলেও ওরা পারে না, এমন কিছু হয় না।

—কিন্তু তুই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলি কী করে? আমি এখন তাহলে কোথায়?

—তুই ছিলিস সীমান্ত অঞ্চলে। জীবন-মৃত্যুর সীমান্ত অঞ্চলে। আমি সে সময় তোর কথা শুনে সেখান থেকে তোকে উদ্ধার করি। এসবই সম্ভব হয়েছে আমি ওই ভাষা জানি বলে। মৃত্যুর পরে কিছুক্ষণ সবাইকে ওই ভাষায় যোগাযোগ করা যায়। সেজন্যেই সম্ভব হল।

—কিন্তু মা?

রাজু আমার হাতটা জড়িয়ে ধরল। বলে উঠল, যারা চলে যায়, তাদের আর ফেরানো যায় না। এটা মৃত্যুর কিছুক্ষণের মধ্যেই শুধু সম্ভব। যতক্ষণ মানুষ সীমান্ত অঞ্চলে থাকে।

—তুই বার বার আমি মরে গেছিস বলছি। কিন্তু আমি তো দিব্যি বেঁচে আছি।

উত্তরটা রাজুর থেকে এল না। রাজু চোখের সামনে থেকে হারিয়ে গেছে। মনে হল, দূর থেকে কিছু লোকের গলা শুনতে পাচ্ছি।

একটু একটু করে যেন সেসব অচেনা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম।

—ছেলেটার জ্ঞান ফিরে আসছে।

—হ্যাঁ, আবার হার্টবিট চালু হয়েছে।

—কী আশ্চর্য! আমি তো ভেবেছিলাম, ছেলেটা মারাই গেছে। এতক্ষণ নাড়ি পাচ্ছিলাম না।

—ওই, ওই তো চোখের পাতা নড়ছে!

—কী আশ্চর্য! একেই বলে, রাখে হরি, মারে কে!— আরেকটা গলা।

চোখ খুলে দেখি, অনেকগুলো মুখ আমার কাছে ঝুঁকে দেখছে।

—বেঁচে গেছে। বেঁচে গেছে। —কে যেন চিৎকার করে উঠল।

—দূরে দূরে। ওকে একটু ভালো করে নিশ্বাস নিতে দাও। ভিড় কোরো না— কে যেন পাশ থেকে বলে উঠল।

৮

২৫ মে

দু-দিন হল গ্রামে ফিরে এসেছি। নদী আমাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। আমি জলের তলায় ডুবে গিয়েছিলাম। একদম শেষ মুহূর্তে কিছু লোক আমাকে সাঁতরে গিয়ে উদ্ধার করে। তবে তারা আশাই করেনি যে আমি প্রাণ ফিরে পাব। প্রায় মিনিট পাঁচেক নাকি আমার কোনো হার্টবিট ছিল না। মৃত বলে ধরে নিয়েছিল।

ভাগ্যিস তাদের মধ্যে কেউ চেনাজানা ছিল না। তা না হলে এই খবর বাবার কাছে গেলে যে কী খারাপ লাগত বাবার।

বাকিটা হয়তো স্বপ্ন ছিল। ঠিক যেরকম হয় শুনেছি জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে, যাকে 'নিয়ার ডেথ এক্সপিরিয়েন্স' বলে।

শুনেছি, মানুষ মৃত্যুর পরমুহূর্তে তার প্রিয়জনদের দেখে, সব থেকে প্রিয় মুহূর্তগুলোকে দেখে। সেরকমই হয়েছিল হয়তো। তবে এত জীবন্ত স্বপ্ন আমি আগে কোনোদিন দেখিনি। মনে হচ্ছে যেন সেসব সত্যি ছিল।

তবে একটা জিনিষ হয়েছে। আমার মধ্যে একটা পরিবর্তন হয়েছে। আমি বুঝতে পেরেছি জীবন কত মূল্যবান। এত সহজে জীবনসংগ্রামে হার স্বীকার করতে নেই। সে কথা বোঝাতেই হয়তো আমার স্বপ্নজগতে রাজু এসেছিল। মা এসেছিল।

একটা জিনিস তবে অবাক লেগেছে। যে কথাগুলো রাজু আমাকে বলেছিল, সেই কথাগুলো? এখনও কিছু নাম মনে আছে। কী করে সেগুলো জানলাম?

আমি গতকাল গ্রামের লাইব্রেরিতে গিয়ে একটা বই পেলাম, নাম 'ক্যান ইউ ক্র্যাক দ্য এনিগমা কোড'। তাতে রাজুর সব কথা না পেলেও 'ওয়েরদার'-এর কথাটা দেখলাম। যদিও মার্টিন বোরম্যান যে ওয়েরদার—এরকম কোনো কথা সেখানে লেখা নেই। ভেবে দেখলাম সবকিছুতে লজিক খোঁজার দরকার নেই। কিছু জিনিস রহস্যই থাকুক।

বলতে নেই, সেই স্বপ্ন আমি বার বার দেখতে চাই। আমার মা-কে যদি এরকমভাবে আরও কিছুক্ষণের জন্য ফিরে পাই। এরকম একটা স্বপ্ন জীবনের অর্থ পালটে দিতে পারে।

ও হ্যাঁ, বাস্তবের জীবনটা তবে অবশ্য এত সহজ—সোজা নয়। কিন্তু মনে হল যেন তার মোকাবিলা করার জন্যে মনের জোর পেয়ে গেছি।

আজ সকালে পাড়ার হেবোদা তার দুই শাগরেদকে নিয়ে এসেছিল। আমি আর বাবা দুজনেই ছিলাম দোকানে। হুমকি দিয়ে গেল। বলেছে, আমাদের এক মাস সময় দিচ্ছে। তার মধ্যে বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে। পরিবর্তে ও দু-লাখ টাকা দেবে।

আমাদের বাড়ির জমির দামই তার থেকে অনেক বেশি। আসলে আমার বাবা—ঠাকুরদা, ঠাকুরদার বাবা এখানেই থাকত। সেজন্য বাড়িটা গ্রামের প্রায় কেন্দ্রে বলা যায়। আমাদের অবস্থা খারাপ হলেও বাড়িটা বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে।

শুনেছি, আমাদের জায়গায় ও আরও আশপাশের বেশ কিছু জমি নিয়ে একটা বড়ো শপিং মল হবে। এখানকার ও আরও আশপাশের সব এলাকার মধ্যে সব থেকে বড়ো শপিং মল।

সেজন্যই এত হুমকি। তার সঙ্গে তো আগের ঘটনাটা আছেই।

বাবার শরীর এমনিতেই খারাপ। এসব দেখার পরে আরও খারাপ হয়ে পড়েছিল।

ভাবছি, এই গ্রাম ছেড়ে চলে যাব। এদের সঙ্গে ঝগড়া-মারপিট করে তো আর এখানে থাকা যাবে না। দু-লাখ টাকা দিলে সেটা দিয়ে অন্তত বাবার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যাবে। আমার এক দূর সম্পর্কের পিসি আছে কলকাতায়। সেখানে গিয়ে কিছুদিন থাকা যাবে। তার পরে দেখা যাবে।

বাড়ি ফিরে বাবার পাশে বেশ খানিকক্ষণ বসেছিলাম। বাবার বেশ ভালোই জ্বর আছে। আর একটানা কাশি। তার মধ্যেই আস্তে আস্তে বলে উঠল, জানিস, আমি তেমন পড়াশোনার সুযোগ পাইনি। সারাজীবন কেটে গেছে ওই একটা ছোটো দোকান দিয়ে। আর এই বাড়ির আশ্রয়ে। তুই যাতে পড়াশোনা করে মানুষ হোস, সেটাই ছিল আমার একমাত্র লক্ষ্য। তবে কোনোদিন কোনো ব্যাপারে জোর করতেও চাইনি। যেটা তোর পক্ষে সম্ভব, সেটাই হবি সৎপথে থেকে। কিন্তু কোনো অন্যায় সহজে মেনে নিলে পাপ হয়।

অন্যায় যে করে অন্যায় যে সহে; তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে। ওদের ভয়ে এ বাড়ি ছেড়ে দিস না।

—কিন্তু কী আর করব, বাবা! ওরা কত শক্তিশালী, তা তো তুমি জানো। যদি আমাদের গ্রামে কোনো সাহসী লোক থাকত যে আমাদের সাপোর্ট করত, তাহলেও হত। সবাই ওদের ভয়ে বেঁচে-মরে পড়ে আছে। ওরা সব রাজনীতি করে, ওদের সঙ্গে বড়ো বড়ো নেতার যোগাযোগ আছে। তাদের সরাসরি সাপোর্ট আছে। আমাদের কথা কে শুনবে!

বাবা আমার হাতটা জড়িয়ে ধরে বলল, তবু কাল একবার পুলিশ থানায় গিয়ে জানাস। কমপ্লেন করে আসিস। আইন-আদালত বলে একটা জিনিস আছে তো! নাকি সব জঙ্গলের রাজত্ব! ওদের উপরে ভরসা রাখতেই হবে। এটা আমাদের পিতৃপুরুষের ভিটে। তাদের আশীর্বাদ মিশে আছে এ মাটিতে। এই বয়সে আমি আর কোথায় যাব!

বাবাকে কথা দিলাম, কাল থানায় যাব। বাড়ি কোনোভাবে বিক্রি করব না।

৯

২৬ মে

থানায় গিয়ে কোনো লাভ হল না। বেশ খানিকক্ষণ বাইরে বসে অপেক্ষা করতে হল। তারপরে দেখি, ও.সি. দিগম্বরবাবুর ঘর থেকে বেশ কয়েকজন বেরিয়ে আসছে। তার মধ্যে হেবো ও হেবোর দলের কয়েকজন আছে। বেরোনোর সময় বেশ হালকা চালের হাসির কিছু কথা ভেসে এল ঘরের ভেতর থেকে।

বুঝলাম, অফিসারের সঙ্গে বেশ ভালোই আলাপ আছে এদের। আমার দিকে একবার কটমট করে তাকিয়ে বেরিয়ে গেল।

শুনলাম, হেবো আমাকে শুনিয়ে ওর দলের আরেকজনকে আমাকে উদ্দেশ করে বলছে, দরকার হলে ল্যাংড়ার হাত দুটোও ভেঙে দিতে হবে।

আরও প্রায় এক ঘণ্টা বাদে ও.সি.-র দেখা পেলাম। বেশ জাঁদরেল চেহারার রাশভারী ভদ্রলোক। গম্ভীর গলায় না শুনেই বলে উঠলেন, কী ব্যাপার! সব ব্যাপারে থানায় ছুটে এলেই কি কাজ হবে! আমার আর কোনো কাজ নেই!

আমি খুব সংক্ষিপ্তভাবে ঘটনাটা বলার চেষ্টা করলাম।

আমাকে কথার মাঝে থামিয়ে দিয়ে উনি বলে উঠলেন, কী দরকার এদের সঙ্গে ঝামেলা করার? ধরো, তোমাকে মেরে ফেলল, কী করবে? জলে নেমে কুমিরের সঙ্গে লড়াই করতে নেই। যা বলছে, শুনে নাও। না হয় আরও দশ হাজার বেশি যাতে বাড়ির জন্য দেয়, সেটা আমি বলে দিতে পারি। এটাই যে দিচ্ছে, তা-ই বড়ো ভাগ্য। বাড়িটা কেড়ে নিলেই বা কী করতে!

পুলিশের মুখে এ কথা শুনে অবাক লাগল।

আমি বললাম, সেজন্যই তো তো থানায় জানাতে আসা!

সেটা শুনে উলটে আমাকে ধমক দিয়ে বলে উঠলেন,বাড়ির কাগজপত্র ঠিক নেই, আমাদের বাড়ি, আমাদের বাড়ি বলা।

আমি বলে উঠলাম, আমরা এখানে তিন পুরুষ ধরে আছি। একশো বছর!

—সে তোমরা তিন পুরুষ আছ নাকি বর্ডার পার করে দু-দিন আগে বাসা গেড়েছ, সেসব হিসেব তো বেঁচে থাকলে হবে, তা-ই না! যা বললাম, সেটা করো।

গলা একটু নরম করে ফের বলে উঠলেন, আরে ওরকম ভালো শপিং মল হলে তুমিও বাবাকে নিয়ে সিনেমা দেখতে পারবে। যাও, আমার আর সময় নষ্ট কোরো না।

বুঝলাম, আর কিছু বলে লাভ হবে না। উনিও ওদের দলে। বাড়ি চলে এলাম।

সকাল থেকে থানায় যাওয়ার জন্য দোকান বন্ধ। বেশিক্ষণ বন্ধ রাখা যাবে না। এমনিতেও খদ্দের কমে এসেছে। দোকান নিয়মিত খোলা না থাকলে আরও কমে যাবে। খানিকক্ষণ বাবার সঙ্গে বাড়িতে থেকে আবার দোকানে এসে বসলাম। এরকম সময়ে যদি সেই স্বপ্নের মতো রাজুকে পাশে পাওয়া যেত।

ও ভয় না পেয়ে ঠিক আমার পাশে থাকত।

বিকেলের দিকে দেখি, আমার দোকানের দিকে ছজন গুন্ডা টাইপের লোক এগিয়ে আসছে। তাদের মধ্যে দুজনকে চিনি। হেবোর দলের লোক। সব কজনেরই বেশ তাগড়াই চেহারা। সঙ্গে পাশের পাড়ার মাধবকাকু। আমাদের দোকানের নিয়মিত খদ্দের।

লোকগুলো দেখি, দোকানের সামনে মাধবকাকুকে এনে জিজ্ঞেস করছে, আপনি এখান থেকেই কোল্ড ড্রিঙ্কসটা নিয়েছিলেন? শিয়োর?

মাধবকাকু দেখি কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, হ্যাঁ, এখান থেকেই নিয়েছিলাম।

সত্যি তা-ই, সকালে মাধবকাকু নিয়েছিল কোকের বোতলটা।

হঠাৎ দেখি, একটা মড়া টিকটিকি হাতে ঝুলিয়ে পেচো বলছে, এই টিকটিকিটা এর মধ্যে ছিল। মাধবকাকুর ছেলে এখন এজন্যে হাসপাতালে।

এটা যে হতে পারেই না, তা আমি জানি।

পাশ থেকে একজন বলে উঠল, এসব নকল কোলা। ফাঁকা বোতলে ভরার সময় টিকটিকিটা এসে পড়েছিল। বলি, এসব ব্যাবসা কতদিন করা হচ্ছে!

এরপরে কেউ আমাকে বলার সুযোগ পর্যন্ত দিল না। দোকান থেকে জিনিসপত্রগুলো ছুড়ে ছুড়ে রাস্তায় ফেলে দিল। পেচো এগিয়ে এসে দোকান থেকে আমাকে টেনে বার করে আমার গালে এক রামথাপ্পড় মেরে, তারপরে ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় ফেলে দিল।

তার পরের দশ মিনিট কী হল বলা মুশকিল। কেউ পা দিয়ে লাথি মারছে তো কেউ আবার মুখে ঘুসি। একটা লোক আবার হাতে একটা লাঠি দিয়ে আমার পায়ে দুবার সজোরে মারল। চারদিকে লোক জমায়েত হলেও কেউই আমার সাহায্যের জন্য এগিয়ে এল না।

প্রায় আধমরা অবস্থায় রাস্তায় ফেলে রেখে যাওয়ার সময় বলে উঠল, দশ দিনের মধ্যে বাড়ি খালি না করে বেরিয়ে না গেলে লাশ পড়ে থাকবে।

বুঝলাম পুরোটাই সাজানো। তবে কিছু বলার শক্তি আমার ছিল না। ওরা চলে যাওয়ার প্রায় পাঁচ মিনিট বাদে গ্রামের পরিচিত কিছু লোক এগিয়ে এল। আমাকে টেনে তুলে ক্র্যাচটা এগিয়ে দিল। বাড়ি অব্দি পৌঁছে দিল। সারা শরীর আমার তখন রক্তে ভেসে যাচ্ছে। কেউ কেউ আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কথা বলছিল, কিন্তু আমি নিজেই যেতে চাইলাম না।

এরা সবাই নিরীহ মানুষ। এদের কারোই এদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সৎসাহস নেই। সবাই জানে এটা সাজানো ঘটনা। তবুও।

বাড়িতে ঢুকে লুকিয়ে অন্য ঘরে যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু বাবার অসহায় দৃষ্টির সামনে পড়ে গেলাম। বাবা ঘরে তক্তার উপরে শুয়ে আছে আর জ্বরের বিকারের মধ্যে তখনও বলে যাচ্ছে, অন্যায় যে করে অন্যায় যে সহে; তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।

আমি জানি, আমাকে কী করতে হবে। আমি এ অন্যায় মেনে নেব না। আমি পঙ্গু হতে পারি, কিন্তু দুর্বল নই।

তবু আমি অন্য ঘরে গিয়ে কেঁদে ফেললাম। এতো অসহায় কোনদিন বোধ করিনি। কী করব একা! সঙ্গে অসুস্থ বাবা। অর্থবল নেই, লোকবলও নেই যে কোনো আদালতে যাব।

ঠিক তখনই চোখে পড়ল পড়ার টেবিলের উপরে রাখা সাদা কাগজটা। এটা কোথা থেকে এল?

একটা সাদা কাগজে একটা পরিচিত সুকুমার রায়ের কবিতা।

অভয় দিচ্ছি শুনছ না যে? ধরব নাকি ঠ্যাং দুটা?

বসলে তোমার মুণ্ডু চেপে বুঝবে তখন কাণ্ডটা!

আমি আছি, গিন্নি আছেন, আছেন আমার নয় ছেলে

সবাই মিলে কামড়ে দেব মিথ্যে অমন ভয় পেলে।

কাগজটার উলটোদিকে কয়েকটা অর্থহীন অক্ষর টাইপ করা।

'ছি ব চ লমু রে ন স ঙ্গে মা কা কে হ রু কে আ'

এ রাজু ছাড়া অন্য কেউ হতে পারে না।

আনন্দে সব ব্যথা মুহূর্তে ভুলে গেলাম। রাজু কি তাহলে সত্যি আছে?

অর্থাৎ ও আমাকে জানাতে চাইছে, 'ভয় পেয়ো না'। ঠিক সেই নামের সুকুমার রায়ের ছড়ার থেকে এই অংশটা নেওয়া হয়েছে।

হঠাৎ যেন সব সাহস খুঁজে পেলাম। চারদিকে তাকালাম— রাজু কি এখানেই আছে?

তবে উল্টোদিকের কাগজে লেখা অক্ষরগুলোর কোন মানে খুঁজে পেলাম না।

'ছি ব চ লমু রে ন স ঙ্গে মা কা কে হ রু কে আ'

কিন্তু তখনই হঠাৎ খেয়াল হল। কীভাবে আমরা দুজনের মধ্যে দরকারি কোনো কথা সাংকেতিকভাবে একজন আরেকজনকে পাঠাব সে ব্যাপারে বহু বছর আগে ও আমাকে বলে গিয়েছিল। তারপরে দুবার এরকম সাংকেতিক বার্তা আদানপ্রদানও করেছি ওর সঙ্গে। তবে সেসব দশ বছরের আগের কথা।

কিন্তু এর জন্যে লাগবে একটা দেশলাই বাক্স। অন্য ঘর থেকে একটা দেশলাই বাক্স নিয়ে এলাম।

ও বলেছিল 'ব' অক্ষরটা আমার আর ওর মধ্যে 'কি ওয়ার্ড'। আমরা যখন একজন আরেকজনকে সেই বার্তা পাঠাব সংকেতের মাধ্যমে, সেটা ঠিকভাবে বোঝার জন্য লাগবে শুধু একটা দেশলাই বাক্স। 'ব' অক্ষরটা যেখানে থাকবে, সেখান থেকে শুরু করতে হবে।

দেশলাইয়ের চারদিকে ওই অক্ষর-লেখা কাগজ জড়িয়ে নেওয়ার সময় 'ব' অক্ষরটা যাতে উপরের একদম বাঁদিকের শুরুর অক্ষর হয়। সেটা করার পরে দেশলাইয়ের দুইপাশের দিকে অর্থাৎ বারুদ-লাগানো অংশে যে অক্ষরগুলো থাকবে, শুধু সেটুকু পড়তে হবে, বাকিটা বাদ দিয়ে।

ঠিক সেটাই করলাম।

এবারে সেই লেখার অর্থ খুঁজে পেলাম— 'সঙ্গে আছি'।

চোটের যন্ত্রণা সত্ত্বেও হেসে উঠলাম। ও যে বেঁচে আছে, এখানেই কোথাও আছে, এর থেকে বড়ো প্রমাণ আর কিছু হয় না। শুধু দুটো ছোটো শব্দ আমার সব যন্ত্রণা ভুলিয়ে দিল।

কিন্তু ও আছে কোথায়? সামনে আসছে না কেন?

১০

২৭ মে

পরের দিন সকালে হেবোর সঙ্গে দশজন লোক এল আমাদের বাড়িতে। সব কজনকে দেখলেই ভয় লাগে। এরা যে গুন্ডামি ছাড়া কিছু করে না, খেলাচ্ছলে লোক খতম করতে পারে, তা এদের চেহারা দেখেই বোঝা যায়।

হেবো ব্যাগ থেকে টাকার একটা বড়ো বান্ডিল বার করে বাবার গায়ে ছুঁড়ে দিয়ে বলে উঠল, দু-লাখ দশ হাজার আছে।

বলে সামনে একটা চেয়ার টেনে হেবো বসে বলে উঠল, এই কাগজগুলোতে সাইন করতে হবে, কাকু। ব্যাপারটা আমি ক্লিন রাখতে চাই।

বলে বেশ কয়েকটা আইনি কাগজ এগিয়ে দিল বাবার দিকে।

বাবা একবার কাগজে চোখ বুলিয়ে শান্ত গলায় বলে উঠল, কিন্তু আমি তো বাড়ি বিক্রি করব না।

—মানে? বাড়ি বিক্রি করবেন না মানে? কাল ছেলের কী অবস্থা করেছি, দেখেছেন তো? ওটা শুধু সিনেমার বিজ্ঞাপন ছিল। পুরো সিনেমাটা দেখাব নাকি!— হেবো গর্জে উঠল হিংস্রভাবে।

আমি বলে উঠলাম, বাবা যেটা বলছেন, সেটা বোঝা তো খুব সহজ। আমরা বাড়ি বিক্রি করব না। আমরা এখানেই থাকব।

হেবোর চোখ জ্বলে উঠল।

—হুম, বাপ-ব্যাটায় খুব সাহস বেড়ে গেছে দেখছি। ঠিক আছে, আড়াই লাখে রফা। এবারে না রাজি হলে একটা টাকাও দেব না। জবরদখল করব। যেরকম আমরা অনেক করি। দেখি, ল্যাংড়া কী করে! আর তোর তো যা অবস্থা, আজ নয়তো কাল এমনিতেই টেঁসে যাবি। —বাবাকে লক্ষ করে নোংরাভাবে বলে উঠল কথাটা।

—না, আমরা বাড়ি বিক্রি করব না। আড়াই লাখেও নয়। আমরা এখন কোনোভাবেই এ বাড়ি বিক্রি করব না। —আমি আবার বলে উঠলাম।

—আচ্ছা, দেখা যাবে। আমাকে তো চিনিস না চাঁদু। কালকের মধ্যে তোদের কী করে তাড়াই দেখবি! তোরা এই গ্রামে কী করে থাকিস, দেখে নেব।

আমি শান্তভাবে বলে উঠলাম, আমরা থাকব। শুধু থাকব, তা-ই নয়। এখানে, আমাদের এই গ্রামে কোনো অন্যায় কাজ করতে দেব না। বেআইনি বোমা তৈরির যে ক-টা কারখানা হয়েছে, সেটা বন্ধ করব। সীমান্ত থেকে মেয়ে, ড্রাগ, সোনা পাচার সব বন্ধ করব।

বাবা অবাক দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে। বেশ বুঝতে পারলাম, সে দৃষ্টিতে একটা বিস্ময় আর প্রশংসা একই সঙ্গে মিশে আছে। যেন বলছে, কী করে তোর এত সাহস হল বল তো! শাবাশ।

আমার কথা শুনে অট্টহাসি করে উঠল হেবো আর তার সঙ্গে সঙ্গে হেসে উঠল ওর পোষা গুন্ডার দল।

হাসতে হাসতে বলে উঠল, ল্যাংড়ার তো ভারী সাহস! —বলে উঠে দাঁড়িয়ে কদর্যভাবে আমার হাঁটার ভঙ্গি দেখিয়ে বলে উঠল, একা হাঁটতে পারে না। আর আমাদের বোমা তৈরির কারখানা বন্ধ করবে!

'হা হা' করে সঙ্গে হাসতে লাগল হেবোর দল।

হেবো ফের লাল চোখ করে ওর ভারী গলায় বলে উঠল, আচ্ছা, কী করে এরপরে আর এখানে একদিনও থাকিস, দেখে নেব। আমার একটা এথিকস আছে। আমি সক্কাল সক্কাল খুনজখম করে হাত ময়লা করতে চাই না। ছয় ঘণ্টা সময় দিলাম ভাবার।

ওরা সব দুমদাম করে বেরিয়ে গেল।

বাবা দেখি, উত্তেজনায় কাঁপছে। চোখে জল। অশক্ত দু-হাত দিয়ে আমার বাঁ হাত চেপে ধরেছে।

শুধু শান্ত গলায় বলে উঠল, যত কম ক্ষমতাই থাকুক-না কেন, আমাদের সত্যের পথে থাকতে হবে। আমরা আমাদের পথ তৈরি করি। সেখানে একটা ছোটো ইটেরও অনেক গুরুত্ব আছে। না হয় আমরা প্রথম ইটটা পেতে দিয়ে যাব অন্যায়ের বিরুদ্ধে। খুব ভালো কাজ করেছিস বাবুন।

আমার বাবা মাধ্যমিকের পরে পড়ার সুযোগ পায়নি। তবু এত ভালো শিক্ষক আমি আর কোনোদিন দেখিনি।

কিছুক্ষণ বাদে আবার আরেকটা সরু কাগজ পেলাম টেবিলের উপরে, কোথা থেকে কখন এল বুঝতে পারলাম না। আগের বারের থেকেও ছোটো হরফে বেশ কিছু টাইপ করা অক্ষর। দেশলাইয়ের গায়ে কাগজটা জড়াতে, আসল অর্থ খুঁজে পেলাম। দেখলাম তাতে লেখা 'পিপীলিকা বাহিনী প্রস্তুত। '

১১

২৮ মে

তখন রাত ক-টা হবে, জানি না। হঠাৎ দেখি, দরজায় কে যেন জোরে জোরে ধাক্কা দিচ্ছে।

বাবা অসুস্থ। এত আওয়াজে শরীর খারাপ লাগবে। এত রাতে কে এল! প্রথমেই ওদের কথা মনে এল। সারাদিন আসেনি। এখন কি ওরা ফিরে এসেছে?

ঘড়িতে দেখলাম রাত দেড়টা। নিশ্চয়ই এত রাতে ভালো কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে আসেনি।

বাইরে উকি মেরে দেখি ঠিক তা-ই। প্রায় জনা কুড়ি লোক বাইরে জড়ো হয়েছে। কয়েকজনের হাতে লাঠি, ছোরা। একজনের হাতে একটা মশালজাতীয় কিছু, তাতে আগুন জ্বলছে। সঙ্গে মনে হল কয়েকটা ক্যান। ওগুলোতে কি কেরোসিনজাতীয় কিছু আছে আগুন লাগানোর জন্য?

এবারে সত্যি ভয় লাগল। ওরা তার মানে আমরা না বেরোলে বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেবে। আমাদের পুড়ে মরতে হবে। আর বেরোলে পিটিয়ে মারবে।

আমি অবলম্বন ছাড়া হাঁটতেও পারি না। এসব দেখে আশপাশের কেউ যে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে না, সে বিষয়েও নিশ্চিত।

আর রাতে করছে অর্থাৎ কেউ দেখে ফেললে, তাকেও ওরা জ্যান্ত রাখবে না। এমনিতেও আজ সরু কাস্তের মতো একফালি চাঁদ, সেটাও মেঘের আড়ালে।

দরজা খুলব কি খুলব না, ভাবতে-না ভাবতেই দেখি, দরজা ভেঙে দুদ্দাড় করে কয়েকজন ঘরে ঢুকে পড়েছে।

এসে ঘরের এক-একটা জিনিষ বাইরে ছুড়ে ফেলতে শুরু করল।

কিন্তু তার ঠিক পরমুহূর্তে যা হল, তা বুঝিয়ে বলা মুশকিল।

দেখি, লোকগুলো নাচতে শুরু করেছে। শুধু যারা ঘরের ভেতরে ছিল, তারাই নয়। বাইরে যারা আছে, তারাও।

বেশ অন্য ধরনের নাচ। আমি খুব কম সিনেমাই দেখেছি। তবে আমার দেখা কোনো হিন্দি বা বাংলা সিনেমার নাচের মতো নয়। আর সঙ্গে 'উরিবাবা' 'উরিবাবা' করে গানও জুড়েছে। হয়তো কোনো সাম্প্রতিক সিনেমার গান।

নাচতে নাচতে দেখি, হাতের লাঠি, ছোরা ছুড়ে ফেলে জামা-প্যান্ট খুলতে শুরু করল।

সে দৃশ্য ঠিক কহতব্য নয়।

তারপরে বুঝলাম ব্যাপারটা। আসলে মশালের আলোর বাইরে অন্ধকার থাকার জন্য ভালো করে বুঝিনি। মনে হল, ওদের গায়ের মধ্যে অজস্র পিঁপড়ে যেন চলেফিরে বেড়াচ্ছে। আর তাদের কামড়ের জন্যই ওরা অমন নাচতে শুরু করেছে।

ব্যাপারটা বেশিক্ষণ চলল না। মিনিট দশেকের মধ্যে সামনের রাস্তা একেবারে পরিষ্কার শুনশান। শুধু কিছু লাঠি, ক্যান, ছোরা রাস্তায় পড়ে আছে।

১২

২৯ মে

পরের দিন সকাল সকাল থানা থেকে ডাক এল। তবে এমনিতেই যাব ভেবেছিলাম। হামলার কথা জানাতে।

আমি থানায় ঢুকতেই দিগম্বরবাবু যেন হুংকার করে উঠলেন। দেখি ওর চোখ টকটকে লাল।

আমাদের গ্রামের যাত্রাপালায় যে লোকটা রাবণের পার্ট করে, তার থেকেও এঁকে বেশি ভালো মানাত ওই রোলে।

—এসব কী হচ্ছে?

—স্যার, কী হচ্ছে মানে?

—শুনলাম, তোমাদের বাড়িতে কথা বলতে, বোঝাতে এই গ্রামের সজ্জন কিছু লোক গিয়েছিল। তাদের উপরে তোমরা নাকি আক্রমণ করেছ?

—মানে স্যার? কিছুই বুঝলাম না। আমাদের বাড়িতে হামলা হল। ওরা কী করে চোট পেল, কে জানে!

—আচ্ছা, চালাকি হচ্ছে, দেখাব? —বলে দেখি, দিগম্বরবাবু একজনকে ঘরে ডেকে নিলেন।

এ লোকটাকে দেখিনি আগে। তবে কাল রাতে নির্ঘাত ওই দলে ছিল।

লোকটা দেখি, কাঁদো কাঁদো মুখে জামা খুলে দাঁড়াল। সারা গা লাল হয়ে ফুলে গেছে। সত্যি এরকম কখনো আগে দেখিনি।

—কী করে হল? কী করেছিলে? স্বীকার না করলে কীভাবে সব কথা আদায় করতে হয়, সে আমি জানি।

—জানি না। মনে হচ্ছে তো কাঠপিঁপড়ের কামড়।

লোকটা হাউমাউ করে বলে উঠল, উফফ সে কী যন্ত্রণা, কী বোঝাব। একশোটা একসঙ্গে। নির্ঘাত এরাই কিছু করেছে। আমাদের গায়ে ছেড়ে দিয়েছে।

বলে উঠলাম, স্যার, আপনি কোনোদিন শুনেছেন, কাঠপিঁপড়ে পোষ মানে!

—হ্যাঁ, তা ঠিক। তা হয় না। সেরকম ঠিক শুনিনি।

—তাহলে আমি কী করে ওদের পোষ মানাব বলুন? আর আমিও তো সেখানেই ছিলাম, যখন ওরা সব শান্তভাবে এসে বোঝাচ্ছিল। আমাকে কেন কামড়াল না বলুন? কাঠপিঁপড়ে কি লোক দেখে কামড়ায়! আমি নিজেও বুঝতে পারছিলাম না যে ওরা কাল মাঝরাতে এসে বোঝাতে গিয়ে তারপরে ওরকম নাচ শুরু করল কেন!

—হুম। যাক গে, আমি কিন্তু আমার এখানে অন্যায় কিছু বরদাস্ত করি না। যদি দেখি, এর পিছনে তোমার কোনো হাত আছে, তাহলে ছেড়ে দেব না। চামড়া খুলে নেব।

বুঝলাম, এবারে সরাসরি সত্যিটা বলার সময় এসেছে।

বলে উঠলাম, কিন্তু আপনি তো অন্যায়ের সমর্থনই সমানে করছেন। আমাদের ভয় দেখিয়ে বাড়ি থেকে বার করে দেওয়া হচ্ছে, বাড়িতে আগুন লাগানোর চেষ্টা হচ্ছে, সেটা জেনেও সে বিষয়ে আপনি তো কোনো কিছুই করছেন না। এরা কারা, এরা কাদের দলের লোক, এরা কী ধরনের কাজ করে, তা আপনি ভালোই জানেন। এটাও জানেন যে গত কয়েক বছর ধরে এখানে যেসব নানান অসামাজিক কাজ হচ্ছে, তাতে এরাই যুক্ত আছে। কোনো ব্যবস্থা নিয়েছেন এদের বিরুদ্ধে?

—চোওওওপ, চোওওওপ— দিগম্বরবাবু দেখি, উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন।

সেই চোখরাঙানি অগ্রাহ্য করে বলে উঠলাম, এখানে যে বর্ডারের ওধার থেকে অন্যায়ভাবে ড্রাগ, সোনা, মেয়ে চালান আসে, এখানে বেআইনিভাবে বোমা তৈরি হয়, এগুলো তো কোনোদিন থামানোর চেষ্টা করেননি। সবাই আপনার কাছে জানিয়েও পুলিশের কাছে কোনো সাহায্য পায় নি।

দিগম্বরবাবু যেন কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলেন না রাগে। চোখ আরও লাল হয়ে উঠল। ফ্যাসফেসে গলায় বলে উঠলেন, খুব বাড় বেড়েছে দেখছি। আমাকে চেনো না। কাদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে, ভাবতেও পারবে না। এমনভাবে পা ভেঙে দেব যে ক্র্যাচ নিয়েও হাঁটতে পারবে না। এখানে অনেকে বীরত্ব দেখাতে এসে রাতারাতি হারিয়ে গেছে, তা জানো তো!

—হ্যাঁ, সে জানি। রহিমকাকা, বাসুদেবদার মতো লোকেরা যারাই এসব অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছে, তাদের কিছুদিন পরে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। আপনাদের দায়িত্ব তো আমাদের রক্ষা করা। ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা। সেখানে আপনাদের মতো অসৎ পুলিশের জন্যই আমাদের গ্রাম ছাড়তে হয়।

দিগম্বরবাবু মনে হয়, রাগে কী করবেন বুঝে না পেয়ে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। যেকোনো সময়ে মনে হল, ফেটে পড়তে পারেন রাগে।

আমিও আর দাঁড়ালাম না।

ক্র্যাচ নিয়ে সোজা থানা থেকে বেরিয়ে এলাম। প্রথমবার মনে হল, আমি যেন কোনো কিছুর ভরসা ছাড়াই হাঁটতে শিখে গেছি।

১৩

৩ জুন

যতই মুখে বলি-না কেন, আর এ গ্রামে থাকার ইচ্ছে ছিল না। এভাবে ভয়ে ভয়ে এদের বিরোধিতা করে কতদিন থাকা যায়? বাবাও এখন পুরোপুরি শয্যাশায়ী। কবে চলে যাবে, কে জানে!

লোকে অনেক কথা মনে রাখে না। দশ বছর আগে রাজু আমাকে দিয়ে গিয়েছিল পাল বংশের গুপ্তধনের হদিশ।

এই গ্রামেই লুকোনো ছিল রাজা রামপালের সম্পদ। দুটো মোহর ভরতি ঘড়া। এইসব খারাপ লোক যখন এখানে প্রথম আসতে শুরু করল, তখন তারা এসেছিল এসব গুপ্তধনের সন্ধানেই।

ওদের কাছে ছিল এই গুপ্তধনের হদিশ, যা সাংকেতিক ভাষায় লেখা ছিল।

রাজুকে ওরা ধরে নিয়ে যায়। ওরা খবর পেয়েছিল যে রাজু যেকোনো সংকেত উদ্ধার করতে পারে। কিন্তু রাজু কখনো অন্যায়কে সমর্থন করে না। সেজন্য ওর উপরে অনেক অত্যাচার করলেও ওদেরকে এই সংকেতের অর্থ উদ্ধার করে দেয়নি। শেষে ওরা ভাবে যে ও বোধহয় এই সংকেত উদ্ধার করতে পারবে না। অনেক মারধরের পরে ছেড়ে দেয়।

ও কিন্তু জানত, সেই গুপ্তধন কোথায় আছে। ও সেটা উদ্ধার করতে পেরেছিল। আমাকে সেটা জানিয়ে যায়। আমি সেই গুপ্তধন উদ্ধার করে সরকারের হাতে তুলে দিই। সেই টাকাতে এখান থেকে কিছু দূরে একটা হাসপাতাল হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কোথায় কী! দশ বছরেও সে হাসপাতালের কাজ শেষ হয়নি। সে টাকার একটা বড়ো অংশ খারাপ লোকেদের হাতেই শেষে চলে গেছে। যেজন্য এত কষ্টস্বীকার করে রাজু ওদের বলেনি, সেই উদ্দেশ্যই শেষে সফল হয়নি।

সেটা হলে বা তার থেকে কিছু মোহর রেখে দিলে, আজ আমার বাবাকে কোথায় কীভাবে চিকিৎসা করাব, সেটা নিয়ে এত ভাবতে হত না।

এসব ভেবে মন আরও খারাপ হয়ে গেল। এক-একটা দিন বাবা আরও মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ডাক্তার বলেছিল, ঠিক চিকিৎসা হলে সুস্থ করে তোলা সম্ভব। কিন্তু কোথায় পাব এত টাকা!

আমার মন খারাপ হলে পুকুরধারে গিয়ে বসি।

সেটাই করলাম আজও। পুকুরধারে বসে ছিলাম। হঠাৎ দেখি, মোহনকাকু খুব জোর পায়ে আমার দিকে আসছে। চোখে-মুখে ভয়।

আমাকে দূর থেকে ডেকে বলে উঠল, শিগগির দোকানে যা। ওরা তোদের দোকানে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে যতটা পারলাম, জোরে এগোলাম দোকানের দিকে।

কিন্তু কাছে গিয়েই থমকে দাঁড়ালাম। আগুন জ্বলছে পুরো দোকান ঘিরে।

অনেক চেষ্টার পরে যখন আগুন থামল, তখন সব শেষ। পুড়ে শেষ হয়ে গেছে দোকান। দোকানের সব জিনিসপত্রও।

আর আমাদের কিছুই রইল না। জানি না এসব ধারে কেনা জিনিসের দামই বা শোধ দেব কী করে। চুপ করে অনেকক্ষণ বসে রইলাম দোকানের সামনে। শুধু যেন কঙ্কাল পড়ে আছে।

আমি আর থানায় গেলাম না। জানিয়ে কী লাভ? অনেকক্ষণ পরে বাড়ি পৌঁছে বাবাকে কিছু বললাম না। এ খবর জানলে বাবা আরও ভেঙে পড়বে। বলা যায়, আমাদের আজ থেকে আর

কোনো সহায়সম্বল থাকল না। আগামীকালও এখন সম্পূর্ণ অনিশ্চিত।

বাড়িতে বেশিক্ষণ থাকতে পারলাম না। বাবা হয়তো ভাববে, দোকান যাচ্ছি না কেন। সেজন্য বিকেলে বেরোব, ঠিক সে সময় একটার পর একটা কান-ফাটানো আওয়াজ। শুধু একবার নয়, বার বার। যেন কেউ বার বার বোমা ফাটাচ্ছে।

আওয়াজটা আসছিল গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকে। বোমা তৈরির ফ্যাক্টরিতে কীভাবে জানি আগুন লেগে গেছে। একই সঙ্গে ফ্যাক্টরিতে যেসব বোমা মজুত ছিল, সেগুলো ফাটতে শুরু করেছে। লোক ছুটোছুটি করছে।

দেড় ঘণ্টার পরে সব শান্ত হল। দেখলাম, ওদিকের আকাশ যেন ধোঁয়ায় ছেয়ে গেছে।

রাতের দিকে পুরো খবরটা পেলাম। কীভাবে আগুন লাগল, এতগুলো বোমা বিস্ফোরণ হল, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

এর মধ্যেই এক বিশেষ উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন সরকারি তদন্তদল আমাদের গ্রামে এসে পৌঁছেছে।

তারা আমাদের গ্রামের হেবো, হেবোর দলের অনেক লোকজন ও আরও এসবের পিছনে থাকা বড়ো বড়ো পান্ডাকে অ্যারেস্ট করেছে। দুজন বড়োমাপের নেতাকেও নাকি এসবের জন্য কলকাতা ও বর্ধমান থেকে অ্যারেস্ট করেছে। সরকারি তদন্তকারী সংস্থার কাছে নাকি এদের সব অপরাধের তথ্যপ্রমাণও আছে।

শুনলাম, এই গ্রাম থেকেই কোনো একজন এই সরকারি তদন্তকারী সংস্থার কাছে এসব জানিয়েছিল। শুধু জানিয়েছিল তা-ই নয়, এদের সব কর্মকাণ্ডের তথ্যপ্রমাণও তুলে দিয়েছে। আর এই বেআইনি বোমা ফ্যাক্টরিতে বিস্ফোরণের জন্য সেটা আরও সবার কাছে, এমনকী মিডিয়ায় কাছেও পৌঁছে গেছে।

অনেকের ধারণা, সেই ব্যক্তি হলাম আমি। আমার জন্যই সরকারি তদন্তকারী সংস্থা খবর পেয়েছে।

আমি নিজে অবশ্য বুঝতে পারছিলাম না যে রাজু এত তাড়াতাড়ি এসব কী করে করল।

আমরা এখন এই গ্রামেই থাকতে পারব। তবে সবকিছু আবার করে শুরু করতে হবে। আমাকে পারতেই হবে।

আকাশের দিকে তাকালাম। রাত হয়ে আসছে। কিন্তু তবু যেন আজ অনেক বেশি আলো।

১৪

৪ জুন

পুকুরধারে বসে ছিলাম। গোধূলির কমলা আলো এসে পড়েছে সামনের গাছের মাথায়। কমে-আসা আলোয় আলো-আঁধারির খেলা শুরু হয়েছে।

এতদিন বাদে শান্তি। একই সঙ্গে এত আনন্দ আগে কখনো পাইনি।

এসবই ভাবছিলাম। হঠাৎ দেখি, কিছু দূরে কে যেন এসে দাঁড়িয়েছে। রাজু?

চেঁচিয়ে ডেকে উঠলাম।

—রাজু? কোথায় ছিলিস এতদিন? আগে দেখা করিসনি কেন?

ও দেখি, চুপ করে পাশে এসে বসল। ওর হাতে একটা ডায়েরি।

আস্তে আস্তে বলে উঠল, খুব ভালো লাগছে, তা-ই না! দেখলি, কত সহজে সব ক'জন ধরা পড়ল। একটা ফুটোনৌকো ডোবানোর জন্য বড়ো ঝড়ের দরকার হয় না। আপনা থেকেই ডোবে।

সায় দিয়ে বলে উঠলাম,কী যে আনন্দ হচ্ছে। এসব খারাপ কাজ যে বন্ধ করা গেছে, এর থেকে ভালো আর কী হতে পারে!

—শোন, যেজন্যে এলাম। তোকে শুধু একটা জিনিস দিয়ে যেতে চাই। এটা আমার লেখা ডায়েরি। এতে তোর আর আমার অনেক ছোটোবেলার কথাই লেখা আছে। আর এর মধ্যে সাংকেতিকভাবে লুকিয়ে রাখা আছে একটা খুব বড়ো গুপ্তধনের হদিশ। আসলে পাল বংশের প্রায় সব ধনরত্নই কিছু দূরের একটা গ্রামে লুকিয়ে রাখা আছে। আগের বারে যা পেয়েছিলাম, সেটা এর তুলনায় কিছুই নয়। তবে এটা সাংকেতিক ভাষায় লিখেছি। শুধু তুই এটা উদ্ধার করতে পারবি। অন্য কেউ পারবে না।

হেসে ফের বলে উঠল, ভাবছিস, সরাসরি জানাতেই তো পারতাম, তা-ই না! কিন্তু আমি চাই, তুই এই সংকেতের জগৎকে একটু একটু করে বুঝতে শিখিস। তাহলে আমার সঙ্গেও সহজে যোগাযোগ করতে পারবি। পড়ে দেখ।

হাতে নিয়ে খাতাটা পড়তে শুরু করলাম। রাজুর মুক্তোর মতো হাতের লেখা। কিছুটা পড়ে বলে উঠলাম এসব সংকেত আমি উদ্ধার করতে পারব না।

—আহা, চেষ্টা করেই দেখ-না। এত সহজে ছেড়ে দিলে হয়?

আবার কিছুটা পড়লাম। মিনিট পাঁচেক। এবারে মনে হল, কিছুটা বুঝলাম।

—এর মধ্যে কিছু বানান ভুল আছে। তুই তো কখনো বানান ভুল করিস না!—অবাক হয়ে বলে উঠলাম।

—ঠিক বলেছিস। আর কিছু লক্ষ করলি?

—আর মনে হচ্ছে, কিছু জায়গায় যা লিখেছিস, যেমন ধর ওই একসঙ্গে কালীপুজোর সময়ে চকোলেট বোমা ফাটানোর কথা, সেরকম কিছু তো আমরা কখনো করতাম না। আমরা

দুজনেই শব্দবাজি পছন্দ করতাম না। তুই এরকম লিখলি কেন? নিশ্চয়ই এর মধ্যেও কিছু সংকেত আছে, তা-ই না!

—এই তো গোপনীয় কোড বা সাইফার বুঝতে শিখে গেছিস। ঠিক বলেছিস। দেখ এটা অন্য কারো পক্ষে বোঝা বা জানা সম্ভব নয়। শুধু আমি বা তুই এটা জানি। যেসব শব্দে দেখবি, এরকম বানান ভুল আছে, আর যেসব জায়গায় আমার আর তোর ছোটোবেলার কথা ভুল লেখা আছে, সেসব শব্দের মধ্যেই এই গুপ্তধনের সন্ধান আছে। আরও কী কী করতে হবে তা তুই জানিসই। তুই এটা রাখ। আমি জানি, তুই এটা উদ্ধার করতে পারবি। তোর কাছে এই গুপ্তধন থাকলে, আমি নিশ্চিত যে সেটা সবার ভালো কাজে লাগবে।

—কিন্তু আমার আর নিজের টাকার কী দরকার আছে!

ও হেসে উঠল। বলে উঠল, তোর যে দরকার নেই, কোনোদিন দরকার হবে না, তা আমি জানি। তুই এটা দিয়ে এই গ্রামে একটা ভালো স্কুল করিস। একটা কেন, আমার ধারণা, বেশ কয়েকটা ভালো স্কুল হতে পারে এর টাকায়। ভালো পরিবর্তনের জন্য শিক্ষার থেকে বড়ো শক্তিশালী আর কিছু হয় না।

আর তোর নিজের দরকার না হলেও মেসোমশাইকে তুই আবার ওই হাসপাতালে নিয়ে যাস। ওখানে এবারে আর তোর ভরতি করতে অসুবিধে হবে না। আমি সেসব ব্যবস্থা করে এসেছি। শুধু তোকে গিয়ে এবারে তোর আর মেসোমশাইয়ের পরিচয়পত্র দেখাতে হবে।

—মানে? সেটা আবার কীভাবে করলি?

—কেন, আমার কি টাকা নেই!—বলে একটু থেমে ফের বলে উঠল, আমাকে চলে যেতে হবে। তুই কিন্তু নিজের উপরে সব সময় ভরসা রাখবি। প্রকৃতির যেকোনো সুন্দর কিছুই কিন্তু তোর মতোই পারফেক্ট নয়। সেটা খেয়াল করেছিস? আমরা কোনো গাছ দেখে যখন খুব সুন্দর বলি, তখন দেখবি সে গাছটা অন্য সব গাছের থেকে অন্যরকম, ঠিক তোর মতোই অন্যরকম, সবার থেকে আলাদা। আর চিন্তা করিস না। মেসোমশাই ঠিক সুস্থ হয়ে যাবেন। কালকেই ভরতি করে দিস।

আমার গলা অবরুদ্ধ হয়ে এল। যাক, এবারে তাহলে বাবার চিকিৎসা করা যাবে। কী চিন্তার মধ্যে ছিলাম। কী করে ও জানল এতো কিছু!

—কিন্তু তুই কবে ফিরে আসবি এখানে?

ও দেখি একটু উদাস হয়ে গেলো। তারপরে বলে উঠল, আমি আসলে যেখানে আছি, সেখান থেকে ইচ্ছেমতো ফিরে আসা যায় না। কিন্তু মনে রাখবি, আমি তোর সঙ্গে আছি। আজ আসি। তোকে ওই ডায়েরিটা দিতেই এসেছিলাম।

একটু থেমে ও আস্তে আস্তে ফের বলে উঠল, জানিস, সব সংকেত আমি উদ্ধার করতে পারি। কিন্তু এখনও আমার মায়ের রাখা সেই রুমালের নকশা উদ্ধার করতে পারিনি। ফাদার যখন আমাকে পেয়েছিল, আমার পাশে যে রুমালটা পাওয়া গিয়েছিল, সেই রুমালের নকসা। আজও কিন্তু আশা ছাড়িনি। যখন ওই সংকেত উদ্ধার করতে পারব, তখনই হয়তো খুঁজে নিতে পারব আমার মা-কে। পারতেই হবে। ভালো থাকিস। আর পারলে একবার ও.সি.-র সঙ্গে দেখা করিস।

—কেন? উনি তো একেবারে খেপে আগুন হয়ে আছেন আমার উপরে। সব সাঙ্গোপাঙ্গ ধরা পড়ে গেছে। সব বাড়তি রোজগারের উপায় বন্ধ হয়ে গেছে।

—আহা, গিয়েই দেখ-না। বলেছিলাম না আমার বন্ধু অ্যালিয়েনরা সবাই খুব শান্ত। সম্পূর্ণ ননভায়োলেন্সে বিশ্বাস করে। তবে ওরা চাইলে অনেক কিছুই করতে পারে। ঠিক যেমন তোর জন্য তোর পছন্দমতো জগৎ তৈরি করেছিল। গত পরশু বোমার ফ্যাক্টরির লোকেদের জন্য কালীপুজোর পরিবেশ তৈরি করেছিল, যাতে ওদের মনে হয় ওইসব মারাত্মক বোমা হল সামান্য শব্দবাজি। এখন ওরা ওই দিগম্বরবাবুর জন্য আবোল-তাবোলের জগৎ তৈরি করে দিয়েছে, যেখানে উনি পড়ে থাকবেন দিনের পর দিন, মাসের পর মাস।

—মানে?

—গিয়েই দেখ-না। যাই। আবার কোনোদিন দেখা হবে। আমার টাইম ফুরিয়ে এসেছে। —বলে রাজু উঠে দাঁড়াল। তারপরে দ্রুতপায়ে পুকুরের পাশ দিয়ে আবার কোথায় উধাও হয়ে গেল।

আমাকে থানা অব্দি যেতে হল না। পথেই দিগম্বরবাবুর সঙ্গে দেখা হল। দেখি, আমাকে প্রায় লক্ষ না করেই পাশ দিয়ে হাত তুলে বলতে বলতে চলেছেন—

আয় রে ভোলা খেয়াল-খোলা
স্বপনদোলা নাচিয়ে আয়
আয় রে পাগল আবোল-তাবোল
মত্ত মাদল বাজিয়ে আয়।

তারপরে একটু থেমে আবার হাত তুলে নাচতে নাচতে বলে উঠলেন—

আয় যেখানে খ্যাপার গানে
নাইকো মানে নাইকো সুর।
আয় রে যেথায় উধাও হাওয়ায়
মন ভেসে যায় কোন সুদূর।

নাচতে নাচতে কোথায় যেন চলে গেলেন।

২৫ জুলাই ২০২২

কেনিলওয়ার্থ, ইংল্যান্ড

আমার বন্ধু ঋক

১

প্রথম আলাপ

গোলবাড়ির পাশের মাঠে ফুটবল খেলা হয়। সেখানেই যাচ্ছিলাম। পথে 'দত্যির মাঠ' পড়ল। সন্ধের পর থেকে এই মাঠে আমরা কেউ আসি না। এখানে নাকি বেশ কয়েকবার ব্রহ্মদৈত্য দেখা গেছে। সেই থেকে এই মাঠের নাম 'দত্যির মাঠ'। এখন সেখানে দুপুরবেলায় চড়কের মেলা বসেছে। চারদিকে প্রচুর লোকের ভিড়।

মাটির পুতুলের দোকান, নাগরদোলনা। কোথাও জিলিপি বিক্রি হচ্ছে, কোথাও বেলুন ফাটানোর লক্ষ্য পরীক্ষা হচ্ছে। এসবের মধ্যে হঠাৎ একটা জায়গায় খুব ভিড় দেখে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

একটা ছোটো ছেলে, আমার থেকেও ছোটোখাটো চেহারা, দুপুর রোদে মাঠের মধ্যে পাগলের মতো দৌড়োচ্ছে। মাথা ভরতি ঝাঁকড়া চুল। চারধার দিয়ে গোল করে দাঁড়িয়ে-থাকা লোকজন—ছেলে-বুড়ো সবাই ওকে লক্ষ করে বল ছুড়ছে। যেন মারতেই হবে। দু—একজন দুষ্টু-ছেলে আশপাশে পড়ে-থাকা নুড়িপাথরের টুকরোও ওকে লক্ষ করে ছুড়ে মারছে।

কোনো দোষ করেছে ছেলেটা? তা না হলে সবাই এভাবে মারবে কেন? কাছেই বা এগিয়ে যাচ্ছে না কেন?

পরে বুঝলাম এটাও একটা আজব খেলা। যে যে খেলতে চায়, তাদের টাকা দিয়ে বল নিতে হয়েছে। ক্রিকেটের ক্যাম্বিসের বল। কুড়িজন একসঙ্গে খেলতে পারে। সবার তাতে ভারী আগ্রহ।

ছেলেটা অদ্ভুতভাবে সবার ছুড়ে-মারা বল কাটিয়ে, কখনো লাফ দিয়ে বা কখনো মাটিতে শুয়ে পড়ে, কখনো দারুন জোরে ছুটে, স্পিড বাড়িয়ে-কমিয়ে, কখনো বা নানান শারীরিক কসরত করে শূন্যে ডিগবাজি খেয়ে, সেসব এড়িয়ে যাচ্ছে। কেউ যে এরকম করতে পারে তা না দেখলে ভাবা যায় না। মনে হয় যেন খুব বড়ো কোনো জিমন্যাস্ট খেলা দেখাচ্ছে। প্রায় দশ মিনিট বাদে যখন সবার বল ফুরিয়ে গেল, তখন ও থামল। একজনও ওর গায়ে বল দিয়ে মারতে পারেনি। যদি কোনো একজন মারতে পারত, তাহলে ওকে সবার টাকা ফেরত দিয়ে দিতে হত।

সবাই হাততালি দিচ্ছিল। বিশেষ করে যারা বল ছোড়েনি।

যারা যারা খেলা দেখছিল, তারাও কিছু কিছু টাকা দিচ্ছে। ছেলেটা ও একটা লোক সবার কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করছে। আমার কাছে একটা কুড়ি পয়সা ছিল। হজমি খাব বলে রেখে দিয়েছিলাম। এত ভালো লেগেছিল যে এগিয়ে গিয়ে ছেলেটাকে দিলাম। আমার বয়সি বা আমার থেকেও কিছুটা ছোটো হবে হয়তো। আমার তখন দশ বছর বয়স।

কথা হয় নি সেদিন।

সেই আমার প্রথম দেখা ঋককে। তখনই যেন মনে হয়েছিল ও বাকি সবার থেকে আলাদা। অন্যরকম। ওর মধ্যে এমন কিছু ক্ষমতা আছে, যা আর কারো মধ্যে নেই।

২

একসঙ্গে স্কুলে

এর প্রায় এক বছর বাদে আবার হঠাৎ করে দেখা। আমাদের স্কুলে ক্লাস সিক্সেও ভরতি হয়েছিল। প্রথমে অবশ্য আমি চিনতে পারিনি।

একটা দিনই তো দেখা।

প্রথম দিনে আমার পাশে এসে বেঞ্চিতে বসেছিল। আমার দিকে তাকিয়ে ফিক করে হেসে আমাকে বেশ অবাক করে বলে উঠল, মনে পড়ে? আমার খেলা দেখে তুমি আমায় কুড়ি পয়সা দিয়েছিলে।

ও আরেকটু মনে করাতে খেয়াল করতে পারলাম। সেদিনের সেই মেলার ছেলেটা। সে এখানে কী করছে? চোখে-মুখে সেদিনের মতোই সারল্য। গভীর চোখে অজস্র প্রশ্ন।

আমি একটু লজ্জা পেয়ে বলে উঠলাম, আমার কাছে তো আর টাকা ছিল না।

ও তাড়াতাড়ি বলে উঠল, না, না, আমি সেজন্য বলিনি। কুড়ি পয়সাই বা ক-জন দেয়।

—তুমি এখনও খেলা দেখাও?

—হ্যাঁ, তা না হলে আমাদের চলবে কী করে?— খুবসহজ ভাবে বলল ও।

—কিন্তু তোমার মেমারি তো খুব ভালো? কী করে মনে থাকল, আমি কী দিয়েছিলাম? কতদিন আগের কথা!

ও বলে উঠল, আমার সব মনে থাকে। আপনা থেকেই। সেজন্যেই লাইব্রেরিদাদু এখানে পড়তে আসতে বলল।

—তোমার নাম কী?

—ঋক।

ওর থেকেই শুনলাম, এর আগে ও নাকি স্কুলেই পড়েনি। বাড়িতে পড়াশোনাও করেনি। লাইব্রেরিতে গিয়ে রোজ নানান বই ওলটাত। কিছুদিন আগে আমাদের গ্রামের লাইব্রেরিয়ান মোহিতকাকু নাকি ওকে স্কুলে ভরতি হতে বলেন। আর তারপরেই এখানে এসে ভরতি হয়।

—কিন্তু একেবারে ক্লাস সিক্সে ভরতি! পারবে?

ও খুব সরল চোখে আমার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে বলে উঠল, চেষ্টা করব। তুমি না হয় আমাকে বলে দেবে, কী করতে হবে। আমাদের বাড়ির কেউ আগে স্কুলে পড়েনি। মা বলল, বেঞ্চির উপরে বসে হাতে বই নিলে নাকি বুদ্ধি খুলে যায়।

খুব অবাক হয়েছিল শুনে।

জিজ্ঞেস করেছিলাম, সে কী, তোমার বাবা-মা-ও স্কুলে পড়তে বলেনি?

ও বলে উঠল, বাবা নেই। অনেকদিন মারা গেছে। মা আছে। তবে ওরাও কেউ পড়েনি। ওদের স্কুলে ঢুকতে দেওয়া হত না। তাই জানেও না ঠিক স্কুলে কী হয়!

এরকমও কেউ থাকে, যারা জানে না স্কুলে কী হয়।

এখানে বলে রাখি, আমি যেখানে থাকতাম, সেটা খুব বড়ো শহর ছিল না। বজ্রধরপুর মফসসল শহর। বেশির ভাগ লোকজনই কলকাতায় কাজ করতে যায়। তা ছাড়া এখানে বেশ কিছু ছোটো লোহালক্কড়ের কারখানা আছে। সেখানেও বেশ কিছু লোক কাজ করে।

এখানে আমাদের দুটো স্কুল আছে। এটা ছেলেদের। আরেকটা মেয়েদের স্কুল আছে। ভালোই রেজাল্ট হয় এই দুটো স্কুল থেকে।

কিছুদিন বাদেই বুঝলাম ও অসম্ভব মেধাবী। আমি ওকে দেখাব কী, ও ই আমাকে দেখিয়ে দেয়। তবে ক্লাসে খুব কম কথা বলে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো টিচারদের প্রত্যেকটা কথা শব্দ শুনতে থাকে। আর শুরু থেকে শেষ কী কী বলেছে, সব মনে রেখে দিতে পারে।

অন্যদের সঙ্গে মেশে না তেমন। যেন ইচ্ছে করেই সবার থেকে দূরে সরে থাকে। হয়তো অন্যদের দিক থেকেও খানিকটা একই রকম প্রবণতা ছিল ওকে এড়িয়ে চলার।

এমনকী আমাদের সঙ্গে খেলাধুলোও করে না তেমন। স্কুল শেষের পরেই বাড়ি চলে যায়। সারাক্ষণ একটা ছোটো চামড়ার স্যুটকেস নিয়ে ঘোরে। অনেকেই হাসাহাসি করে ওটা দেখে। আমি একবার জিজ্ঞেস করতে কোনো দ্বিধা না করেই বলেছিল যে ওর মা নাকি কোনো জঞ্জালের স্তূপে খুঁজে পেয়েছিল ব্যাগটা।

শুধু আমার সঙ্গেই যা একটু কথা বলত। সব কথার স্পষ্ট উত্তর দিত। সে উত্তর শুনে আমি যতই অবাক হই-না কেন।

সবাই কেন ওকে এড়িয়ে চলে, সে কারণটা অবশ্য পরে বুঝেছিলাম।

৩

একটু একটু করে বন্ধু হয়ে ওঠা

আমাদের এই বজ্রধরপুরে নানান ধরনের লোক থাকে। খুব বড়োলোকও যেমন আছে, তেমনই বেশ খারাপ অবস্থা—সেরকম লোকও আছে। তাদের ছেলেরাও এই স্কুলে পড়ে। আমরা সবাই একসঙ্গে মিশি, গল্প করি। কে কোন পরিবার থেকে এসেছে, কীরকম অবস্থা, সেসব আমরা কেউ জানি না।

কিন্তু তারপরেও প্রথম দিন থেকেই যেটা আমাকে অবাক করত, তা হল ঋকের সঙ্গে কেন জানি কেউ কথা বলে না। এড়িয়ে যায়। আর ও লাস্ট বেঞ্চির এককোণে গিয়ে বসে। আমি ছাড়া পাশে কেউ বসে না।

সুবোধ একদিন বলেছিল আমাকে, খবরদার ওর পাশে গিয়ে বসিস না। খুব নোংরা ওরা। ওরা কী করে, জানিস?

—কী আবার করে? তাতে আমার কী এসে যায়?

—এসে যায়। ওরা মেথর। নর্দমা, বাথরুম, পায়খানা পরিষ্কার করে। ভাবতে পারিস। ইসস, ছি! তোর গায়েও পাঁকের গন্ধ হয়ে যাবে।

আমি সেদিন থেকেই আরও ইচ্ছে করে ওর পাশে গিয়ে বসতে শুরু করলাম। কেন জানি, আমার খুব খারাপ লাগত ওর কথা ভেবে। একটা লাস্ট বেঞ্চির এককোণ ঘেঁষে বসত। মনে হত, ওর যেন অন্যদের কাছে কোনো অস্তিত্বই নেই।

এমনকী যখন টিফিন হত বা স্কুল শেষ হত, ও একা একাই থাকত। আমাকেও জোর করে ওর সঙ্গে কথা বলতে হত। তখন আমরা দুজনে বসে গল্প করতাম।

অনেক সময় বেশ বুঝতে পারতাম, ও শুধু সুবোধের কাছে নয়, অনেকের কাছেই অস্পৃশ্য। এটা নিয়ে অবশ্য ওর কোনো আপত্তি ছিল না। যেন মেনেই নিয়েছিল। তবে দু-একজন শিক্ষক ছাড়া সবাই ওকে ওর শান্ত-ভদ্র স্বভাবের জন্য স্নেহ করত, ভালোবাসত।

তবে সবাই সমান ছিলেন না। স্কুলে যখন সরস্বতীপুজো হল, তখন পুজোর দায়িত্বে ছিলেন আমাদের অঙ্কের শিক্ষক বিধুবাবু। উনি ওকে ডেকে বলেই দিলেন পুজোর ঘরে না ঢুকতে। আমার শুনে এমন রাগ হয়েছিল, আমিও সেবার সরস্বতীপুজোয় যাইনি।

একবার ওর বাবার কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম। ওর চোখ ছলছল করে উঠেছিল। শুধু বলেছিল, ওর বাবা বেশ কয়েক বছর হল মারা গেছে।

কীভাবে জিজ্ঞেস করতে ও আর কিছু বলল না।

কিন্তু সেটা জেনেছিলাম দীপ্তেশের কাছ থেকে। একবার ওদের বস্তির কয়েকজনের সঙ্গে এখানকারই এক ক্ষমতাশালী পরিবারের বড়োরকম গণ্ডগোল হয়। তারা ফ্যাক্টরিতে টাকা বাড়ানোর দাবি করছিল।

ওরা নাকি নিচু জাত দলিত হওয়ার জন্য এমনিতেই ওদের উপরে রাগ ছিল। এসব নিয়ে গণ্ডগোল শুরু হয়। ঋকের বাবার সঙ্গে নয়, কিন্তু ওখানকার অন্য কয়েকজনের সঙ্গে।

শেষে বস্তিতে গুন্ডা দিয়ে আগুন যখন লাগানোর চেষ্টা করা হয়, তখন ওর বাবা বাধা দিয়েছিল। তখনই ওরা বাবাকে খুব মারে। আরও দুজনকে মেরেছিল। তিনজনই বাঁচেনি। পুলিশের তদন্তে শেষ অব্দি কেউই ধরা পড়েনি।

কেন জানি, এটা জানার পর থেকেই ঋক আমার আরও আপনার হয়ে উঠেছিল। মনে হত, ওর আর ওর পরিবারের প্রতি যত অন্যায়-অবিচার হয়েছে, সেসব ভুলিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব যেন আমার। এটা আমি জোর করে করতাম না। আপনা থেকেই হত।

ওর এত বন্ধু হয়ে উঠেছিলাম বলেই, ওর কিছু কিছু অন্য ক্ষমতার পরিচয় পাচ্ছিলাম আস্তে আস্তে।

একদিন দেখি, বোর্ডে লেখা কয়েকটা নাম্বার দেখে খাতায় কী সব ছবি আঁকছে। আমাকে দেখিয়ে ও যা বলছিল তা শুনে আমি একেবারে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। ও নাকি প্রত্যেকটা নাম্বারকে ছেলে বা মেয়ে হিসেবে দেখতে পায়। আবার বাংলা ও ইংরেজি শব্দের বিভিন্ন অক্ষরকে রং হিসেবে দেখে। কোনোটাকে লাল দেখে, তো কোনোটা নীল, কোনোটা সবুজ। সেজন্যে ওর কাছে কোনো সংখ্যা বা কোনো বাক্য আসলে নানান রঙের নানান রকমের মানুষের মিছিল। কোনোটা আমার মতো তো কোনোটা সুবোধের মতো।

সেভাবে দেখে বলেই কি না জানি না, সবকিছু এত সহজে ওর মনে থাকে। ওর এই অসম্ভব স্মৃতিশক্তির পরিচয় আমি আগেই পেয়েছিলাম। সে নিয়ে নানান মজার খেলাও খেলতাম নিজেদের মধ্যে। তবে আমার মনে হত, আমি যেমন মনে রাখতে চাই, ও অনেক কিছু জোর করে ভুলতে চায়।

৪

ঋকের আশ্চর্য ক্ষমতা

আমাদের থেকে দু-ক্লাস উপরে পড়ত বাবলুদা। খুব খারাপ ছেলে। গায়ে খুব জোর, কিন্তু বুদ্ধি কম, যেটুকু আছে তা হল দুর্বুদ্ধি। সবার উপরে সারাক্ষণ মাতব্বরি, খবরদারি, গুন্ডামি করে বেড়াত। ক্লাস ফাঁকি দিয়ে নানানরকম বদমায়েশি, নেশা করে বেড়াত।

এখানকার এক বড়োনেতার ছেলে হওয়ায় ওর বিরুদ্ধে কেউ কিছু করারও সাহস পেত না।

এমনকী শিক্ষকরাও ওকে একটু ভয় পেত। একবার কোনো টিচার ওকে ক্লাসে বকায়, সে টিচারকে নাকি সবার সামনে হুমকি দিয়েছিল। তার দশ দিন বাদে সেই টিচারকে স্কুলে যাওয়ার পথে দুজন লোক বেদম পিটিয়ে একটা পা ভেঙে দিয়েছিল। শোনা যায়, তাদের নাকি বাবলুদা ভাড়া করেছিল।

একদিন আমি ও ঋক স্কুলে যাচ্ছি, হঠাৎ দেখি, বাবলুদা আর ওর দুই বন্ধু একটা কুকুরের বাচ্চা ধরে একটা গর্তের মধ্যে ফেলে তাকে ধারালো একটা লোহার শিক দিয়ে খোঁচাচ্ছে। কুকুরের বাচ্চাটা যন্ত্রণায় কেঁউ কেঁউ করে চেঁচাচ্ছে। আর ওরা আনন্দ পাচ্ছে সেটা দেখে। কিছু দূরে আরও দুটো ছোটো কুকুরের বাচ্চা রক্তাক্ত হয়ে মরে পড়ে আছে। মনে হয়, ওরাই মজার জন্যে মেরেছে।

ঋক এগিয়ে গিয়ে কী যেন বলল বাবলুদাদের। তারপর হঠাৎ করে কুকুরের বাচ্চাটাকে নিয়ে ছুটে পালাল। ওরা ছুটল ওর পিছু পিছু। আমিও ছুটলাম। দেখি, কিছু দূরে গিয়ে ওকে ওরা ধরে ফেলেছে। যদিও কুকুরের বাচ্চাটাকে ওর হাতে দেখলাম না। কোথায় চলে গেছে।

পরক্ষণেই দেখি, ওরা তিনজন মিলে ঋকের উপরে সাংঘাতিকরকম খেপে গিয়ে চড়থাপ্পড় মারতে শুরু করল। বাবলু হঠাৎ এর মধ্যে ওর মুখ লক্ষ্য করে একটা ঘুসি মারল। ও মাটিতে পড়ে গেল। এমনভাবে কেন মারল, বুঝতে পারলাম না!

আমি ছুটে গিয়ে পাশে দাঁড়ালাম, বললাম, সব কথা টিচারদের বলে দেব। বলার পর দেখি, আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে ওরা বেরিয়ে গেল। ওরাও বোধহয় ঋকের অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ভেবেছিল, অজ্ঞান হয়ে গেছে বা মারা গেছে।

দেখি, ঋক মাটিতে পড়ে আছে। জামা ছিঁড়ে গেছে।

আমার গায়ে অত জোর নেই, তা না হলে আমার ইচ্ছে করছিল, ওদের গিয়ে মারি।

ওরা চলে যাওয়ার পরে ঋক আস্তে আস্তে উঠে বসল।

দেখি, ঋকের ঠোঁট কেটে রক্ত পড়ছে। ওর যে একটামাত্র স্কুলের জামা, সেটাও ছিঁড়ে গেছে।

—বললাম, তুই এত জোরে ছুটিস, পারলি না পালাতে?

ও এর মধ্যেই হেসে বলে উঠল, সে তো শুধু খেলা দেখানোর সময়।

—মানে?

—সব সময় ওসব দেখাতে নেই।

ওর কথা কিছুই বুঝলাম না।

কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম যে শুধু বাবলু নয়, অনেকেই ওকে নানান কারণে-অকারণে ঘৃণা করে। হয়তো ওরাও ওদের বাবা-মা-র কাছ থেকে এটাই শিখেছে যে ওর সঙ্গে মিশতে নেই। সেটার জন্যই ওরা ওকে এতদূরে সরিয়ে রাখে।

এই স্কুলে ওর মতো আগে কেউ পড়েনি।

এর কয়েক মাস বাদে আরেকটা কাণ্ড হল ঋককে নিয়ে। ও ব্রতীনের টিফিনের খাবার চুরি করে খেয়েছিল। এরকম অনেকেই করে। ব্রতীনের বাবার খুব বড়ো ব্যাবসা। চাল ও আরও অনেক কিছু বিদেশে পাঠায়। অনেক টাকা। ব্রতীনের দেমাক সেজন্য এমনিতেই বেশি। নানান ধরনের খাবার নিয়ে আসে। ও যা খেতে পারে, তার থেকে অনেক বেশি।

যা-ই হোক, ও গিয়ে নালিশ করল হেডস্যারের কাছে। ঋকের ডাক পড়ল। ঋকটা এমন হাঁদা-একবারে স্বীকারও করে নিয়েছিল। নাকি খিদে পেয়েছিল বলে খেয়েছে।

এমনিতে এটা হয়তো খুব বড়ো কিছু ব্যাপার নয়, আমরা অনেকেই এর ওর থেকেখেয়ে থাকি। কিন্তু ও ছোট জাতের বলে এটা নিয়ে সেবারে খুব বড় গণ্ডগোল হয়েছিল। পরের দিন ব্রতীনের বাবা স্কুলে চলে এল।

কিছুক্ষণ বাদে ঋকের ডাক পড়ল। যখন ও বেরোল হেডস্যারের ঘর থেকে, ওর মুখ-চোখ দেখে বুঝলাম, বেশ ভালোরকম বকা খেয়েছে। হেডস্যার বলেছেন, এরকম আবার হলে ওকে স্কুল থেকে বার করে দেওয়া হবে।

আমাকে এসে বলল, না, আমার এটা করা উচিত হয়নি। ওরা স্যারকেও খুব খারাপ খারাপ কথা বলল, আমাকে এই স্কুলে ভরতি করার জন্য। আমাকে দেখিয়ে বলছিল, আমার মতো নিচু জাতের লোকেদের নাকি এখানে পড়তে দিয়ে স্কুলের মান খারাপ করে দিয়েছেন হেডস্যার।

—কিন্তু তুই খেলি কেন চুরি করে?

ও দেখি অম্লানবদনে বলে উঠল, সে তো আমি আগেও অন্যদের থেকে খেয়েছি। তন্ময়, অর্ণব, প্রতীকের থেকে। আসলে যেকোনো খাবার দেখলে আমার খিদেটা খুব বেড়ে যায়। আর করব না। আর হেডস্যারের কাছেও ক্ষমা চেয়ে আসব।

আমি ওকে থামালাম, চুপ চুপ। এ কথা আর কাউকে বলতে হবে না।

৫

কিছুদিন বাদে আমাদের স্কুলে বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ছিল। আমার খেলাধুলো খুব ভালো লাগে। যদিও কোনোটাতেই আমি ভালো নই। আমি দৌড়ে, লং জাম্পে নাম দিলাম।

ভেবেছিলাম, ঋক নাম দেবে। আমি সেইদিনের কথা এখনও ভুলিনি। কীভাবে সবার ছোঁড়া বল এড়িয়ে ঝড়ের গতিতে ছুটে বেড়াচ্ছিল। নিশ্চয়ই ও খুব ভালো ছুটবে।

কিন্তু ও দেখি, কিছুতেই কোনো প্রতিযোগিতায় নাম দিল না। জিজ্ঞেস করতে বলল, ভালো লাগে না।

কিন্তু মনে হল না ঠিক বলছে। দেখি, স্পোর্টসের দিন পুরোটা সময় বসে খুব আগ্রহ নিয়ে সব ইভেন্ট দেখল। খুব উৎসাহ।

আমাদের ক্লাসের সৌমিত বলে একটা ছেলে লং জাম্পে খুব ভালো। সে এমন লাফ দিল যে স্পোর্টসের টিচার রমাপদবাবু পর্যন্ত এসে জড়িয়ে ধরলেন। শুনলাম, স্কুলের বহু দিনের লং জাম্পের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে।

পরের দিন স্কুল-ফেরত বাড়ি যাওয়ার পথে দেখি, ঋক ওখানে একা লাফ দেওয়া প্র্যাকটিস করছে। আমি হেসে বললাম, কী রে, কাল সাহস হল না, আর আজ প্র্যাকটিস করে কী লাভ!

ও হেসে বলে উঠল, আমি আসলে এতে অংশগ্রহণ করলে অন্য কেউ কিছু পেত না। সেজন্যে করিনি।

কথাটা মনে হল, মজা করেই বলছে।

—লাফ দিয়ে দেখাব?

পরক্ষণেই আমি অবাক হয়ে দেখলাম, ও ছুটে এসে গতকাল সৌমিত যা লাফ দিয়েছিল, তার প্রায় দু-গুণ দূরত্ব লাফ দিল।

আমার কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কেউ যে ওরকম লাফ দিতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করতাম না। বলে উঠলাম, তোর তো ভারতের হয়ে লাফানো উচিত। তুই ভারতের হয়ে লাফালে একটা গোল্ড মেডেল ভারত পেয়ে যেত।

ও বলে উঠল, আমার কেন জানি, এরকম প্রতিযোগিতা ভালো লাগে না। আমার মতো যারা আছে, তাদের এমনিতে শুধু বেঁচে থাকার জন্যই রোজকার কত প্রতিযোগিতা, তা-ই না! তার উপরে আবার অন্য প্রতিযোগিতা ভালো লাগে!

আমি সেদিন না বুঝলেও পরে অবশ্য কারণটা বুঝেছিলাম। ও যেন ওর সব ক্ষমতা লুকিয়ে রেখে আমাদের মতো সাধারণ হয়ে উঠতে চায়। ওর এই অসাধারণ ক্ষমতাগুলো শুধু আমার চোখেই ধরা পড়ত। আমি সেটা কারো কাছে প্রকাশ করতাম না। কে জানে, ওর অবস্থাও হয়তো এর জন্য ওর বাবার মতো হতে পারে।

আমি যখন ক্লাস নাইনে, তখন আমার দিদির বিয়ে হল। বাড়ির সামান্য আপত্তি সত্ত্বেও আমি ওকে বিয়েতে আসতে বলেছিলাম। ও এসেছিল। হয়তো ছোটো বলেই তখনও এতটা

বুঝিনি। সেদিন আমি বুঝেছিলাম যে ওকে ডেকে আমি ভুল করেছি। আমাদের সমাজ খুব জটিল। আমাদের মফসসল শহর খুব বড়ো জায়গা নয়। সবাই একে অপরকে চেনে। সেই বিয়ের অনুষ্ঠানের মধ্যেও বুঝতে পারছিলাম যে, ও যে আমার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির মধ্যে সব জায়গায় যাচ্ছে, এটাতে যেন অনেকের একটা অলিখিত আপত্তি আছে। ও যেন এই সমাজে আমাদের সঙ্গে মেশারই উপযুক্ত নয়। সবাই যেভাবে ওকে দেখছিল, তাতে আমারই একরকম অপরাধবোধ হচ্ছিল।

কিন্তু সেদিনই ওর আরেকটা ক্ষমতার পরিচয় পেলাম। সেদিন ওই অনুষ্ঠানে আমার বাবার এক বন্ধুকে দেখে আমাকে জিজ্ঞেস করল, কে হয় রে তোদের?

বললাম আমার বাবার বন্ধু। ব্যাঙ্কে একসঙ্গে কাজ করে।

—তুই তোর বাবাকে সাবধান করে দিস, লোকটা কিন্তু ভালো নয়।

আমি হেসে বলে উঠলাম, তুই কি মুখ দেখে সব বুঝতে পেরে যাস? উনি বাবার ব্যাঙ্কে ব্রাঞ্চ ম্যানেজার। খুব বড়ো অফিসার। ব্যাঙ্কে খারাপ লোক হলে কাজ করতে পারে না।

—কেন জানি, খারাপ লোকেদের আমি ঠিক বুঝতে পারি। কীরকম যেন একটা অন্য রকমের গন্ধ পাই, তারা কাছে এলে। সেই গন্ধ সব লোকের মধ্যেই কম-বেশি থাকে। এই লোকটার থেকে সেরকম একটা জোরালো গন্ধ পাচ্ছি। মনে হয় বেশ খারাপ।

আমি হেসে উঠেছিলাম। কিন্তু কথাটা যে সত্যি, তার পরিচয় পেলাম এক মাস পরে। হঠাৎ বাবার ওই বন্ধুকে পুলিশ ধরেছে। আরও কয়েকজন সহকর্মীকে সঙ্গে নিয়ে কী একটা বড়ো রকমের অপরাধ করেছে ওই কাকু। অনেক গ্রাহকের ফিক্সড ডিপোজিটের টাকা চুরি করেছে। বাবা কিছুই জানত না।

আমি তখন ঝককে ফের জিজ্ঞেস করেছিলাম এ ব্যাপারে। ও খুব সহজ ভাবেই বলে উঠল, খুব ভালো বোঝা যায়। আমি যখন মেলায় তোকে দেখেছিলাম, তখনই জানতাম তুই খুব ভালো। এসব খুব সোজা ব্যাপার বোঝা। শুধু গন্ধটাকে ঠিকভাবে পেতে হয়। কেউ সেন্ট মাখলে ওই গন্ধটা আর পাওয়া যায় না।

৬

অন্য স্কুলে

আমার বাবার ব্যাঙ্কের বদলির চাকরি। ক্লাস টেনে থাকতেই হঠাৎ বদলি হয়ে যেতে হল একটা বড়ো শহরে। তারপরে আরেক শহরে।

খুব খারাপ লেগেছিল ঝককে ছেড়ে যেতে। মনে হচ্ছিল আমাকে ছাড়া ওর পক্ষে এই সমাজে টিকে থাকা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু আমার কিছু করার ছিল না।

যাওয়ার কয়েকদিন আগে ওদের বাড়ি গিয়েছিলাম। ও নিয়ে যেতে চাইছিল না। বলছিল, ওখানে গেলে তোর খুব খারাপ লাগবে। আমরা যেখানে থাকি— খুব নোংরা। বিশ্রী গন্ধ।

আমি বললাম, কিন্তু জায়গাটা দেখে তো রাখতে হবে। ফিরে এসে তোকে তা না হলে খুঁজে বার করব কী করে!

শেষে ও রাজি হল। ওর সঙ্গে গেলাম।

শহরের একদম বাইরের দিকে একটা ঘিঞ্জি বস্তি এলাকা। কিছু দূরে নোংরা ফেলার ধাবার মাঠ। মনে হয়, শহরের সব বর্জ্যপদার্থ যেন সেখানে এসে জড়ো হয়েছে। তার পাশ দিয়ে সরু সরু অলিগলি। অনেক বাচ্চা ছেলে-মেয়ের ভিড়। মনে হয়, কেউই পড়াশোনা করে না। ঋক ব্যতিক্রম।

ওখানে ঢোকামাত্র ঋক যেন একেবারে পালটে গেলো। হাসিখুশি, প্রাণোচ্ছল। বুঝলাম, স্কুলে —এ জায়গার বাইরে ও সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকে। এখানে সবাই ওকে দেখে এগিয়ে আসছে, কথা বলছে। বাচ্চারা ওকে খেলতে ডাকছে। সবাইকে ডেকে ডেকে ঋক আমার পরিচয় করাচ্ছিল ওর বন্ধু বলে।

আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন অন্য কোনো গ্রহের জীব। ভুল করে এসে পড়েছি এখানে। আমার মতো কাউকে আগে ওরা এখানে আসতে দেখেনি। ঋকেরা একটা মাটির ঘরে থাকে।

ঘরে ঢুকে নিচে মাটিতে বসেই গল্প হল। ওর মা আর বোনও থাকে ওর সঙ্গে। আমি কিছুক্ষণ কথা বলেই বুঝলাম এ যেন এক অন্য পৃথিবী, আমার গ্রহের থেকে অনেক অনেক দূরে। প্রায় দু-ঘণ্টা ছিলাম ওখানে।

আমি যেদিন চলে যাচ্ছি শহর ছেড়ে, সেদিনও ঋক আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। গাড়ি ছাড়া পর্যন্ত আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। কান্নায় বুজে আসছিল আমার গলা—আমার সব থেকে বড়ো বন্ধুকে ছেড়ে যাওয়া। ওরও তা-ই, বুঝলাম, ওর মধ্যে যত বড়ো ক্ষমতাই থাকুক-না কেন, ও কান্না চাপতে শেখেনি।

ধরা গলায় আমার হাত জড়িয়ে শুধু বলে উঠল, আমি ঠিক খুঁজে পেয়ে যাব তোকে। খুব ভালো থাকিস।

৭

বেশ কয়েক বছর পরের কথা

ঋকের সঙ্গে ফের দেখা

আজ সকালে কাগজটা খুলে আবার মন খারাপ হয়ে গেল। সরকারি চাকরির যে পরীক্ষা আগামী মাসে হওয়ার কথা ছিল, সেটা আবার ছয় মাস পিছিয়ে গেছে। এতদিন ধরে প্রিপেয়ার

করছিলাম। আগেও একবার আট মাস পিছিয়ে গিয়েছিল। আবারও পিছিয়ে গেল।

দেখতে দেখতে পাঁচ বছর হয়ে গেল। মাস্টার্স করার পরে একের পর সরকারি পরীক্ষা দিয়ে যাচ্ছি। চেষ্টা করছি। কিন্তু পুরো ব্যাপারটা এত দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ, চারদিকে এত দুর্নীতি যে এখন মনে হচ্ছে, শুধু পড়াশোনা করে এই পরীক্ষায় সাফল্য কোনোদিন আসবে না। শুধু যে পরীক্ষাই ইচ্ছেমতো পিছিয়ে যায় তা-ই নয়, পরীক্ষার উপরেও অনেক কিছু নির্ভর করে না। চার বছর আগে যারা কোনো পরীক্ষা দিয়েছে, তাদেরই পুরো প্রসেস এখনও কমপ্লিট হয়নি।

এসব ভেবে এখন আর তাই কারো উপরে রাগ হয় না, মাঝেমধ্যে শুধু বুকের মধ্যে জমাট-বাঁধা চাপা কান্নাটা বেরিয়ে আসতে চায়, যখন এই পথের শেষ কোথায়, তার সন্ধান পাই না। মনে হয়, পুরো জীবনটাই এভাবে চাকরির আশায় কেটে যাবে।

এসব সরকারি পরীক্ষায় নানানরকম অনিয়মের কথা প্রায়শই শুনি। অনেকে অন্যায়ভাবে টাকা দিয়ে চাকরি পেয়েছে এরকম কথাও প্রায়শই শোনা যায়। র‍্যাঙ্ক অনুযায়ী যাদের পাওয়ার কথা, তাদের জায়গায় অন্যরা পেয়েছে। এরকম অনেক তথ্য গত কয়েক মাসে সামনে এসেছে।

আমাদের সংসার বাবার পেনশনেই কোনোমতে চলে। আমার এক বন্ধুর মুখে গতকাল শুনলাম, এসবের প্রতিবাদে কিছু ছেলে-মেয়ে শহরের একটা জায়গায় জমায়েত হবে। আমাকে সে যেতে বলল। আমিও গেলাম সেখানে প্রতিবাদ জানাতে।

গিয়ে দেখি, অনেক ছাত্রছাত্রী জমায়েত হয়েছে শহরের কেন্দ্রে। সবাই আমার মতো। বছরের পর বছর চেষ্টা করে যাচ্ছে। অনেকে বেশ কয়েক মাস ধরে এখানে প্রতিবাদে আছে। সারাদিন বেশ গরম ছিল। তার মধ্যেই সারাদিন ওখানে বসে ছিলাম।

বিকেলে হঠাৎ করে ঝড়বৃষ্টি শুরু হল। সারাদিন খাওয়া নেই। শরীর এই গরমে রোদে খারাপ লাগছিল। উঠে পড়লাম। আমার মনে হয় না এই প্রতিবাদে কিছু হবে। অন্যদের কারো কিছু এসে যায় না।

ফিরছি, হঠাৎ দেখি, দূর থেকে কে যেন ডেকে উঠল—পার্থ।

যেদিক থেকে ডাক এল, সেদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি, একটা রোগা ছোটোখাটো চেহারার লোক আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে। চোখ দুটো খুব উজ্জ্বল। কাঁধ অব্দি ঝাঁকড়া চুল। ঋক।

এত আনন্দ বহুদিন পাইনি। ঋক। কিছুটা পরিবর্তন হলেও একবার দেখলেই চেনা যায়। আমার হাত ধরে সেই আগের ছেলেমানুষি ভাবের সঙ্গেই বলে উঠল, চল, আমার বাড়িতে যেতেই হবে।

—না, না। আজ অনেক রাত হয়ে গেছে। তার উপরে আজ এরকম ঝড়বৃষ্টি। বাড়িতেও চিন্তা করবে।

—ঠিক আছে। তাহলে অন্য একদিন আসতেই হবে। আজকের জন্য তোকে ছেড়ে দিলাম। আজ এখানে কাছাকাছি কোথাও খেতে যাই। তোর বেশ খিদে পেয়েছে, বেশ বুঝতে পারছি। আমার কাছে টাকা আছে।

বুঝলাম, ও ঠিক আগের মতোই সহজ সরল আছে।

আমরা দুজনে কাছের একটা মাঝারি মানের চাইনিজ রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসলাম।

শুনলাম, ও এক বছর হল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে একটা নামকরা আই. টি. কোম্পানিতে কাজ করতে ঢুকেছে। মা-র সঙ্গে থাকে।

আমার সরকারি চাকরি চেষ্টার সব কথা শুনে বলল, তুই আর ক-বছর এসব চাকরির অপেক্ষায় থাকবি? অন্য কিছু করার চেষ্টা কর।

—সবাই তোর মতো সবকিছু পারে না। আমি খুব সাধারণ। তা ছাড়া এত পরিশ্রম করেছি গত চার বছর ধরে এসব পরীক্ষার পিছনে, এখন মনে হয়, ছেড়ে দিলে সব চেষ্টাই জলে যাবে।

—তুই না হয় ব্যাবসা কর।

—চাইলেই কি আর করা যায়! তোর কি আমাকে দেখে মনে হয় যে আমি ব্যাবসা করতে পারব? ভেবেছিলাম, এই সরকারি স্কুলে শিক্ষকের চাকরিটা পাব। বছরের পর বছর চেষ্টা চালাচ্ছি। কিন্তু খবর তো দেখছিসই। সব ব্যাপারে দুর্নীতি। কতজনের জীবন যে এভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, কে জানে। আমার কথা ভেবে ভেবে বাবা-মা-র শরীর খারাপ হয়ে গেছে।

—ওদের শরীর খারাপ?

—বাবা ব্রেন স্ট্রোকের পর থেকেই শয্যাশায়ী। মা-র মাঝেমধ্যে খুব জ্বর আসে। খুব রোগা হয়ে গেছে। অনেক ডাক্তার দেখানো হয়েছে। কেউ ঠিক অসুখটা ধরতে পারছে না।

আমি একটু থেমে ফের বলে উঠলাম,— মাঝেমধ্যে আমার খুব রাগ হয় জানিস। মনে হয় যদি এসব দপ্তরের দুর্নীতিগ্রস্ত লোকদের হাতের কাছে পেতাম। সবকিছু টাকা দিয়ে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, শিক্ষা, যোগ্যতার কোনো দামই নেই। আমি যেন একটা কানাগলির মধ্যে আটকে গেছি। বেরোনোর পথ পাচ্ছি না।

—এদের বিরুদ্ধে কিছু করা অত সহজ নয়। ওসব ভুলে যা। এসব ক্ষমতার কেন্দ্রে বসে-থাকা লোকেদের বিরুদ্ধে তুই কিছু করতে পারবি না।

—তা আমার কথা ছাড়, তোর বাড়ির খবর কী বল। তোর বোনের কি বিয়ে হয়ে গেছে?

ও দেখি, চুপ করে আছে। খানিক বাদে বলে উঠল, গত বছরে আমার বোন কলেজ থেকে ফিরছিল। একটু রাত হয়ে গিয়েছিল। আর ফেরেনি। আমি অনেক দেরি দেখে খুঁজতে বেরিয়ে কোনো খবর পেলাম না। থানায় জানালাম। পরের দিন ভোরে খবর পেলাম। আমার বোনের দেহ কাছাকাছি এক নালায় পাওয়া গেছে। পরে জানা গিয়েছিল—

ও আর কিছু বলল না। আমার বুঝতে অসুবিধে হল না কী হয়েছিল। ওর চোখে যেন একটা আগুন জ্বলে উঠে নিভে গেল।

—পুলিশ এসবের পিছনে যারা ছিল, তাদের কাউকে ধরতে পারেনি?

—শুনেছিলাম, একদল ছেলে একটা নাইট ক্লাব থেকে মদ্যপ হয়ে ফিরছিল। পথে ওকে দেখে ওকে উত্ত্যক্ত করতে শুরু করে। তারপরে ওদের গাড়িতে তুলে নেয়। বেশ কয়েকজন দেখেছিল। কিন্তু কেউ বাধা দিতে সাহস করেনি। লোকাল এক নেতা ইনভলভড ছিল। সেজন্য সাক্ষ্য দেওয়ার লোকও পাওয়া যায়নি।

এসব কথা বলার সময়ে মনে হল, আমাদের পাশের টেবিলে একজন লোক যেন আমাদের কথা শুনছে। লোকটা কে জানে! দুজনেই চুপ করে গেলাম। আমরা বড়ো বেশি সাধারণ। সবেতেই ভয় পাই।

আমরা দুজনেই খাচ্ছিলাম না। মনে হচ্ছিল একটা কিছু করা দরকার। বেশির ভাগ লোক চুপ করে অন্যায় মেনে নেয় বলেই আজ এই অবস্থা।

দেখলাম ওর চোখে জল। আমি ওকে বলে উঠলাম, চল, ওঠা যাক।

উঠতে যাব, দেখি, পাশের টেবিলে বসে-থাকা লোকটা আমাদের দিকে তাকিয়ে বলে উঠে উঠল, কতদিন আর পালিয়ে বেড়াবে নিজেদের থেকে? তোমরা চুপ বলেই শুধু ওদের কথা, খারাপ লোকেদের কথা শোনা যায়।

লোকটা এরপরে আর কোনো কথা না বলে উঠে বেরিয়ে গেল। গায়ের রং বেশ কালো, ছোটোখাটো চেহারা।

আমি বলে উঠলাম, কে লোকটা, চিনিস? পাগল মনে হয়।

—হ্যাঁ, চিনি। হয়তো আমাদের মতো সাধারণ নয় বলেই পাগল লাগছে। আমাদের মধ্যেই থাকে লোকটা। লুকিয়ে থাকে। খুঁজে পাওয়া যায় না।

৮

অজামিল

আজ মন খারাপ সুচিত্রাদেবীর। আজ ওর একমাত্র ছেলের জন্মদিন। কতদিন ছেলেকে দেখেননি। ছেলে আমেরিকায় থাকে। অনেক বয়স হয়েছে ওর। গত বছর আশি পেরিয়েছে।

স্বামী মারা গেছেন বহুদিন। সকাল থেকে মোবাইল ফোনটার যে কী হয়েছে, ফোনও করতে পারছেন না। ফোনও পাচ্ছেন না।

স্বামী মারা গেছে বহু বছর। সল্ট লেকে বিশাল বাড়ি। বহু বছর ধরে সব সময়ের যে কাজের মেয়েটা ছিল, সে গত এক মাস ছুটিতে গেছে। বলেছিল, কয়েক দিনের জন্য যাচ্ছে। কিন্তু ফিরে আর আসার নাম নেই। শেষে কয়েক দিনের জন্য একটা অন্য কাজের মেয়েকে রেখেছেন।

সন্ধে সাতটা নাগাদ বাড়ির কলিং বেলটা বেজে উঠল। কেউ দেখা করতে এসেছে— এটা ভেবে বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। তবু কারো সঙ্গে কথা বলা যাবে। তা না হলে কী আছে এই একঘেয়ে জীবনে?

রাতের সময়টা সল্ট লেক যেন অচেনা শহর হয়ে ওঠে। ভয় লাগে। এমনিতেই চারদিকে এখন যেভাবে চুরি-ডাকাতির ঘটনা বেড়ে গেছে।

কাজের মেয়েটা দরজা খুলতে এগিয়ে গেল।

খুলতেই তিনজন লোক ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। বেশ ষণ্ডা টাইপের লোক। একটা লোক ঘরের মধ্যে ঢুকে এসে প্রথমেই ওর গলার কাছে ছুরি ধরে বলে উঠল, কোনোরকম ট্যাঁ ফোঁ করলে ছুরি চালিয়ে দেব।

কাজের মেয়েটাকে কিন্তু কিছু করল না। একটু বাদেই উনি বুঝলেন, মেয়েটাও ওদের দলে আছে। হয়তো প্ল্যান করেই কাজারে মেয়ে সেজে ঢুকেছিল। মেয়েটা অন্য দুজনকে নিয়ে ঘরের কোথায় কী আছে, কোথায় আলমারির চাবি থাকে— এসব দেখাচ্ছে।

কী হচ্ছে বুঝতে পেরে হঠাৎ উনি ভয়ে জোরে চিৎকার করে উঠলেন।

সঙ্গে সঙ্গে ওই লোকটা ছুরির ধারালো ডগার দিকটা গলায় বেশ চাপ দিল।

যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলেন সুচিত্রাদেবী। রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়ল গলা দিয়ে।

লোকটা পরমুহূর্তে ওর মুখ চেপে ধরল, যাতে ওর চিৎকার কেউ না শুনতে পায়। ওর নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে আসতে শুরু করল।

কিন্তু তারপরেই কী হল, বুঝতে পারলেন না। দেখলেন, সামনে দাঁড়ানো লোকটা আর্তনাদ করে উঠল। মুঠো আলগা হয়ে ছুরিটা পড়ে গেল।

লোকটাকে ঘাড় ধরে টেনে সরিয়ে কেউ একটা লোকটার মুখে একটা ঘুসি মেরেছে। আর একটা ঘুসিতেই ওই বিশালকায় গুন্ডাটা ছিটকে মাটিতে গিয়ে শুয়ে পড়ল। অন্য যে দুজন লোক ছিল, তারাও বেশ গুন্ডা টাইপের। শক্ত-সমর্থ পালোয়ানি চেহারা। আওয়াজ শুনে ছুটে এল। একজনের হাতে বড়ো একটা ছোরা।

যে লোকটা ঘুসি মারল, তার মুখটা ভালো করে দেখতে পেলেন না সুচিত্রাদেবী। কিন্তু দেখে মনে হল লোকটার রং বেশ কালো। মুখে যেন কী একটা মুখোশ পরে আছে। অন্য দুটো লোক তার দিকে ছুটে আসতেই যেটা হল, তা দেখে ভারী অবাক হলেন সুচিত্রাদেবী।

একজনের পেটে লাথি মারতেই লোক দুটো ছিটকে গিয়ে পড়ল ঘরের অন্য প্রান্তে। অন্যজনের ঘাড়ের কাছে খুব জোরে আঘাত করতেই লোকটা অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। এবারে লোকটা মাটিতে পড়ে-থাকা বাকি দুজনকেও আবার করে কাছে গিয়ে ঘাড়ের কাছে মারল। অবাক হয়ে সুচিত্রাদেবী দেখলেন, বাকি দুজনেও মাটিতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। কাজের মেয়েটা এসব দেখে ভয়ে পালিয়ে যেতে চাইছিল।

লোকটা গর্জে উঠল, চুপ করে বোস।

লোকটা এবারে সুচিত্রাদেবীর দিকে এগিয়ে এসে বলে উঠল, ভয় নেই। আমি আপনার ছেলের মতো। গলার ক্ষতটা গভীর নয়।

বলে ঝড়ের বেগে অন্য ঘরে গিয়ে রক্তপাত বন্ধ করে ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ করে দিল। মাটিতে পড়ে-থাকা তিনটে গুন্ডাকে ঘরের গ্রানাইট ডিনার টেবিলের পায়ার সঙ্গে বেঁধে সুচিত্রাদেবীর অচল ফোনকে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সচল করে পুলিশে খবর দিল।

—আচ্ছা বাবা, তোমার নাম কী? —সুচিত্রাদেবী সস্নেহে বলে উঠলেন।

একটু যেন ভেবে নিয়ে লোকটা বলে উঠল,অজামিল। আজ আসি। ভালো থাকবেন।

৯

আবার সেই অজামিল

—আচ্ছা দাদু, আর কতদিন বলব যে এখানে কিছু হবে না। এসব প্রোটেক্টেড ওয়েট ল্যান্ড। এখানে বাড়ি হয় না। দেখছেন না, চারদিকে জলাজঙ্গল।

—এখন আর এখানকার অফিসে কোনো লোক আসে না?

—না, গত চার মাস আমি কাউকে এখানে ঢুকতে দেখিনি। তবে মাঝেমধ্যে আপনার মতো আরও অনেকে আসে। খোঁজ নিতে। তারপরে আবার ফিরে যায়।

—কিন্তু ওরা তো বলেছিল এটাই ওদের অফিস।

—কে জানে! লোক ঠকানোর জন্যই করেছিল। আপনার মতো বোকা লোকেদেরই ওরা খোঁজে।

এখানে এলেই কিছু দূরের পানের দোকানের লোকটার সঙ্গে কথা বলেন রতনবাবু। কী আর করবেন!

বাইরে ঠা ঠা রোদ। চুপ করে বেশ খানিকক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়ে থাকলেন বারুই হাইস্কুলের শিক্ষক রতনবাবু। যাবেনই বা কোথায়? সব পথই তো বন্ধ হয়ে গেছে। কত কষ্টের টাকা। সারাজীবনের সঞ্চয়। তারপরে ব্যাঙ্ক থেকে যা লোন নিয়েছেন, তা এখনও শোধ করে যাচ্ছেন। সবকিছু এই জমিটা কেনার জন্য। পাঁচ বছর আগে। বলা হয়েছিল, এখানে ওরা বাড়ি করে দেবে। জমি ছাড়া, বাড়ির জন্যও কিছু টাকা নিয়েছিল। সব কাগজপত্র আছে। কিন্তু যাদের কাছ থেকে কিনেছিলেন, তাদের কারো আর নাগাল পাওয়া যাচ্ছে না গত দেড় বছর। যেন কর্পূরের মতো উবে গেছে। মধ্য কলকাতায় যে ঝাঁ-চকচকে অফিসটা ছিল এদের, সেটাও বন্ধ। বহুদিন ধরে।

সত্যি তিনি বোকা। পাঁচ বছর আগে যখন এই টাকা দিয়েছিলেন, তখন এদের বিজ্ঞাপন থাকত বড়ো বড়ো কাগজের প্রথম পাতায়। অন্যদের মতো ভেবেছিলেন, এটা বোধহয় খুব ভালো কোনো কোম্পানি হবে। রিটায়ারমেন্টের আগে অবশেষে একটা নিজের বাড়ি হবে।

বুকের কাছটা যেন কীরকম করে উঠল। স্ত্রী-কেও এসব কথা বলা হয়নি যে এভাবে ঠকে গেছেন। হয়তো শুনে অসুস্থই হয়ে পড়বে।

এসব ভেবে মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিলেন। কে একজন ধরে নিল।

কমবয়সি একটা ছেলে। একটা জায়গায় রাস্তার পাশে বসিয়ে জল খেতে দিল। তারপরে রতনবাবু একটু কথা বলার অবস্থায় এলে জিজ্ঞেস করল, আপনার কি কোনো অসুবিধে হয়েছে? আমাকে বলুন, আমি দেখব কী করতে পারি।

এই এতদিন বাদে যেন প্রথম একজনের কাছে এ ব্যাপারে সহানুভূতির স্বর শুনতে পেলেন। সবাই কি চারদিকের অন্যায় দেখে দেখে এতটাই অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে তারা এখন সবকিছু চুপ করে মেনে নেয়? সরকার কি কিছুই করতে পারে না এসব সংস্থার বিরুদ্ধে? নাকি তারাও জড়িত আছে এসবের সঙ্গে?

ছেলেটা রতনবাবুর কাছ থেকে সব শুনল। রতনবাবুর সঙ্গে জমি সংক্রান্ত কিছু কাগজপত্র ছিল। সেগুলো দেখল। শুধু একবার চোখ বুলিয়ে নিল।

তারপর রতনবাবুর অ্যাড্রেস নিয়ে বলে উঠল, আপনার চিন্তার কিছু নেই। আমি দেখব, কী করতে পারি।

—তুমি কে?

—আমি অজামিল। একজন অতি সাধারণ মানুষ। তেমন কিছু ক্ষমতা নেই অবশ্য আমার, তবু চেষ্টা করব। আজ আসি, ভালো থাকবেন।

ভজুলালের অপহরণ

ভজুলাল জীবনে কোনো কাজ সৎভাবে করেনি। সবসময় ও ভাবে, কীভাবে কোনো কাজ সৎভাবে না করে অন্য কীভাবে করা যায়, যাতে মুনাফা বেশি থাকে। পড়াশোনা করে বেশি সময় নষ্ট করেনি। এটুকু বুঝেছিল, শিক্ষা যত হবে, তত ভালো কাজে আগ্রহ বাড়বে। সে পথে হাঁটার ইচ্ছে ওর কোনোদিনই ছিল না।

স্কুলে থাকতেই গুন্ডামি, লোক ঠকানো শুরু করেছিল। তারপরে ওর বাবার মুদির দোকানে গিয়ে বসল।

ওর বাবার সারাজীবন কেটেছে এই মুদির দোকানে। কিন্তু ভজুলাল জানত এই মুদির দোকান শুধু কিছুদিনের জন্য। চাল-ডাল এসব বিক্রি করত। তখনও যারা দোকানে আসত, তাদেরও সুযোগ পেলেই ঠকাত।

তবে ও জানত, এসব ছোটো কাজ করার জন্যে ও জন্মায়নি। আরও বড়োভাবে অনেককে ঠকানোর জন্য ওকে রাজনীতিতে নামতে হবে।

ভজুলাল সে উদ্দেশ্যে ব্যর্থ হয়নি। কয়েক বছরের মধ্যেই মুদির দোকান ছেড়ে বাড়ি তৈরির প্রোমোটারি ব্যাবসা শুরু করল। সেখানে যাতে লোক ঠকিয়ে তাড়াতাড়ি বড়োলোক হওয়া যায়, তার জন্য রাজনীতিতেও যোগ দিল। খারাপ লোকেদের বন্ধুর অভাব হয় না। ওর ক্ষেত্রেও তা-ই হল। এখন এই তল্লাটে ওর মতো দাপুটে নেতা আর নেই। এখন ওর এত সম্পত্তি হয়েছে যে মাঝেমধ্যে কোথায় কোনটা তাও ভুলে যায়।

মাঝেমধ্যে খুব সুন্দর বাড়ি দেখে যখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ে বলে, বাহ বাড়িটা তো বেশ। পাশ থেকে ওর শাগরেদ বিল্টু বলে ওঠে, এ তো আপনারই। গত বছর যে বাইশটা বাড়ি কিনলেন, এটা তার মধ্যে একটা।

ব্যাবসা ফুলেফেঁপে এখন অনেক বড়ো হয়েছে। কুড়িটার মতো সংস্থার মালিক উনি। তার মধ্যে 'স্বপ্নসৌধ' বলে একটা সংস্থাও আছে। বহু বোকা লোকজনকে জমিবাড়ি বিক্রি করেছে এই সংস্থা। সংস্থার নামটা বেশ। স্বপ্ন দেখানো ছাড়া অন্য কিছু এখনও অব্দি তৈরি করেনি এই সংস্থা। বেছে বেছে এমন সব জমি জলের দরে কেনে, যেখানে কিছুই হবে না, অথচ নানারকম প্রতিশ্রুতি দেখিয়ে বিক্রি করে দেয়।

যারা কোর্টে যাবে, মামলা করবে, এসব মামলায় সিদ্ধান্ত পেতে পেতে হয় তারা মারা যাবে, না হয় পাগল হয়ে যাবে। হয়েছেও তা-ই।

আর ওর মতো দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতার বিরুদ্ধে কোর্টে যাবার সাহসই বা পাবে কজন? তা ছাড়া পুলিশ তো সব ওরই দিকে।

আজ নিজের মার্বেলের প্রাসাদের লাগোয়া বাগানে ছুটছিল ভজুলাল। ছোটা মানে জগিং। কয়েক একর জুড়ে এই বাড়ি। দু-পাক খেলেই কয়েক মাইল ছোটা হয়ে যায়। বাড়ির চারদিক দিয়ে উঁচু পাঁচিল।

সেজন্য নিরাপত্তার কোনো অভাব নেই। তবু একা ছুটতে ভালো লাগে না ভজুলালের। তা ছাড়া সেটা দেখতে ঠিক রাজকীয়ও লাগে না। সেজন্য চারজন দেহরক্ষীকে সঙ্গে নিয়ে ছোটে। এক বন্ধু-মন্ত্রীকে ফোন করতে করতে ছুটছিল ভজুলাল। সামনে একটা অনুষ্ঠান আসছে। সে ব্যাপারে কিছু হালকা কথাবার্তা, চটুল ঠাট্টা-ইয়ারকি হল।

বেশ খানিকক্ষণ বাদে ফোন শেষ করে ভজুলাল হঠাৎ খেয়াল করল ওর সঙ্গে ওর চার বিশাল চেহারার দেহরক্ষী নেই। একটা ছোটোখাটো চেহারার ঘন কৃষ্ণবর্ণ ছেলে ওর সঙ্গে ছুটছে, যাকে ও আগে কস্মিনকালেও দেখেনি।

—কে, কে হে তুমি? আর আমার গার্ডেরা গেল কোথায়? থেমে দাঁড়িয়ে পিছনের দিকে তাকাল ভজুলাল। কোথায় গেল তারা? সব ক-টা অলস।

—ওরা সব ঘাসের উপরে শুয়ে আছে।

—মানে? আমি দৌড়োচ্ছি। আর ওরা ঘাসে শুয়ে ফুর্তি করছে?

—না, তা নয়, আসলে অজ্ঞান হয়ে ঘাসের উপরে শুয়ে আছে।

—মানে? অজ্ঞান হল কী করে?

—আসলে আপনি যখন ফোন করছিলেন, তখন আমি ওদের মেরে অজ্ঞান করে ফেলে দিয়েছি।

—মানে? তুমি?—ছেলেটার চেহারা দেখে বেশ হাসিই পেল ভজুলালের। ওর চারজন বডিগার্ড ছুটছিল, তাদের প্রত্যেকের বিশাল চেহারা। বেছে বেছে সেরা পালোয়ানদের নিয়েছে ওর বডিগার্ড হিসেবে, যাতে স্ট্যাটাস বজায় থাকে।

তারা প্রত্যেকে একাই দু-তিনজন লোককে ধরে পটকে দিতে পারে। আর এই ছেলেটা বলে কী?

গর্জে উঠল ভজুলাল, ফাজলামির জায়গা পাওনি! তুমি এখানে কী করে এলে?

ওই পাঁচিল টপকে। আমি আসলে আপনার সঙ্গে কিছু দরকারি কথা বলতে এসেছি। এবারে ছেলেটা ভজুলালের চোখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, আপনাকে ঠিক দশ দিন টাইম দেব। তার মধ্যে যতজন লোককে ঠকিয়েছেন, যাদের কাছ থেকে জমিবাড়ির জন্য টাকা নিয়ে কিছুই করেননি, তাদের সবাইকে টাকা ফেরত দিয়ে দিতে হবে। তাদের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। তা ছাড়া যত অপরাধ করেছেন, তার সবকিছুর সঠিক বিচার হবে।

ভজুলালের চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। ছেলেটার সাহস আছে বলতে হবে। ভজুলালের চোখে চোখ রেখে এরকম কথা বলার হিম্মত খুব কম লোকের আছে। আর তা ছাড়া ভজুলালও কম পালোয়ান নয়। একটা বিশ্রী গালাগাল দিয়ে খেপে গিয়ে চড় মারতে গেল ভজুলাল। কিন্তু হাতটা মাঝপথে ধরে ছেলেটা সামান্য মোচড় দিতে যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল ভজুলাল। ছেলেটার একটা জোরালো ঘুসি এগিয়ে এল ইতিমধ্যে ওর চোয়াল লক্ষ করে। পরক্ষণেই সবকিছু অন্ধকার হয়ে গেল ভজুলালের চোখের সামনে।

১১

ভজুলালের ঘোর বিপদ

জ্ঞান ফিরতে ভজুলাল দেখল, একটা অন্ধকার ঘরের মধ্যে মেঝের উপরে শুয়ে আছে। বেশ কিছুক্ষণ কিছুই মনে করতে পারল না ভজুলাল, কোথা থেকে এল, কী করছিল—সবকিছুই যেন ভুলে গেছে। সবই যেন স্বপ্নের মতো লাগছে।

ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখছে কি?

কিন্তু চোয়ালের কাছে অসহ্য যন্ত্রণা। হাত দিতে বুঝল, মুখ এখনও রক্তে ভিজে আছে।

যন্ত্রণায়, রাগে চিৎকার করে উঠল ভজুলাল। একটা অকথ্য গালাগাল দিয়ে বলে উঠল, তুই চিনিস না ভজুলালকে। তোকে শুধু নয়, তোদের পুরো পরিবারকে নিশ্চিহ্ন করে দেব।

দরজা ইতিমধ্যে খুলে গেল। দরজার কাছে একটা লোক এসে দাঁড়িয়েছে। সেই ছেলেটা কি?

কিন্তু আলো লোকটার পিছন থেকে এমনভাবে পড়েছে যে কিছুই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না।

—কে, কে তুমি?

—আমি অজামিল। ঠিক দশ দিন টাইম দেব, যাদের যাদের ঠকিয়েছিস, তাদের সব টাকা ফেরত দিয়ে দিতে হবে। তবে তাতেও কিছু হবে না। একটা একটা করে সব শাস্তির বিচার হবে। সব কৃতকর্মের।

—তুই কে? তোর মাথা যদি না আমার নিজের হাতে কাটি, আমার নাম ভজু নয়।

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু মুখ থেকে একটা চিৎকার ছাড়া আর কিছু বেরোল না। লোকটা একটা লাথি মেরেছে ওর শরীর লক্ষ করে। আর তার জন্যে ওর বিশাল দেহটা ছিটকে গিয়ে পড়েছে প্রায় চার ফুট দূরে। মনে হল যেন কোমরের, ডান পায়ের উপরের দিকের হাড় সব ভেঙে গেল একটা লাথিতে।

কোনোরকমে উঠে বসতে গেল। কিন্তু ছেলেটা এসে বাঁ হাতের আঙুলের উপরে একটা পা রেখেছে। আর সেই চাপে আঙুলগুলো ভাঙতে শুরু করেছে। ডান হাত দিয়ে সর্বশক্তি দিয়ে

ছেলেটার পায়ের একটা ঘুসি মারল ভজু। কিন্তু তাতে মনে হল, হাতের সব ক-টা আঙুল যেন ভেঙে গেল— ঠিক যেমন লোহায় ঘুসি মারলে হয়। এবার ছেলেটা একটু নিচু হয়ে অন্য হাতটাও ধরে মুচড়ে দিল। আবার যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল ভজুলাল। এ কে যে এরকম নিষ্ঠুর হতে পারে!

এবারে ভজুলাল বুঝতে পারল, এ ছেলেটার গায়ে অমানুষিক শক্তি। অন্যভাবে কিছু করতে হবে।

গলার স্বর একটু নামিয়ে বলে উঠল, কী-কী চাই তোর? টাকা? ভাগাভাগি?

ক্রুদ্ধ গলায় উত্তর শুনতে পেল, আমার কিছু লাগবে না। শুধু যাদের কাছ থেকে চুরি করেছিস, তাদের সব টাকা ফেরত দিতে হবে। এই নে তোর ফোন। ফোন কর তোর লোকদের। প্রত্যেকটা টাকার হিসেব আমার কাছে আছে। সেভাবে মিলিয়ে নেব।

এবারে ছেলেটা ঘরে একটা আলো জ্বালল।

হ্যাঁ, এই তো সেই ছেলেটা। গায়ের রং বেশ কালো। মুখে মাস্ক পরা। শুধু উজ্জ্বল চোখ দুটো যেন বেড়ালের চোখের মতো জ্বলছে।

ছেলেটা বলতে শুরু করেছে, হরলাল মান্না ২০১৪-তে জমি কেনার জন্যে দু-লাখ পঞ্চাশ হাজার দিয়েছিল, নিশীথ বড়াল ২০১৩-তে দেড় লাখ, পঞ্চানন ঘোষাল ২০১৫-তে চার লাখ...

প্রায় কুড়িটা নাম বলার পর ছেলেটা থামল। ইস্পাতকঠিন গলায় বলে উঠল, মনে পড়ছে? এরকম হাজার হাজার নাম আছে। এদের মধ্যে চারজন আত্মহত্যাও করেছে। সর্বস্ব খুইয়ে রাস্তায় নেমে ভিক্ষা করতেও বাধ্য হয়েছে কেউ কেউ।

কীভাবে টাকাটা ফেরত দেবে, সে বিষয়ে শুধু ভেবে নাও। কাকে কাকে ফোন করতে হবে, সেটাও ভেবে নাও। আমি ঠিক এক ঘণ্টা বাদে ফিরে আসব।

ভজুলাল এতক্ষণ ভুলেই গিয়েছিল যে ওর জন্যে তৈরি স্পেশাল জুতোর মধ্যে একটা ছোটো ছোরা থাকে। সুইস নাইফ। দারুণ ধারালো।

ছেলেটা বেরোতে যাবে। পিছন থেকে বাঘের মতো ছোরা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা করল। কিন্তু ছেলেটার যেন পিছনেও চোখ আছে। মুহূর্তের মধ্যে ঘুরে ডান হাতটা ধরে এবারে এমনভাবে ঘুরিয়ে দিল যে হাত থেকে ছোরাটা পড়ে গেল। তারপরে নেংটি ইদুরের মতো ভজুলালের ছ-ফুটের শরীরটা এক হাতে ঘাড় ধরে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিল ঘরের অন্য কোণে প্রায় দশ ফুট দূরে। মাথায় চোট পেয়ে দ্বিতীয়বার জ্ঞান হারাল ভজুলাল।

ফিরে এলো ভজুলাল

ব্রেকিং নিউজ

ফিরে এলেন জনদরদি নেতা ভজুলাল

কিছুক্ষণ আগেই আমাদের বিশেষ সংবাদদাতা পাঁচু মিত্র জানিয়েছেন যে জনদরদি নেতা ভজুলাল কথা বলার অবস্থায় কিছুটা ফিরে এসেছেন। প্রায় দশ দিন তাঁর কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। গতকাল বাড়ির গেটের সামনে তাঁকে শুয়ে থাকতে দেখা যায়। শুরুতে কথা বলার অবস্থায় ছিলেন না। সারা শরীরে ব্যান্ডেজ। হাত আর পায়ের অনেক হাড় ভেঙে গেছে। মাথায়ও সিরিয়াস চোট আছে। মাঝেমধ্যেই জ্ঞান হারাচ্ছিলেন আর 'গোঁজামিল' 'গোঁজামিল' বলে কী যেন বলতে চাইছেন। সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভরতি করা হয়েছে। দশজন ডাক্তারের এক বিশেষ টিম ওর চিকিৎসার দায়িত্বে আছে। শোনা গেছে, উনি তাঁদের চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন।

—পাঁচুদা, পুলিশ এ ব্যাপারে কী বলছে?

—পুলিশ এখনও পুরোপুরি অন্ধকারে। দশ দিন আগে ভজুলালবাবুকে একদল দুষ্কৃতী বাড়ির বাগান থেকে কিডন্যাপ করে। তারপর থেকে বিভিন্ন জায়গায় চিরুনিতল্লাশি চালিয়েও এদের কোনো খোঁজ পায়নি পুলিশ। সেখানে হঠাৎ করে গতকাল ফিরে আসাটা খুব বিস্ময়জনক।

—তা ওর কোনো বক্তব্য কি এখনও পাওয়া গেছে?

—হ্যাঁ, কিন্তু সে বক্তব্যের মধ্যে অনেক ধোঁয়াশা আছে। শোনা যাচ্ছে, উনি নাকি এখনও এক ঘোরের মধ্যে আছেন, বার বার বলছেন, আর কোনো লোককে ঠকাবেন না, এমনকী বলছেন যে যত লোককে ঠকিয়েছেন, তাদের সব টাকা ফেরত দিয়ে দেবেন। ইতিমধ্যেই অনেককে তাদের প্রাপ্য টাকা নাকি ফেরত দিয়ে দিয়েছেন, এরকমও শোনা যাচ্ছে।

—কিন্তু ওঁকে কে বা কারা কিডন্যাপ করেছিল, সে ব্যাপারে কিছু জানা যাচ্ছে?

—না, সে ব্যাপারে শোনা যাচ্ছে, গোঁজামিল নামের কোনো একজন নাকি তাঁকে কিডন্যাপ করেছিল। পুলিশ তাকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করছে। ওই গোঁজামিল নামের লোকটাই নাকি ভজুলালবাবুকে বেদম মারধর করেছে। অসহায় মানুষদের ঠকিয়ে ভুয়ো সংস্থার নামে তোলা টাকা ফেরত দিতে বাধ্য করেছে।

পুলিশের ধারণা, গোঁজামিলের সঙ্গে কোনো টেররিস্ট গ্রুপের যোগাযোগ আছে। লোকটার গায়ে অসম্ভব জোর। ভজুলালের মতো পালোয়ানকে যে এরকম মারতে পারে, বুঝতেই পারছ তার গায়ে কীরকম জোর। একটা সম্ভাব্য স্কেচ পুলিশ খানিকক্ষণের মধ্যেই রিলিজ করবে।

—কিন্তু একা একজন কীভাবে এরকম সুরক্ষাব্যবস্থার মধ্যে থেকে ভজুলালবাবুকে নিয়ে চলে গেল?

—হ্যাঁ, পুলিশের কাছেও এটাই প্রশ্ন। তা ছাড়া ভজুলালবাবুর মতো স্বাস্থ্যবান লোককে কীভাবে একজন এরকম সুরক্ষিত একটা বাড়িতে এসে সব সুরক্ষাকর্মী আর ভজুলালবাবুর গার্ডদের মেরে ভজুলালবাবুকে নিয়ে যেতে পারে! এত একার পক্ষে অসম্ভব কাজ। শোনা যাচ্ছে, ভজুলালবাবু নাকি এখনও মাঝেমধ্যে ভয়ে ভয়ে গোঁজামিল বলে ভেউ ভেউ করে কাঁদছেন। বলছেন, কোনো অন্যায় করলে আবার তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়ে মারবে গোঁজামিল। কেউই নাকি সেটা আটকাতে পারবে না।

—ঠিক আছে, পাঁচুদা। আমি অনন্যা বলছি। সঙ্গে থাকুন, শুনতে থাকুন আমাদের চ্যানেল। মানুষের সুখ-দুঃখে পাশে থাকে, সবার থেকে এগিয়ে থাকে, সবার দুঃখ বাড়িয়ে থাকে—দুঃখ চ্যানেল।

১৩

এবার পালা হরিহরবাবুর

শিক্ষামন্ত্রী হরিহরবাবু ওঁর পড়ার ঘরে ঢুকেই লক্ষ করলেন যে, যে ছেলেটা ওঁর ঘরের আসবাব পরিষ্কার করছে, তাকে উনি আগে কখনো দেখেননি।

নতুন কাজের লোক?

ব্যাকগ্রাউন্ড চেক না করে, ওঁকে এরকম না জানিয়ে উটকো লোক রাখা একদম ঠিক কথা নয়। এই ব্যাপারে বাড়ির লোকজনকে, মানে স্ত্রী-কে বাদ দিয়ে, বেশ কড়া কিছু কথা বলবেন ঠিক করলেন। স্ত্রী মণিদীপা ওণার থেকে বেশি দাপুটে। বেশ ভয়ই পান তাঁকে।

কত দরকারি কাগজপত্র আছে এখানে। কেউ যদি কিছু নিয়ে যায় বা যদি কোনো গুপ্তচর হয়!

ইতিমধ্যে ছেলেটা ওঁর দিকে ঘুরে তাকিয়েছে। উনি কিছু বলার আগে ছেলেটাই ওকে বলে উঠল, আপনার সম্বন্ধে কত খারাপ কথা শুনেছি। কিন্তু দেখার পর মনে হচ্ছে ততটা খারাপ নন।

—কী—কী বললে? আমার সম্বন্ধে কে খারাপ কথা বলেছে?

—সে তো চারদিকেই লোকজন বলে বেড়াচ্ছে। আপনার সামনে বলার সাহস করে না। বলে চোর, শুধু চুরি করে টাকা করেছেন, এসব কথা শুনলে কি আর মাথা ঠিক থাকে! বলে, পুরো শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস করে দিয়েছেন। আপনি নিজেও যেমন মাধ্যমিকে অঙ্কে বারো

পেয়েছিলেন, বিজ্ঞানে আঠেরো পেয়েছিলেন, ঠিক সেরকমই চান, সবার শিক্ষার মান হোক। এরকম আরও কত কী শুনি!

কী আশ্চর্য! এইসব মাধ্যমিকের নাম্বার পর্যন্ত জানে, যা মণিদীপা পর্যন্ত জানে না।

—সব রাবিশ! বিরোধীদের প্রচার। আমার সামনে এসব কথা বলার সাহস কে দিল?

—না, না, ছি ছি, আমি কেন বলব? আমি শুধু যা শুনেছি, তা-ই বললাম। সে তো আপনাকে অনেকে মোটা হোঁদল কুতকুতও বলে থাকে, আমি কি আর সে কথা বলতে গেছি? বা বলতে গেছি যে আপনাকে স্কুলে আপনার ক্লাসমেটেরা গবাদি বলে ডাকত, আপনি সব সময় মা-র কথা শুনে চলতেন বলে।

আশ্চর্য, এই ছেলেটা এত কিছু জানল কী করে!

এই যে গত পরশু আপনি পার্টিতে এক সুন্দরী রমণীকে দেখে শুধু হেসেছিলেন, যার জন্য আপনার স্ত্রী আপনাকে বাড়ি আসার পর ঝাঁটা দিয়ে মেরেছিল, সে কথা কি বলেছি?

গলা খাঁকরে হরিহরবাবু বলে উঠলেন, তা কে রেখেছে তোমাকে? মণিদীপা?

—না, কেউ না। ওই দেওয়াল বেয়ে উঠে জানলা দিয়ে ঢুকে এসেছি।

হরিহরবাবু সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের ড্রয়ারের থেকে রিভলভার বার করতে গিয়ে দেখলেন সেখানে নেই।

ছেলেটা ফের বলে উঠল, যেটা খুঁজছেন, ওটা অন্যদিকের মাঝের ড্রয়ারে আছে।

ছেলেটা এবারে নিজের নাম বলে উঠল, আমার নাম অজামিল। শুনেছেন বোধহয়। ওটাকেই গোঁজামিল বলে বলছে অনেকে।

চমকে উঠলেন হরিহরবাবু। একেই তো সবাই হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াছে। এত মারাত্মক লোক।

উনি এমনি সামনে যতই সাহস দেখান, ভিতু সংসারী মানুষ। এই যদি সেই ছেলেটা হয়, তাহলে নিশ্চয়ই ওঁকে মারতেই এসেছে। ভজুলালের যদি ওই অবস্থা করে থাকে, তাহলে ওর কী অবস্থা করবে—কে জানে!

কাঁপা গলায় বলে উঠলেন, আ—আমি কিছুই অন্যায় করি নি। দেখলে তো, ওইসব তদন্তকারী সংস্থা আমার বিরুদ্ধে কিছুই না পেয়ে ছেড়ে দিল।

—তদন্তকারী সংস্থা আপনার বিরুদ্ধে কী পেল বা না পেল, সেটা বড়ো কথা নয়। বড়ো কথা, আপনি নিজে জানেন আপনি কত বড়ো অপরাধী। আপনি এমন এক সিস্টেম তৈরি করেছেন, যেখানে টাকার বিনিময়ে আপনি যোগ্য ছাত্রকে সুযোগ না দিয়ে অন্যদের চাকরি দিয়েছেন। এতে শুধু তাদের প্রতি অন্যায় নয়, এভাবে আপনি শুধু যে হাজার হাজার ছাত্রের

ভবিষ্যৎ নষ্ট করেছেন তা-ই নয়, শিক্ষার মান এই রাজ্যে খারাপ করে দিয়েছেন, যার প্রভাব আজ থেকে কুড়ি বছর বাদেও থাকবে।

—আমি অন্যায় কোনো কিছু করিনি।

—আমাকে আপনি যতই বোঝান-না কেন, আমি সব জানি। তা ছাড়া নিজের মনকে কি বোঝাতে পারবেন? তবে মানুষটা আপনি ততটা খারাপ নন। সেজন্য আমি আপনাকে মারধর করব না। আপনার জন্যে শুধু কিছু স্বপ্ন রেখে গেলাম, যাতে আপনার মধ্যের ভালো মানুষটা আবার জেগে ওঠে। আর মনে রাখবেন, আমার হাত থেকে কেউ নিস্তার পায় না।

বলে ছেলেটা ঘরের জানলা খুলে টপ করে বাইরে চলে গেল।

হরিহরবাবু কিছুক্ষণ পাথরের মতো বসে থাকলেন। কিছুটা ধাতস্থ হওয়ার পরে পাশের বেলটা টিপে সিকিউরিটিকে ডাকলেন।

পুরো বাড়ি বাগান তন্ন তন্ন করে খুঁজেও ছেলেটাকে আর পাওয়া গেল না।

সেদিন রাতে উনি প্রথম একেবারে অন্য ধরনের একটা স্বপ্ন দেখলেন। ক্লাস সিক্সের অঙ্কের পরীক্ষার। অঙ্কের শিক্ষক বরুণবাবু ওর দিকে দেখিয়ে বাকিদের বলছেন, এবারে পরীক্ষায় তোরা সবাই একে অন্যের খাতা থেকে টুকেছিস। কোনো গার্ড ছিল না। আমি খাতা দেখেই বুঝেছি। কিন্তু একজন যেরকমই করুক-না কেন, অঙ্কে যত খারাপই হোক-না কেন, নিজের মতো করে চেষ্টা করে পরীক্ষা দিয়েছে। সে হল আমাদের হরিহর। হরিহরের মতো সৎ হওয়ার চেষ্টা করিস সবাই।

রাত তিনটের সময় পর পর তিনবার স্বপ্নটা দেখে উঠে বসলেন। বুকের ভেতর থেকে যেন কীরকম একটা চাপা কান্না উঠে এল। উনি এভাবে পালটে গেলেন কেন? কী করে? এখন কি আর পরিবর্তন সম্ভব?

১৪

পারবে কি গোয়েন্দা রজত?

গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান রজত সমাদ্দারের চাকরি যেতে বসেছে। শহর জুড়ে একের পর এক কাণ্ড। সবের মূলে অজামিল। ছেলেটা একের পর এক খারাপ লোক খুঁজে বার করছে। তাদের মারধর করে ভয় দেখিয়ে সব গোপন কথা বার করে নিচ্ছে। অনেক অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের উপকার করাই যেন ছেলেটার ব্রত। এখনকার দিনে এরকম খারাপ উদ্দেশ্য কার থাকতে পারে?

স্বাভাবিকভাবে একটা বড়ো জনসমর্থন ওর দিকে। রাতারাতি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে সাধারণের কাছে, যারা অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে চায়, কিন্তু অসহায়তার জন্য করতে ভয়

পায়।

কিন্তু একই সঙ্গে কীভাবে যে পুলিশ আর আইনের ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকছে,সেটাও অদ্ভুত। হয় বড়ো কারো সাপোর্ট আছে। বিরোধী দলগুলো অবশ্য কেউ একে চেনে না বলে জানিয়েছে। কিছু অস্বাভাবিক ক্ষমতা যে ছেলেটার মধ্যে আছে, তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তা না হলে একার পক্ষে এসব করা সম্ভব হয় না।

এখন রজতের ঘাড়ে সব দায়িত্ব। জীবিত বা মৃত যেভাবে হোক-না কেন ওই অজামিলকে ধরতে হবে। যেভাবে একের পর এক দুর্নীতি ফাঁস করছে, তাতে উপরের বিল্ডিং যতই ঝাঁ-চকচকে হোক-না কেন, ভিত নড়ে গেছে। সরকারের সবাই পুলিশের অপদার্থতায় একেবারে খাপ্পা। কী করে পুলিশ থাকতে এসব দুর্নীতি বাইরের কেউ ফাঁস করতে পারে?

রজত দিনেদুপুরে অজামিলকে নিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখছেন। গত রাতে দেখেছেন যে উনি ওর প্রিয় গলদাচিংড়ির মালাইকারি খেতে বসছেন। খেতে যাচ্ছেন, ছেলেটা এসে পুরো বাটিটা তুলে নিয়ে মাথার উপরে ঢেলে দিল। এরপরে আর ঘুম আসে?

একবার ছেলেটাকে হাতের কাছে পেলে হয়। দেখাবেন মজা। এতদিন নিশ্চিন্তে কাজ করা গেছে। রিটায়ারমেন্টের আগে যত অশান্তি!

এসব নিয়ে এতটাই অন্যমনস্ক ছিলেন যে স্ত্রী-র বার বার বলা সত্ত্বেও বাজারে গিয়ে ভুলে চিংড়ির বদলে মৌরলা কিনলেন, পাঁচ কেজি আলুর বদলে পাঁচ কেজি পেঁয়াজ কিনলেন, এমনকী পাশের বাড়ির বিপিনবাবু যখন ওকে বারকয়েক ডাকলেন, তখনও উনি সেটা খেয়াল করলেন না।

বহু বছর পান খান না। আজ অজামিলকে নিয়ে যাতে মাথাটা ঠিকভাবে কাজ করে, সেজন্য একটা গোপাল জর্দাপানও কিনে খেলেন। বাড়িতে ঢোকার সময় যে কাগজে পান মোড়া ছিল, সেই কাগজটা দেখে-চক্ষু চড়কগাছ। তাতে লেখা শুধু শুধু আমার পিছনে সময় নষ্ট করছেন, এত কষ্ট করে খোঁজাখুঁজি করছেন, তার থেকে ঠিকভাবে ডাকলে বাড়ি এসে দেখা করব। সেটা অবশ্য আপনার জন্য মঙ্গল হবে কি না জানি না। সত্যিকারের অপরাধীদের খোঁজ করুন।

তার মানে অজামিল ওখানেই ছিল। কী সাংঘাতিক!

১৫

হরিহরবাবুর পরিবর্তন

হরিহরবাবুর আজ কাজে মন নেই। কাল সারারাত স্বপ্ন দেখেছেন ছোটোবেলার। স্কুলে পড়ার সময় ওদের অবস্থা একদম ভালো ছিল না। কিন্তু তার জন্য কখনো অন্যদের মতো

ট্রেনে বা বাসে টিকিট না কেটে ওঠার কথা ভাবতে পারতেন না। হেঁটে পাঁচমাইল পথ একদিকে যেতেন। যতই কষ্ট থাকুক-না কেন, কত আনন্দ ছিল সেসব দিনে।

নয়নবাবু ছিলেন অঙ্কের শিক্ষক। সাংঘাতিক সব কঠিন অঙ্ক দিতেন। উনি ছিলেন অঙ্কে সব থেকে দুর্বল। ওর বাবার সঙ্গে নয়নবাবুর ভালো বন্ধুত্ব ছিল। দুজনে বসে দাবা খেলতেন। একবার অঙ্কের পরীক্ষার আগে বাড়ি গিয়ে যখন ওঁরা দাবা খেলছিলেন, তখন অন্য ঘরে গিয়ে হরিহরবাবু দেখেন যে ওঁদেরই ক্লাসের অঙ্কের প্রশ্নপত্র টেবিলের উপরে পড়ে আছে। অন্য যে কেউ হলে হামলে পড়ত, কিন্তু উনি কিছু করেননি। প্রশ্নপত্র চোখের সামনে থাকলেও এরকমভাবে অন্যায় একটা কাজ করবেন, তা তখন ভাবতেও পারেননি।

আর সেই তৃপ্তিপিসি? কী স্নেহ করত ওঁকে। মা-র বন্ধু ছিল। সেজন্য জানত ওর সম্বন্ধে সব কথা। খুব ভালোবাসত ওঁকে ওঁর স্বভাবের জন্য। বলতেন, সবার আগে হরিহরের মতো ভালো মানুষ হতে হয়।

এসবই স্বপ্নে দেখছেন শেষ ক-টা দিন।

আর অপূর্ববাবু? ওঁর তো বাংলা একেবারে খারাপ লাগত। ভয় পেতেন। কিন্তু সেই বাংলাকে এত ভালোবাসতে শিখলেন বাংলার শিক্ষক অপূর্ববাবুর জন্যে। ক্লাসে পড়াতেন, যেন কবিতা বলতেন। শব্দের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে উনি ওই বাংলা ভাষার প্রেমেই পড়ে গেলেন। কিন্তু আজ যদি হত, তাহলে হয়তো অপূর্ববাবুর মতো মানুষ সরকারি স্কুলে শিক্ষকই হতে পারতেন না।

আর এজন্য কে দায়ী? উনি নিজে।

কিন্তু কীভাবে কবে বদলে গেলেন? আবার সেই চাপা কান্নাটা পেল। সত্যিই তো, ছেলেটা তো ঠিকই বলেছে। ওর অপরাধ না-ধরা পড়লে কি আর উনি অপরাধী নন? যেকোনো দেশে যেকোনো রাজ্যে উন্নতির মূল বীজ লুকিয়ে থাকে শিক্ষায়। সেই শিক্ষাকে উনি নষ্ট করে দিয়েছেন।

—কী, মনে হচ্ছে তো আপনি অপরাধী? খুব খারাপ লাগারই কথা। ভাবুন তো, কত অভাবী সংসারে কতজন বছরের পর বছর ধরে পড়াশোনা করে পরীক্ষা দিয়ে যাচ্ছে, যাতে তারা ভালো শিক্ষক হতে পারে। আর আপনি সেটাই হতে দিচ্ছেন না?

চমকে উঠলেন হরিহরবাবু। অজামিল ঘরের ভেতরে এল কখন?

ফের অজামিল বলে উঠল, ভাবুন, আপনার জন্য হাজার হাজার ছেলে-মেয়ে আজ যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও শিক্ষক হতে পারেনি। শুধু তা-ই নয়, আপনার জন্যই অত্যন্ত খারাপ শিক্ষক, যাদের কোনো যোগ্যতা নেই, তারা এখন স্কুলে পড়াচ্ছে আর আরেকটা প্রজন্মের ভবিষ্যৎ নষ্ট

করে দিচ্ছে, যার জন্য আমাদের সবাইকে ভুগতে হবে আগামী কুড়ি বছর। আপনার মা তো খুব আদর্শবাদী মহিলা ছিলেন। খুব খুশি হয়েছিলেন, যখন আপনি ভালো চাকরি ছেড়ে রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিলেন। উনি কি এখন আপনার এই পরিচয় পেলে খুশি হতেন? হয়তো লজ্জায় আত্মহত্যা করতেন।

হরিহরবাবু লজ্জায় আরও কুঁকড়ে গেলেন। সত্যি তা-ই, মা মারা গেছেন বেশ কয়েক বছর হল। মা-র পড়াশোনা ছিল স্কুল অব্দি। তারপরে বিয়ে হয়ে যাওয়ায় আর পড়াশোনা করতে পারেননি। পরে দেশভাগের পরে এ দেশে এসে ফের পড়াশোনা শুরু করে শেষে প্রফেসর হন। সব সময় মনে করতেন, শিক্ষাই সমাজ বদলে দিতে পারে, একটা জাতিকে উন্নত করতে পারে। মা সেজন্য সব সময় শিক্ষার উপরে জোর দিতেন। প্রকৃত শিক্ষা। ঘরে রাখা মা-র বড়ো ছবিটা দেখে হরিহরবাবুর মনে হল, পালিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। আজ যা কিছু, সবকিছুই মা-র জন্যই। মা নিজে পড়াশোনা করে শিক্ষা পেয়েছিলেন বলেই জেনেছিলেন শিক্ষার গুরুত্ব, সে শিক্ষা দিতে পেরেছিলেন ওর সন্তানদের। কিন্তু হরিহরবাবু কী করে সেই শিক্ষা ভুলে গেলেন? তা না হলে কি এভাবে শিক্ষাব্যবস্থাকে পঙ্গু করে দিতে পারতেন? রেগে হাত দিয়ে নিজের পায়ের উপরে জোরে আঘাত করলেন। আত্মহত্যা করার মতো সাহস ওর নেই। পারলে সেটাই করতেন। কী করে বেরোবেন এখন এখান থেকে? অন্যায় যে অজগরের মতো গ্রাস করে নিয়েছে সবকিছু।

আবার সেই স্বপ্নের ঘোরে হারিয়ে গেলেন হরিহরবাবু। স্কুলে অঙ্ক পরীক্ষা হচ্ছে। খুব শক্ত একটা অঙ্ক। আস্তে আস্তে উনি অঙ্ক ভালোবাসতে শুরু করেছেন। পরীক্ষার সময় শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু পাশে দাঁড়িয়ে নয়নবাবুও গর্বিত মুখে ওঁর সেই চেষ্টা দেখে যাচ্ছেন। এই তো চাই।

হরিহরবাবুর সারাদিনের সব দরকারি মিটিং বাতিল হয়ে গেল।

১৬

ঋকের বাড়ি যাওয়া

আরও একদিন ঋকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তখনও অনেক আড্ডার পরে সেই একই কথা। কবে আসবি?

এদিকে বলতে নেই, কিছু আশার আলো দেখছি। সহজে সবকিছু মেনে নিই আমরা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই না। কিন্তু যেটা পারি না করতে, সেটাই করে দেখাচ্ছে একজন। অজামিল। অজামিল নামের এক বছর পঁচিশেকের ছেলে। ছোটোখাটো চেহারা। ঘন কালো রং। দিনের বেলায় নাকি মুখে মুখোশ পরে থাকে। আবার কখনো সে নাকি এমন

মেকআপ করে যে অন্যরা যারা তাকে দেখেছে, তাদেরও বর্ণনা মেলে না। কেউ বলে অজামিলের নাক শিঙাড়ার মতো, তো কেউ বলে আহা, নাকই নেই বলা চলে, বোঁচামতো। কেউ বলে মাথায় মস্ত টাক, তো কেউ বলে, মাথা ভরতি অমন কোঁকড়ানো চুল আজকালকার দিনে দেখাই যায় না। কেউ বলে ডান গালে তিল, তো কেউ বলে, ধুর, ভুল দেখেছেন। ওটা তো ডান চোখের পাশে আঁচিল।

পুলিশের ধারণা, লোকটা খুব ভালো মেকআপ আর্টিস্ট, নানান ধরনের ভেক চট করে ধরতে পারে। হয়তো নাটক, সিনেমার সঙ্গেও তাই যোগ থাকতে পারে। শুধু গায়ের ঘন কালো রঙের কথাটা, আর রোগা ছোটোখাটো চেহারাটা সবার কাছেই কমন। কে সে এখনও কেউ জানতে পারেনি। সরকারের মতে সে একজন বড়ো ক্রিমিন্যাল। নিজের বিশেষ কিছু স্বার্থে এসব কাজ করে বেড়াচ্ছে।

তবে সাধারণের ধারণা স্বাভাবিকভাবেই ঠিক উলটো। জমি প্রতারণার জন্য অনেক নিরীহ মানুষ সর্বস্ব হারিয়েছিল। তাদের অনেকে সে টাকা ফেরত পেয়েছে। বেশ কিছু লোক ও সরকারি আধিকারিককে, রাজনীতির ছোটো বড়ো নেতাকে ঘুস খাওয়ার সময় বা অন্যায় করার সময় অজামিল ধরেছে। শুধু ধরেছে না, এমন উত্তম-মধ্যম দিয়েছে যে তারা আর সেরকম কাজ করতে সাহস করবে না। তারা স্বীকারও করে নিয়েছে সবকিছু।

ভয়টা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যে কিছুদিন আগে তিনজন পাড়ার ডাকসাইটে গুন্ডা এক ছোটো ব্যবসায়ীর কাছ থেকে টাকা আদায় করতে গিয়ে দেখে, তার পাশে এক কৃষ্ণকায় ছোটোখাটো লোক বসে আছে। তা দেখে তারা কিছুক্ষণ 'অজামিলদা কেমন আছেন, চা খাবেন, আমরা আপনার খুব ফ্যান, আপনার পায়ের ধুলো দেন'—এসব বলার পর পাড়া ছেড়ে পালিয়ে যায়। সেই যে পগারপার হয়েছে, এখনও তাদের দেখা মেলেনি।

পরে জানা গিয়েছিল ওই লোকটি দক্ষিণভারতের চেন্নাই নিবাসী অনন্ত কৃষ্ণন, এক স্থানীয় ইলেকট্রিক কোম্পানির হয়ে মিটার বসাতে এসেছিল, ও জীবনে লেমন রাইস খাওয়ার বাইরে দুঃসাহসী কোনো কাজ করেনি।

অন্যদিকে দু-দিন আগের ঘটনা। রাধানাথ পাইন নামে এক কমবয়সি ছেলে দমদম এয়ারপোর্টে এসে প্রিপেড ট্যাক্সি বুক করেছিল। তারও একই রকম চেহারা। কৃষ্ণকায়, ছোটোখাটো চেহারা, পুলিশের সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এয়ারপোর্টের বাইরে যেই না তাকে জেরা শুরু করা হয়েছে, প্রায় জনা পঞ্চাশেক লোক ঘিরে ধরে ও সেই পুলিশকে বেদম প্রহার শুরু করে।

পরে জানা যায়, সেই যুবক মুম্বইতে কাজ করে ও অফিসের কাজে কলকাতায় এসেছিল।

সবার আশা এখন অজামিলকে ঘিরে। সবার প্রার্থনা, যাতে অজামিল ধরা না পড়ে। তাকে ধরার জন্য অবশ্য পুলিশ সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়েছে। ভয় হয়, কবে তাকে ধরে ফেলবে। সেক্ষেত্রে আমাদের সবার আশাভঙ্গ হবে।

কবে যে আবার ঠিকভাবে সরকারি স্কুলের চাকরির পরীক্ষা হবে, কবে তার ঠিকভাবে বিচার হবে, সেই অপেক্ষায় দিন গুনছি। বাবার আর তেমন সেন্স নেই, মা যদি মারা যাওয়ার আগে আমাকে প্রতিষ্ঠিত দেখে যেতে পারে, শান্তি পাবে।

ঋকের বাড়ি উত্তর কলকাতার একটা পুরোনো পাড়ায়। সরু অলিগলির মধ্যে। তবে যে গলি দিয়ে ঢুকলাম, সেটা বেশ পরিষ্কার। এরকম পরিষ্কার রাস্তা খুব কমই দেখেছি।

পুরোনো দিনের বাড়ি। ওরা এখানে ভাড়া থাকে। এখন একজন আই. টি.-তে কাজ করা কর্মী যেরকম প্রাচুর্যের মধ্যে থাকে, সেরকম কিছুই চোখে পড়ল না বাড়িতে। ঢুকে একটা ছোটো দালান। সরু লাল সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলায় দুটো ঘর। তারপরে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে ছোটো ছাদ। মাসিমা আমাকে দেখে খুব খুশি। এতদিন বাদেও আমাকে চিনতে পেরেছেন। আমাকে দেখে বলে উঠলেন, আসলে ঋকের তো একজনই বন্ধু ছিল, সে হলে তুমি। তোমাকে ভুলব কী করে? তুমি চলে আসার পরে ঋকের যে কী খারাপ লেগেছিল, কী বলব। ও তো মাঝেমধ্যে কাঁদত। আসলে আমাদের মানুষ বলেই মনে করে না অনেকে। তোমাকে বলেনি নিশ্চয়ই?

মাসিমার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলার পরে ঋকের ঘরে গিয়ে বসলাম। আসলে ঋকের বলা কথাটা যাতে না ওঠে, সেটারই চেষ্টা করছিলাম। এ তো আমারই লজ্জা, আমাদের সবার লজ্জা।

ঋকের ঘরে বসে আড্ডা মারতে মারতে এসব সাম্প্রতিক ঘটনা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল।

বলে উঠলাম,অজামিল ছেলেটা কী ধাতুতে গড়া কে জানে? একা এসব কাণ্ড করে বেড়াচ্ছে। তবে কবে যে ধরে ফেলবে, কে জানে? আচ্ছা, তোর কী মনে হয়, সেদিনের যে লোকটা আমাদের সঙ্গে রেস্টুরেন্টে ছিল, সেই লোকটা হতে পারে কি? ওরকম ঘন কালো রং এখন চট করে দেখা যায় না। অজামিল সম্বন্ধেও একই জিনিস শুনছি। লোকটার সঙ্গে দেখা হলে জাস্ট ঢিপ করে প্রণাম করব। তোর কী মনে হয়? ওই লোকটা?

ঋক বলে উঠল, আসলে সবার আগে ভালো কাজ করার জন্যে গভীর ইচ্ছে লাগে। সেটা হয়তো আমাদের মধ্যে নেই, ওর মধ্যে আছে। সেজন্যই ও স্পেশাল। হ্যাঁ, সেদিনের সে

লোকটা তো হতেই পারে!

—কিন্তু তুই বল ঋক, তুই তো আমাদের সবার থেকে ছোটোবেলাতে অন্যরকম ছিলিস। কী জোরে দৌড়োতিস, কতদূর অব্দি লাফাতিস, কিন্তু কিছুই করলি না তারপর। জাস্ট একটা আই. টি.-র চাকরি করছিস। সে তো আরও অনেকে করতে পারে। পারলে তুই অজামিলের পাশে দাঁড়াস। ও আমাদের সবার আশা, সবার গর্ব।

ও এ ব্যাপারে আর কথা না বাড়িয়ে অন্যদিকে কথা পরিবর্তন করল, এই পাড়াটা দেখে তোর কী মনে হয়েছে?

—কী পরিষ্কার।

—ঠিক বলেছিস। শুধু এই পাড়া নয়, এর পাশের পাড়াও।

—হ্যাঁ, আমারও সেটা দেখে খুব অবাক লাগছিল। এরকম পরিষ্কার রাস্তা দেখাই যায় না।

—আমি রোজ পরিষ্কার করি। সকাল পাঁচটায় উঠে।

—মানে? তুই কেন করিস?

—আরে ওটাই তো আমার বাবা-মা-র পেশা ছিল। এটা লজ্জার কী? এখনও আমি সে পেশা বজায় রেখেছি। পরিষ্কার করতে আমার বেশ ভালো লাগে। লোকে কী ভাবল বা বলল, তাতে কী এসে যায়! কোনো পেশাই ছোটো নয়।

আমার খুব খারাপ লাগত যখন ছোটোবেলায় সবাই আমাদের এজন্য অপমানিত করত। বলা যায়, প্রতিমুহূর্তে অপমান করত। এমনকী স্কুলে তুই চলে যাওয়ার পরে একদিন আমার জামা সামান্য নোংরা ছিল বলে আমাকে একদিন সারারাত স্কুলে একটা ঘরে আটকে রেখে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। আর বাইরে থেকে সবাই, যাদের মধ্যে কিছু শিক্ষকও ছিল, তারা সবাই আমার জাত, আমার বাবা-মা সবাইকে নিয়ে নোংরা কথা বলছিল। আমি সেদিন সারারাত শুধু কেঁদেছি, আর ভেবেছি, একদল মানুষ কেন সব সময় অন্যদের ছোটো করে আনন্দ পায়।

—আমি যদি ওদের হাতের কাছে পেতাম না—আমি উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে বলে উঠলাম।

—এভাবে কতজনের বিরুদ্ধে তুই লড়বি? তার থেকে এই ধরনের কাজ যারা করে, তাদের যাতে সবাই ভালোবাসতে শেখে, এই কাজের গুরুত্ব বোঝে, সেজন্য আমাদের সবার এ ধরনের কাজ করতে এগিয়ে আসা উচিত।

—ঠিক বলেছিস ঋক।

আরও বেশ খানিকক্ষণ আড্ডার পরে আমি উঠলাম। আমি চাইছিলাম, ঋক যেন অজামিলের পাশে থাকে। সেটা মনে হয়, ও থাকবে।

২০

হরিহরবাবুর আজ খুব বড়ো মিটিং ভগবানপুরে। কয়েক লক্ষ লোকের জমায়েত হয়েছে।

কোনো তদন্তকারী সংস্থা হরিহরবাবুর বিরুদ্ধে শেষে কিছুই প্রমাণ করতে পারেনি। একেবারে ক্লিন চিট।

হরিহরবাবু জানেন, ওকে কী বলতে হবে। এ তো শুধু ওর একার জয় নয়, ওনার জয় মানে দলেরও জয়। বলতে হবে, ওকে ফাঁসানো হয়েছিল। বলতে হবে, এটা পুরোটাই বিরোধী দলের ষড়যন্ত্র। ওর মতো অভিজ্ঞ নেতা জানেন, এটা কীভাবে বলতে হয়, একটু নাটক করে, একটু জনতাকে উসকিয়ে দিয়ে।

কিন্তু আজ ওর নিজের সঙ্গে নিজের লড়াই। মনের মধ্যে কে যেন বার বার সেই ছোটোবেলার কথা মনে করে দিচ্ছে যখন উনি সামান্যতম অন্যায়ের কথা ভাবতে পারতেন না!

আর আজ!

তবু উনি সেসব সামলে বেশ নাটকীয়ভাবেই শুরু করলেন—

ওরা ভেবেছিল, আমি জেলেই থাকব। আমি বাইরে থাকলে ওদের মুশকিল। তোমরা যে আমায় ভালোবাসো তা ওরা চায় না। তোমরা আমাকে ভোট দিলে ওদের অসুবিধে। তাই জেলে ভরো। যে করে হোক, যেভাবে হোক, প্রমাণ করো, আমি অন্যায় করেছি। জেলে ঢোকাও। কিন্তু শেষে কি কিছু প্রমাণ করতে পারল? পারল না। উলটে ওদের মুখে চুনকালি পড়ল। ফাইনালি কীসের জয় হয়? সত্যের।

বলতে বলতে আর কান-ফাটানো হাততালির শব্দের মধ্যে হঠাৎ খেয়াল করলেন, স্টেজের সামনে সেই ছেলেটা বসে আছে। ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে।

শুধু তা-ই নয়, উনি দেখলেন, প্রথম সারির একটা চেয়ারে ওর মা বসে আছেন। বসে আছেন ওর শ্রদ্ধেয় শিক্ষকরা, যাঁরা ওকে ভালো মানুষ, ভালো ছাত্র বলে ভাবতেন। স্নেহ করতেন। আজ তাদের সবার মুখ যেন বড়ো গম্ভীর।

ছেলেটা যেন ওর দিকে তাকিয়ে বলছে, আর লুকোবেন না। আপনার সব চুরি সবার কাছে ধরা পড়ে গেছে। যারা হাততালি দিচ্ছে, তারাও জানে। লুকিয়ে কী লাভ?

উনি মাইকের সামনে এগিয়ে গিয়ে বলে উঠলেন, আমি খুব দুঃখিত। একটা বড়ো ভুল করে ফেলেছি। আমার ও আরও কিছু মানুষের লোভের জন্য আমরা আজ লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর

জীবন বিপদে ফেলে দিয়েছি। একটা বড়ো অংশের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দিয়েছি।

জনতার আনন্দ চিৎকার যেন থেমে গেল। উনি ফের বলে উঠলেন, আমি খুব দুঃখিত আমার সব অপরাধের জন্য।

উনি একটু থামলেন। একটা চাপা গুঞ্জন উঠল জনতার মধ্যে। হরিহরবাবু কি পাগল হয়ে গেছেন, তদন্তকারী সংস্থা তো কিছুই অন্যায় খুঁজে পায়নি। এসব কী বলছেন!

উনি ফের বলতে শুরু করেন, আমি আমাদের করা সমস্ত অপরাধের প্রমাণ তদন্তকারী সংস্থার হাতে তুলে দেব। এই অন্যায় আমি আর লুকোব না। এখনও হয়তো সময় আছে। নিশ্চয়ই ভুলগুলো শোধরানো যাবে। যেভাবে শিক্ষাকে আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি, তাতে আগামী প্রজন্মের কোনো ভবিষ্যৎ নেই।

আমি গত কয়েক দিন শুধু এটাই ভেবেছি যে কী করে আবার সরকারি চাকরিতে যোগ্যতার ভিত্তিতে বিচার ফিরিয়ে আনা যায়। ভেবেছি, কীভাবে যারা যোগ্যতা সত্ত্বেও সুযোগ পায়নি, তাদের কীভাবে চাকরি ফিরিয়ে দেওয়া যায়! কীভাবে যারা অন্যায়ভাবে অযোগ্য হয়েও ঘুস দিয়ে চাকরি পেয়েছে, তাদের চাকরির থেকে বাদ দেওয়া যায়। একই সঙ্গে যারা যারা এর সঙ্গে যুক্ত আছে, তাদের সবার নাম কীভাবে জানানো যায়।

মাইকের তার কেটে গেল। জনতার মধ্যে চূড়ান্ত শোরগোল শুরু হয়েছে। এসব কী বলছেন হরিহরবাবু!

দলের কয়েকজন জোর করে টেনেহিঁচড়ে হরিহরবাবুকে স্টেজের থেকে বাইরে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে এল।

১৭

হরিহরবাবুর স্বীকারোক্তি

ব্রেকিং নিউজ

অজামিলের ভয়ে সব দুর্নীতি স্বীকার করে নিলেন হরিহরবাবু।

—এক্ষুনি জানা গেছে যে শিক্ষামন্ত্রী হরিহরবাবু শিক্ষা ও অন্য সরকারি চাকরিতে দুর্নীতির সব অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছেন। বলেছেন উনি একা নন। আরও যাঁরা ইনভলভড আছেন, তাঁদের সবার নাম প্রকাশ্যে আনবেন।

প্রশ্ন, আর কারা এতে যুক্ত আছেন! তাঁরা কী এ কথা মেনে নেবেন? কী হবে দলীয় অবস্থান?

আমরা এখনই চলে যাচ্ছি ভগবানপুরে। সেখানে আছেন আমাদের বিশেষ সংবাদদাতা গোবিন্দ নস্কর।

—কী খবর, গোবিন্দদা?

—শোনা যাচ্ছে না। কীসের খবর জানতে চাইছ রূপা?

—এখন তো একটাই খবর, গোবিন্দদা। হরিহরবাবু। উনি কী বলছেন? কী করতে চলেছেন উনি?

—সেটা আমিও জানি না। তবে হরিহরবাবু নাকি বার বার বলছেন, উনি আবার ভালো হয়ে যেতে চান। চরিত্র সংশোধনের জন্য জেলে যেতে চান। পুরো শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনতে চান। সবকিছু যাতে ঠিকভাবে হয়।

—কিন্তু সেটা কি সত্যি হবে? এ প্রশ্ন আমাদের সবার। অন্যদের কথা কি কিছু বলেছেন? অন্য কারা এর সঙ্গে যুক্ত ছিল?

—হ্যাঁ, বলেছেন, সেটা করতে গেলে গাঁ বাছতে ঠগ উজাড় হয়ে যাবে। অনেকেই জড়িত আছে এর সঙ্গে।

—কথাটা বোধহয় ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হবে।

—আমাকে ভুল ধরাতে যেয়ো না রূপা। তুমিও সেদিন খবরে মুক্তোবনে উলু ছড়ানো বলেছিলে। আরও বলব?

—আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না। একদম শোনা যাচ্ছে না, গোবিন্দদা।

—চালাকি কোরো না। দিব্যি শোনা যাচ্ছে। বাংলায় মাধ্যমিকে নাকি খুব ভালো করেছিলে? টুকে?

লাইন কেটে দিল রূপা।

—যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য আমাদের বিশেষ সংবাদদাতার সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। রূপার সঙ্গে থাকুন। দুঃখে থাকুন। দুঃখ চ্যানেলে।

১৮

তন্ময়বাবুর বোধোদয়

কেরিয়ারে এত তাড়াতাড়ি পদোন্নতি খুব কম পুলিশ অফিসারের হয় যেমন তন্ময় ঘাটির হয়েছে। তার প্রথম কারণ অবশ্যই ওর মতো দক্ষ পুলিশ অফিসার খুব কম হয়। দ্বিতীয় কারণ উনি টাকার জন্যে কোনোরকম অন্যায় করতে সামান্যতম দ্বিধা করেন না। ভালো লোকদের মধ্যে জট হয় না। খারাপ লোকেদের মধ্যে হয়। খুব শিগগিরি খারাপ লোকেরা, রাজনীতির কিছু নেতা বুঝল তাদের তন্ময়ের মতো একজনের খুব দরকার।

এতে তন্ময় যে শুধু ক্ষমতার কেন্দ্রে বসে আছেন তা-ই নয়। ওঁর কাছে অনেক গোপনীয় তথ্য আছে। সেজন্য ওঁকে সবাই বেশ ভয় পায়। বড়ো নেতা থেকে অর্থবান ব্যবসায়ী সবাই

সমঝে চলে ওঁকে।

এখন আর তন্ময়ের অপরাধ করতে সামান্যতম দ্বিধা হয় না। যেকোনো স্ক্যাম বা দুর্নীতিকে কীভাবে আড়াল করতে হয়, সেটা উনি খুব ভালো জানেন।

বলা যায়, পুলিশের কাজটার বাইরে দুর্নীতির কনসালট্যান্সি চালান।

সেই লোকটাই আজ চিঠিটা পেয়ে খুব অবাক হলেন। ওর নামে চিঠি। লেখা আছে—যেখানেই থাকুন-না কেন, আগামীকাল রাত বারোটার মধ্যে মারা হবে। অন্যায়কে যেভাবে প্রশ্রয় দিয়েছেন, তার জন্য।

নীচে লেখা— অজামিল।

মুচকি হাসলেন তন্ময়বাবু। তাহলে তাঁকেও ভয় দেখানোর মতো কোনো লোক আছে। উনি চাইলেই খুব ভালো নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারেন। তাহলে কি তাঁকে ধরতে গিয়ে অজামিল ফাঁদে পা দেবে?

ঠিক করলেন, আগামী চব্বিশ ঘণ্টা কোথাও বেরোবেন না। কিন্তু যত সময় যেতে লাগল, কীরকম একটা অজানা ভয় যেন তাঁকে গ্রাস করতে শুরু করল। কীভাবে জানি, মিডিয়ার কাছেও খবরটা পৌঁছে গেছে। অনেকেই জানে তন্ময়বাবুর মতো দুর্নীতিগ্রস্ত পুলিশ অফিসার কমই হয়।

প্রত্যেকটা ঘণ্টার সঙ্গে সঙ্গে তন্ময়বাবুর ভয়টা যেন আরও বাড়তে লাগল। এমনকী দুপুরে ঘরে কাজ করার সময়ও চারজন গার্ডকে ঘরের মধ্যেই থাকতে বললেন।

শেষে রাত বারোটা বেজে গেলে আনন্দে একটু নেচেও নিলেন। তাহলে অজামিল ঢুকতে পারেনি। পারবেই বা কীভাবে? চারদিকে যেরকম নিরাপত্তা বেষ্টনী।

পরের দিন সকালে দেখা গেল, তন্ময়বাবুর দেহ ফ্যানের থেকে ঝুলছে। মারা গেছেন ভোর চারটে নাগাদ। কীভাবে মারা গেছেন, সেটা ঘরের বাইরে থাকা দুজন গার্ডও বুঝতে পারেনি। জানলা দিয়ে ঢুকে কীভাবে জানি হত্যা করে গেছে। কিন্তু এত পাহারার মধ্যে দিয়ে তিনতলার ঘরে দেওয়াল বেয়ে উঠল কী করে?

আরেকটা চিঠিও পাওয়া গেল ঘরে। অজামিলের লেখা।

তাতে লেখা—ঠিক করলাম গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড টাইমটাই ফলো করা উচিত। সেভাবেই হিসেব করে মারলাম। যে বা যারা অন্যায় করবে, লোক ঠকাবে, সাধারণকে বঞ্চনা করবে, তাদের আমি মারব। কেউ আটকাতে পারবে না। এখনই পালান। নয়তো আপনার হাতে সময় খুব কম।

১৯

কে অজামিল?

নিউটাউন লাইব্রেরিতে ঋকের সঙ্গে আজ সাম্প্রতিককালের বাংলা বই নিয়ে অনেক আলোচনা হল। ও গল্পের বই পড়তে খুব ভালোবাসত। এখনও দেখলাম, নিয়মিত পড়ে।

তারপরে ও আমাকে একটা কাছাকাছি ক্যাফেতে খাওয়াতে নিয়ে গেল। এসব জায়গায় আমি কোনোদিন আসিনি আগে।

বেশ বড়ো ক্যাফে। অনেক ধরনের খাবার, কফি। অনেক আড্ডা হল।

ওকে বললাম, যা-ই বলিস, একটা ছেলে কিন্তু আমাদের সমাজটা অনেক পাল্টে দিয়ে গেল। যেটা বিরোধী দলগুলো করতে পারেনি, কোনো শক্তিশালী নেতা করতে পারেনি, সেসব কাজই করে দেখাল ওই ছেলেটা। মনে হয়, এবার থেকে আবার স্বচ্ছভাবে ঠিকভাবে পরীক্ষা হবে। দেখি, এবারে আমার কী হয়! তবে যা পরিশ্রম করেছি গত চার বছর ধরে, এবারে হওয়া উচিত।

—তোর এবারে অবশ্যই হবে। নিজের উপরে ভরসা রাখ। আশা করি, সবকিছুর মূল্যায়ন ঠিকভাবে হবে। এখন লোকে অন্যায় করতে ভয় পাচ্ছে। তবে এ ভয় কতদিন থাকবে, সেটা জানি না। আসলে একটা বড়ো অংশের মানুষ এখনও মুখে যা-ই বলুক-না কেন, অন্যায়কে মেনে নিতে অভ্যস্ত। শুধু তা-ই নয়, তারা নিজেরাও যে কোনো বিষয়ে নিজের সুবিধের জন্য অন্যায় করতে দ্বিধা করা না। সেজন্য এরকম দুর্নীতির ইকোসিস্টেম গড়ে ওঠে।

—হ্যাঁ, সেটাই সমস্যা। এই যে শিক্ষা নিয়ে এত বড়ো দুর্নীতি হল, এ তো সাধারণ মানুষের একটা অংশের অংশগ্রহণ ছাড়া হতে পারে না। তুই ভাব, সামান্য একটা চাকরি অন্যায়ভাবে পাওয়ার জন্য সব মূল্যবোধ বিসর্জন দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা ঘুস দিতে তারা প্রস্তুত। অজামিলের জন্য যদি তাদের মনোভাবে পরিবর্তন হয়, তবে এ পরিবর্তন স্থায়ী হবে।

একটু থেমে ফের বলে উঠলাম, আচ্ছা, সেদিনের সে লোকটাকে তোর মানে আছে?

—কোন লোকটা?

—সেই যে আমরা খাচ্ছিলাম, পাশ থেকে একটা লোক বলে গেল, অন্যায়কে প্রতিবাদ করার ব্যাপারে, তার গায়ের রং কিন্তু বেশ কালো ছিল। ছোটোখাটো চেহারা ছিল। হয়তো সেই লোকটাই অজামিল?

—হ্যাঁ, সে তো হতেই পারে! আসলে আমরা প্রত্যেকে যদি ওই লোকটার মতো হতে পারতাম, অজামিলের মতো হতে পারতাম, তাহলে আমাদের সমাজে কোনোদিন এরকম সমস্যা হত না।

এরকম আরও অনেক কথা হল আমাদের মধ্যে।

কথা বলতে বলতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। হাতঘড়িতে রাত সাড়ে এগারোটা। ও বলে উঠল, চল, এরপরে বাস পাব না। বেরোনো যাক।

দুজনে মিলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। বেরিয়েই বুঝতে পারলাম, এত রাত করাটা একদম ঠিক হয়নি। সন্ধে সাতটার সময় যে জায়গাটা জমজমাট ছিল, এখন এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সেসব জায়গা একদম শুনশান হয়ে গেছে। আশপাশের আই.টি. পাড়া যেন হঠাৎ করে ঘুমিরে পড়েছে।

আমরা ছাড়াও একটা কমবয়সি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাস স্টপেজে। বেশ ভালো দেখতে। মুখ-চোখ দেখলেই বোঝা যাচ্ছে, মেয়েটা বেশ চিন্তিত ও বেশ খানিকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

মনে হল, কারো সঙ্গে ফোনে কথা বলছে। ফোন ছাড়ার পর আমাদের দিকে একবার এগিয়ে এসে বলল, আজ অফিসে অনেক দেরি হয়ে গেল। এখন অনেকক্ষণ ধরে বাসের জন্য অপেক্ষা করছি। জানি না কখন আসবে।

আমরা আশ্বস্ত করলাম যে বাস নিশ্চয়ই আসবে। আমরা অবশ্য অন্যদিকে যাব। বাস না পেলে ট্যাক্সি ধরব। হয়তো কিছুটা দূর অব্দি আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে সেক্ষেত্রে। সেটাও জানালাম। মেয়েটা ফের দূরে গিয়ে দাঁড়াল।

মিনিট দশেক পরে একটা বেশ দামি গাড়ি এসে দাঁড়াল বাস স্টপেজে। একটা ছেলে, যে ড্রাইভারের পাশের সিটে বসেছিল, জানলা নামিয়ে মেয়েটাকে উদ্দেশ করে বলে উঠল, লিফট লাগবে?

মেয়েটা একটু অবাক হয়ে এগিয়ে গেল গাড়িটার দিকে। আশাতীত অফার। বলে উঠল, কোনদিকে যাচ্ছেন?

আমরা দূর থেকে লক্ষ করছিলাম। গাড়ির মধ্যে চারজন ছেলে। তাদের কাউকেই দেখে অভিসন্ধি ভালো মনে হল না। জোরে একটা হিন্দি গান চলছে। গাড়ির মধ্যে ভুরভুর করছে মদের গন্ধ।

ছেলেটা মেয়েটার প্রশ্নের উত্তরে সিগারেটের ধোয়া ছেঁড়ে একটু কুটিল হাসি হেসে বলে উঠল, যেদিকে বলবে, সেদিকে যাব।

মেয়েটা বুঝল, এরা অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে জিজ্ঞেস করছে। পিছিয়ে এল। বলে উঠল, না, না। আমি বাসের জন্য অপেক্ষা করব। ধন্যবাদ।

গাড়িটা তবু গেল না। গাড়ি থেকে এবারে নেমে এল দুটো ছেলে। বেশ লম্বা চওড়া চেহারা। দেখেই বোঝা যায়, ভালো টাইপের নয়।

এগিয়ে এসে মেয়েটার হাত ধরে টানতে টানতে গাড়িতে তোলার চেষ্টা করল।

আমি প্রতিবাদ করতে এগিয়ে গেলাম। বলে উঠলাম, কী করছেন আপনারা? ওকে জোর করে তুলছেন কেন?

দুজনের মধ্যে একজন হঠাৎ করে একটা রিভলভার বার করে আমার মাথায় ঠেকিয়ে বলে উঠল, সর—সর, বেশি দরদ হচ্ছে, তা-ই না? একদম মাথা লক্ষ করে ট্রিগার চালিয়ে দেব। হিরোগিরি হচ্ছে আমাদের সঙ্গে? কে জানিস আমরা?

মেয়েটাকে আবার দুজন টানতে টানতে গাড়ির দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। মেয়েটা ভয়ে কাঁদতে শুরু করছে। চেঁচাচ্ছে। কিছু গাড়ি না থামিয়ে পাশ দিয়ে হাইস্পিডে চলে গেল।

আমি অবাক হলাম, আমার পাশে ঋক চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে এখনও। যেন ও কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। আমি যদ্দূর জানি ও খুব সেন্সিটিভ, খুব ভালো স্বভাবের, সাহসী। ওকে অন্তত আমি অন্য সবার থেকে অন্যরকম ভেবেছিলাম। ওরও আমার মতো এগিয়ে আসা উচিত ছিল। ভুল ভেবেছিলাম।

মেয়েটার জামা টানাহ্যাঁচড়ায় ছিঁড়ে গেছে। তবু সেই অর্ধনগ্ন অবস্থায় ওকে টেনে তোলা হচ্ছে গাড়িতে। আমি আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না। ছুটে গিয়ে ধাক্কা দিলাম ওই দুজনের একজনকে। সে ঘুরে দাঁড়াতে আমার গায়ের সব জোর একত্র করে মুখে মারলাম এক ঘুসি। বলা যায় জীবনের প্রথম ঘুসি।

কিন্তু ছেলেটা সেটা সামলে কনুই দিয়ে আমার মুখে জোর আঘাত করল। গায়ে বেশ জোর। আমি ছিটকে মাটিতে পড়লাম। ইতিমধ্যে আরও একটা লোক গাড়ি থেকে নেমে এল। দেখি, সে একটা রড নিয়ে তেড়ে আসছে আমার দিকে। আমার মাথা লক্ষ করে জোরে লোহার রডটা চালাল। কিন্তু আমার মাথায় লাগার ঠিক আগের মুহূর্তে দেখি, ওটা থেমে গেল।

কোনো একজন অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় রডটা ধরে ফেলেছে। কুচকুচে কালো তার গায়ের রং। মুখে একটা মুখোশ। অজামিল।

কোত্থেকে এল! তারপর যেটা হল, সেটা আমি কোনোদিন সামনে থেকে দেখব ভাবিনি। রডটা কেড়ে নিয়ে সেটা দিয়ে সজোরে আঘাত করল গাড়ির থেকে নেমে-আসা সেই লোকটার কোমরে। লোকটা আঁক করে একটা আওয়াজ করে পরে গেল। আরেকজন রিভলভার চালানোর আগেই পা দিয়ে অজামিল তাকে আঘাত করল। রিভলভারটা ছিটকে গিয়ে দূরে পড়ল। গাড়ির ড্রাইভার ইতিমধ্যে নেমে এসেছে। তার হাতে একটা ধারালো ছোরা।

তারপর শুরু হল অসম লড়াই। হ্যাঁ, অসমই বলব কারণ অজামিল একই সঙ্গে চারজনকে যেভাবে পেটাতে শুরু করল, সেরকম মার আমি আগে কখনো দেখিনি। একজনকে আকাশে প্রায় পনেরো ফুট উপরে ছুড়ে দিল। লোকটা মাটিতে পড়ে আর নড়ল না। দুজনের হাত মটমট করে আমার সামনেই ভাঙল। কিছুক্ষণ বাদেই দেখলাম রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে আছে চারজনের দেহ। একজন অজ্ঞান, বাকি কজন মাটিতে শুয়ে কাতরাচ্ছে। মনে হয়, হাত আর পায়ের বেশ কয়েকটা হাড় ভেঙে গেছে ইতিমধ্যেই।

আমি ও মেয়েটা অবাক হয়ে দেখছিলাম। কথা বলার অবস্থাতেও ছিলাম না।

অজামিল এবারে ওদের গাড়িতে উঠে আমাকে ও ওই মেয়েটাকে ওই গাড়িতে উঠতে নির্দেশ দিল। অবাক হয়ে দেখলাম ঋক নেই। কোথায় গেল? এখানেই ও ছিল।

চাবি গাড়িতেই ছিল।

—তাড়াতাড়ি গাড়িতে বোসো।—ফের বলে উঠল অজামিল।

এবারে বুঝতে পারলাম। চেনা গলা। ঋকের গলা।

মেয়েটা অবাক বিস্ময়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। কাঁদতে কাঁদতে বলে উঠল, থ্যাঙ্কস অজামিল। থ্যাঙ্কস দাদা, তোমাকেও। তোমাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ। আজ তোমাদের জন্যই জীবন ফিরে পেলাম। আমি তোমার খুব বড়ো ফ্যান, অজামিলদা। কোনোদিন এভাবে দেখা পাব আশা করিনি।

অজামিল কোনো উত্তর দিল না। গাড়ি চালাতে চালাতে পুলিশকে ফোন করে বলল এই ঘটনার কথা। জানাল, যাতে অপরাধীদের হাসপাতালে নিয়ে যায়।

আমরা চুপ করে বসে ছিলাম। আমি ইচ্ছে করে কথা বলছিলাম না। আমিও চাইনি ঋকের পরিচয় ফাঁস হয়ে যাক। মেয়েটাকে ওর বাড়ির সামনে ড্রপ করে গাড়িটা কিছু দূরে একটা অচেনা রাস্তায় ছেড়ে দিল অজামিল ওরফে ঋক। আমাকে নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে গেল।

মুখোশ ফেলে দিল। এবারে হঠাৎ করে দেখলাম ওর রং আর কালো নেই। ফরসা হয়ে গেছে। যেটা ওর স্বাভাবিক রং।

হাঁটতে হাঁটতে বলে উঠল, জানি, তোর উপর ভরসা করা যায়। কিন্তু তবু বলছি, আমার কথা তোর বাবা-মা-কেও বলবি না। গায়ের রং বদলানোর ক্ষমতাটা আমার ছোটোবেলা থেকেই ছিল। কিন্তু আমি নিজে জানতাম না। আমার আরও বেশ কিছু ক্ষমতা আছে, যা তুই কিছুটা জানিস।

এতক্ষণে বলে উঠলাম, কিন্তু তুই আসলে কে? কী করে এসব ক্ষমতা পেলি?

ও মুচকি হেসে বলে উঠল, আমার মা-র কাছে গল্পটা শুনেছিলাম। আমাকে আমার বাবা একটা নর্দমার ধারে খুঁজে পেয়েছিল। আমাকে নিয়ে আসে। আমার গায়ে একটা ছোটো নীল রঙের চাকতি ছিল। খুব অন্যরকম বলেই ওটা সরিয়ে যত্ন করে রেখেছিল। আমি একটু বড়ো হয়ে ওই চাকতিটা বাড়িতে খুঁজে পাই। আমার মনে হয়, আমার সব রহস্য ওই চাকতির মধ্যেই লুকোনো আছে। কিছুটা জেনেছি। হয়তোপুরোটা ভবিষ্যতে জানব।

আরেকটা কথা। তুই ঘুসিটা কিন্তু ভালোই চালিয়েছিলি। একটু প্র্যাকটিস করিস।

আমি আমার মুখের ব্যথা আর ভাঙা দাঁত নিয়ে হেসে উঠলাম। ওই ছেলেটার কনুইয়ের গুঁতোয় ছিটকে পড়েছিলাম।

বলে উঠলাম, কিন্তু তুই শুরুতে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলি কেন?

ও হেসে বলে উঠল—আমি তোর কাছে ধরা দিতে চাইনি। সেজন্যে একটু দ্বিধা করছিলাম। মনে রাখবি, তুই একাই আজ এই রহস্য জানলি। আর কেউ কোনোদিন জানবে না যে ঋক আর অজামিল এক লোক। এটা জানলেই আমি ধরা পড়ে যাব। আমি চাই একদম সাধারণ হতে। তোর মতো। তবে সাধারণ হয়েও যে সবার অন্যায়ের প্রতিবাদ করার অধিকার আছে, ক্ষমতা আছে, সেটা আমি দেখিয়ে দিতে চাই। আর কতদিন আমরা চুপ করে থাকব?

এই যেমন তুই আজ জেগে উঠলি। ভয় না পেয়ে মেয়েটাকে বাঁচাতে এগিয়ে গেলি। আমি চাই, এভাবেই সবাই অন্যায় সহ্য না করে জেগে উঠুক, প্রতিবাদ করুক। তার জন্য অজামিলকে লাগবে না। লাগবে না অন্য গ্রহ থেকে আসা কোন ভিনগ্রহীর সাহায্যও।

শেষ লাইনটা বলার সময় মনে হল, ঋকের ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ছিল। আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে ফের বলে উঠল, আমি যেই হই-না কেন, মনে রাখবি আমার একজনই বন্ধু, সে হলি তুই। কিন্তু তোকে আমি অন্যায়ভাবে কোনোদিন সাহায্য করব না। জানি, তুই একাই পারবি।

২৯আগস্ট২০২২

লুবেক, জার্মানি

অনিলিখা ও বোহাস ক্যাসলের প্রেতাত্মা

১

তন্ময় ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে কী যেন দেখছিল। খানিক বাদে ফিরে এসে সোফায় বসে বিড়বিড় করে বলে উঠল, সতেরোটা বড়ো বড়ো কালো পিঁপড়ে। পর পর লাইন দিয়ে জানলা দিয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকে এল।

আমি অবাক হয়ে বলে উঠলাম, তো? তুই পিঁপড়ের সংখ্যাও আজকাল গুনতে শুরু করেছিস।

অন্যরা সবাই হেসে উঠল। আসলে হাসার কারণও ছিল। গত কয়েকদিন ধরে তন্ময়কে এ এক অদ্ভুত নেশায় পেয়েছে। সংখ্যার নেশায়। কথায় কথায় অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে আর কিছুক্ষণ বাদে বাদে একটা সংখ্যা আওড়াচ্ছে।

কিছুক্ষণ আগেই মাথার উপরে ঝাড়বাতির আলো দেখে বলে উঠেছে, ন,-ন'টা আলো। কোনো মানে হয় এতগুলো আলো একসঙ্গে জ্বালানোর!

আগের শনিবারে এখানে এসে বুককেসের সামনে বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। আমরা প্রথমে খেয়াল করিনি। তারপরে হঠাৎ করে বলে উঠেছে,— বাহ, বুককেসের বিভিন্ন তাকে বইয়ের সংখ্যাগুলো তো বেশ ইন্টারেস্টিং। একদম উপরের তাকে ১৩, তার পরের তাকে ১৭ টা, একদম নীচের তাকে ২৩টা।

আমরা অবাক হয়ে বলে উঠেছিলাম, তাতে কী হয়েছে?

—সে কী! বুঝলি না। সব ক-টাই প্রাইম নাম্বার।

তা যা-ই হোক, এসবের জন্যই আজ আমাদের আলোচনা তন্ময়কে কেন্দ্র করে। আরও স্পেসিফিক্যালি বলতে গেলে তন্ময়ের এই সংখ্যায় অকারণ আগ্রহ নিয়ে।

তন্ময় নানানভাবে সংখ্যার তাৎপর্য নিয়ে আমাদের বোঝানোর চেষ্টা করছে আর আমরা ওকে একা পেয়ে অভিমন্যুর মতো একের পর এক যুক্তির জালে ঘিরে ধরেছি, এর মধ্যে বাইরে সেই চেনা জুতোর আওয়াজ।

আর তার পরক্ষণেই অনিলিখাদি ঘরে এসে ঢুকল। পরনে নীল সালোয়ার- কামিজ। হাতে ফোল্ডিং ছাতা।

জুতো খুলতে খুলতে বলে উঠল, সংখ্যার প্রতি এই আগ্রহটা কিন্তু হওয়াই স্বাভাবিক। অনেক রহস্যই শুধু এই সংখ্যার উপরে দাঁড়িয়ে থাকে।

এ যে মেঘ না চাইতেই জল। অনিলিখাদি যে আজ পুরো গল্প বলার মেজাজে আছে, তা বুঝতে আমাদের একটুও সময় লাগল না। এ ছাড়া আজকের দিনটা গল্পের জন্যও একদম পারফেক্ট। খানিক আগে বেশ একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। মার্চের শুরু। কয়েকদিন বেশ গরম পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু বৃষ্টির জন্যই এখন আবার যেন শীতের খানিকটা আমেজ ফিরে এসেছে।

কিছুক্ষণ বাদে গোপালদার দোকান থেকে অর্ডার দিয়ে আনানো ঠিক আঠেরোটা মাছের কচুরি সামনের টেবিলে রাখামাত্র অনিলিখাদি গল্প শুরু করল।

এরিক কার্লসনের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ স্টকহোমের এক ক্লাসিক্যাল কনসার্টে। কনসার্টের পরে একটা ডিনার ছিল। সেখানে আমার বন্ধু বিজ্ঞানী ইভাই আমাকে আলাপ করিয়ে দিল এরিকের সঙ্গে। শুনলাম এরিক সুইডেনের রাজপরিবারের সদস্য। তবে এরিক স্টকহোমের রাজপ্রাসাদে থাকে না। থাকে স্টকহোম থেকে প্রায় একশো মাইল দূরের একটা আইল্যান্ডে। এরিকের বয়স ষাটের কাছাকাছি হবে। মাথাভরা টাক। চওড়া গোঁফ। উজ্জ্বল চোখের উপরে সাবেকি ডিজাইনের সোনার চশমা। বেশ ভারী গমগমে গলা।

আমি বলে উঠলাম, সুইডেনেও রাজপরিবার আছে?

—হ্যাঁ, রাজপরিবার কি শুধু ইংল্যান্ডেই আছে! ইয়োরোপের প্রায় সব দেশেই আছে। স্টকহোমের কেন্দ্রেই সুইডেনের রাজপরিবারের বিশাল রাজপ্রাসাদ আছে। তোদের সুইডেনের রাজপরিবার নিয়ে কিছু দরকারি কথা একটু বলে নিই। সুইডেনের লিখিত ইতিহাস খুব পুরোনো নয়। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে সুইডেন দেশ হিসেবে মোটামুটি একটা পরিচয় পেতে থাকে। সে সময় থেকেই সুইডেনের রাজপরিবারের লিখিত ইতিহাস শুরু বলা যায়। তবে সে সময় সুইডেন বলতে বোঝানো হত বর্তমান সুইডেনের দক্ষিণের অংশ আর এখনকার ফিনল্যান্ডের কিছু অংশ।

ইয়োরোপের অন্য দেশের মতো মধ্যযুগে সুইডেনেও যুদ্ধ— রক্তারক্তি কিছু কম হয়নি। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ থেকে সুইডেনের সঙ্গে ডেনমার্ক আর নরওয়ের সম্পর্ক খারাপ হতে শুরু করে। ১৫২০ সালে ডেনমার্কের এক রাজা দ্বিতীয় ক্রিস্টান সুইডেনের বনেদি পরিবারের সব সদস্যকে হত্যার আদেশ করেন। স্টকহোমের কেন্দ্রে এখনও সে ঘটনার স্মারক হিসেবে একটা মূর্তি আছে। সুইডেনের বনেদি পরিবারের একজন সদস্য সেদিন ওখানে ছিলেন না বলে বেঁচে যান। পরে সেই সদস্য গুস্তাভ ভাসা ১৫২৩ সালে সুইডেনের রাজা হন। স্বাধীন সুইডেন প্রতিষ্ঠা করেন। আজ যাঁর কথা বলব, সেই এরিক ওই বংশেরই সন্তান।

একটু আলাপ হতেই বুঝলাম যে এরিক খুব কম কথা বলার লোক। সুইডিশরা এমনিতেই কম কথা বলে। তবে ইনি আরও কম কথা বলেন। হাবেভাবে একটা রাজকীয় আভিজাত্য আছে। প্লেট থেকে প্রত্যেকটা খাবার নেওয়ার মধ্যেও রাজকীয় কিছু অলিখিত নিয়ম ও ভদ্রতা—সৌজন্য মেনে সবকিছু করছিলেন।

ইভাই বেশি কথা বলছিল। কথাপ্রসঙ্গে আমার সম্বন্ধেও অনেক কথা বলতে শুরু করে দিল। আমার বিভিন্ন রহস্য-অ্যাডভেঞ্চারের কথা। আমার বিষয়, আমার রিসার্চের কথা। ইভা আমাকে খুব পছন্দ করে। তাই কিছুটা বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলছিল আর কী!

এরিক কথা না বললেও খুব মন দিয়ে শুনছিলেন। মাঝেমধ্যে আমার অতীতের কিছু ঘটনা—যেমন সংকেত রহস্যের সময়ে পেরুর অভিজ্ঞতা নিয়েও দুটো প্রশ্ন করলেন। বেশ বুঝতে পারছিলাম, এ ধরনের ঘটনায় ওঁর যথেষ্ট আগ্রহ আছে। একই সঙ্গে যথেষ্ট পড়াশোনা ও ঘোরার অভিজ্ঞতাও আছে। লিমার আর্ট মিউজিয়ামের সামনের রাস্তার নামও দেখলাম ওঁর মনে আছে।

আমি নিজে অবশ্য আমার গল্প তেমন কিছু বলিনি। বলার অবস্থায় ছিলাম না বলাই ভালো। একটা আধচেরা বিশাল আধসেদ্ধ চিংড়ি কাঁটাচামচ দিয়ে খেতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছিলাম। এরিক রাজকীয় কায়দায় কীভাবে সেটাকে খান, সেটা মাঝে মধ্যে আড়চোখে দেখছিলাম। কিন্তু উনি এই জটিল কাজটা এত সহজে করে ফেললেন, বুঝলাম দীর্ঘ অনুশীলন ছাড়া আমার পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। শেষে হাতই ব্যবহার করতে হল।

ওঁর সঙ্গে কথা বলার জন্য মিডিয়ার বেশ কয়েকজন লোক অপেক্ষা করছিল। ডিনারের পরে আর তেমন কথা হল না।

ইভাই জানাল যে এরিক নাকি বেশ জনপ্রিয়। বিভিন্ন চ্যারিটি সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকেন। এ ছাড়া এখানকার বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতেও অনেক অর্থ অনুদান করেন।

ইভাকে জিজ্ঞেস করলাম, এরিকের ক্যাসল দেখতে যাওয়ার কোনো উপায় আছে কিনা।

ইভা বলে উঠল, আমিও কখনো যাইনি। স্টকহোম থেকে বেশ খানিকটা দূরে। প্রাইভেট আইল্যান্ড। খুব কম লোকই সে ক্যাসল দেখার সুযোগ পেয়েছে। সুইডেনের অন্য বেশ কিছু ক্যাসল আছে, যা দেখা যায়। বিশেষ দিন—বিশেষ সময়ে ঢোকাও যায়। স্টকহোমের প্রাসাদটাও দেখে আসতে পারো। ওটা খুব বড়ো। দারুণ। কিন্তু এরিকের ক্যাসলে সাধারণের যাওয়ার অনুমতি নেই।

এখানে একটা কথা বলে রাখি, সুইডেনে অজস্র ছোটো ছোটো আইল্যান্ড আছে। বেশির ভাগ এই আইল্যান্ডগুলো ছোটো ছোটো ব্রিজের মাধ্যমে যুক্ত। এমনকী স্টকহোম বলতে

আমরা যা বুঝি তাও কিন্তু এরকম বারোটা দ্বীপের সমষ্টি। তাই এরিক যে ক্যাসলে আছে, তা যে একটা বিচ্ছিন্ন আইল্যান্ডে, তাতে খুব অবাক হওয়ার কিছু নেই।

সুইডেনের লোকেরা নিজেদের মধ্যে কথা খুব কম বললেও, টেলি যোগাযোগব্যবস্থায় সুইডেনের একটা বড়ো অবদান আছে। এরিকসনের মতো কোম্পানির তো এখানেই শুরু। এরিকসনের একটা বড়ো স্ট্যাচু আছে স্টকহোমের মেন স্টেশনের সামনেই। আমার কাজ ওখানে এরকম একটা কোম্পানি 'টেলিয়া'র সঙ্গে ছিল। মাত্র এক মাসের জন্য আসা। আবার যে এরিকের সঙ্গে দেখা হবে, এরকম কোনো আশা ছিল না। কিন্তু সেটাই হল। শুধু হল না, ঘটনাটার কথা মনে পড়লে এখনও আমার রোম খাড়া হয়ে যায়।

খেয়াল করিনি যে এর মধ্যে বাসন্তীদি কখন আমাদের সবার জন্য চা দিয়ে গেছে। অনিলিখা একটু থেমে চায়ের কাপে একবার চুমুক দিয়ে আবার শুরু করল।

তা যা বলছিলাম। এর কিছুদিন পরের কথা। শুক্রবার। অফিসে একটা মিটিং-এ আছি। হঠাৎ ফোন। প্রথমবার ধরলাম না। দ্বিতীয়বার একই নাম্বার থেকে আবার ফোন পাওয়ার পরে মিটিং থেকে বেরিয়ে ফোন ধরলাম। উলটোদিকে বেশ ভারী গলা। এরিকের। সেদিন আমার ফোন নাম্বার নিয়েছিলেন, কিন্তু এরকম ফোন কোনোদিন করবেন, তা আশা করিনি।

একটু দ্বিধা করে যেন এরিক বলে উঠলেন, তুমি কি আমার বাড়ি একটু আসতে পারবে? একটু জরুরি কথা ছিল। খুব জরুরি।

বলা বাহুল্য, যাওয়ার এই সুযোগ কেউ ছাড়ে? আনন্দটা সামলে কোনোদিন যেতে পারি, জিজ্ঞেস করলাম।

—কাল, অর্থাৎ এই উইকএন্ডে যদি আমার বাড়িতে আসতে পারে, খুব ভালো হয়। তোমাকে আমি অবশ্য জোর করব না।

বুঝতে অসুবিধে হল না, উনি কিছু একটা বলতে দ্বিধা করছেন।

বলে উঠলাম, আমি একটু বাদে আপনাকে কনফার্ম করছি। কিন্তু কী ব্যাপার তা একটু বলতে পারবেন?

—সামনাসামনি বলব। আসবে কি না জানিয়ে দিলে, আমার সেক্রেটারি আপনাকে বাড়ির অ্যাড্রেস, কোথায় আসতে হবে, আমরা কোথা থেকে তোমাকে পিক আপ করব, সব জানিয়ে দেবে। দরকার হলে আমরা স্টকহোম থেকেও নিয়ে আসতে পারি। কিন্তু এক ঘণ্টার মধ্যে জানাবে।

জানাব বলে ফোন ছেড়ে দেওয়ার পরে ইভাকে ফোন করলাম।

ইভা শুনেই বলে উঠল, এ সুযোগ কেউ ছাড়ে! খুব কম লোকই ওঁর বাড়ি যাওয়ার সুযোগ পায়। সুইডেনের সব থেকে পুরোনো ক্যাসলের মধ্যে এটা একটা। তা ছাড়া দীর্ঘদিন ধরে ওটাই ছিল আসল রাজপ্রাসাদ। স্টকহোমের প্রাসাদ তো অনেক পরে হয়।

উইকএন্ডে বেশ কিছু কাজের প্ল্যান থাকলেও সেসব ক্যানসেল করে ফোন করে জানিয়ে দিলাম যে আমি যাচ্ছি। এর কিছুক্ষণ বাদেই ওঁর সেক্রেটারি এক মহিলার ফোন পেলাম। কীভাবে যাব, কোথায় আমাকে পিকআপ করা হবে, যাবতীয় তথ্য খুব সুন্দরভাবে মহিলা আমাকে বুঝিয়ে দিলেন।

২

পরদিন ভোর পাঁচটায় বেরিয়ে পড়লাম। স্টকহোম থেকে দেড় ঘণ্টার ট্রেন। সুইডেন ও নরওয়ের বর্ডারের কাছে 'কিল' বলে এক স্টেশনে নামলাম। সেখানেই কথামতো আমার জন্য গাড়ি অপেক্ষা করছিল। একটা বছর দশেকের পুরোনো রোলস রয়েস। এক বৃদ্ধ ড্রাইভার। সে-ও খুবই কম কথা বলে। খুব প্রত্যন্ত জায়গা। পাহাড়, উপত্যকা, জঙ্গল পেরিয়ে প্রায় এক ঘণ্টা যাওয়ার পরে একটা ছোটো ব্রিজ পড়ল। ব্রিজ পেরিয়ে আমরা বোহাস আইল্যান্ডে ঢুকে গেলাম। শুনলাম প্রায় ছ-শো একর মতো জায়গা। পুরোটাই রাজপরিবারের অর্থাৎ এখন এরিকের। আইল্যান্ডের পাহাড়িপথ পেরিয়ে মিনিট পাঁচেক যেতেই দূরে অনেক উঁচুতে একটা ক্যাসল চোখে পড়ল।

পথে দুটো বড়ো গলফ কোর্স আর বেশ কিছু ছড়ানো-ছিটানো বাড়িও চোখে পড়ল।

এপ্রিলের শুরু। তীব্র শীতের থেকে সবে তখন খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসছে সুইডেনের বন-প্রান্তর। মার্চেও এখানে অনেক জায়গা বরফে ঢাকা থাকে। উষ্ণতা থাকে শূন্যের অনেক নীচে। পাঁচ-ছ-ঘণ্টার বেশি দিনের আলোও থাকে না।

এপ্রিল পড়তেই দিনের সময় খানিকটা বেড়ে গেছে। আলো থাকছে সাড়ে সাতটা অব্দি। উষ্ণতা যদিও এখনও দশ ডিগ্রির নীচে থাকছে। বাইরে বেরোলে আমাকেও একটা লংকোট পরে থাকতে হচ্ছে। গাছে নতুন পাতা এসেছে। নানান রঙের ফুলে সেজে উঠেছে প্রকৃতি। ফুলের গন্ধে বাতাসে বসন্তের আগাম খবর।

পাহাড়ি পথ ধরে আরও মিনিট দশেক যাওয়ার পরে ক্যাসলটা সামনে এল। ক্যাসলটা আইল্যান্ডের মধ্যে একটু উঁচু জায়গায়। বেশ চড়াই পথ পেরিয়ে যেতে হল। একটা সময় মনে হয়, ক্যাসল অব্দি সরাসরি রেল যোগাযোগ ছিল। বাইরে থেকে জিনিসপত্র আনার কাজে রেললাইনটা ব্যবহার করা হত। ক্যাসল ঘিরে গভীর পরিখা। পরিখার উপরে ড্র-ব্রিজ আছে, যা দড়ি আর লিভারের সাহায্যে ওঠানো, নামানো যায়। শত্রু সেনা দূর থেকে দেখতে পেলে,

আগে ওই ড্র-ব্রিজ তুলে নেওয়া হত। ড্র-ব্রিজের উপর দিয়ে আমার গাড়ি এগিয়ে চলল। একটা বড়ো গেট হাউসের মধ্যে দিয়ে ক্যাসলে ঢুকে পড়লাম।

ঢোকার পরেই যে কী অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল তা বলে বোঝানো মুশকিল। মনে হল যেন টাইম মেশিনে করে হঠাৎ করে দু-শো বছর পিছনে চলে এসেছি। গেট হাউস পেরোনোর কিছু পরেই ডানদিকে পার্কিং-এর জায়গা পড়ল। সেখানে গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম।

দুর্গের চার ধার দিয়ে উঁচু প্রাচীর। প্রাচীরের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় ফোকর আছে, যা দিয়ে আগে পাথর ছোড়া হত, তির মারা হত।

ক্যাসলের মধ্যে বেশ বড়ো ফুলের বাগান। একটা বড়ো জাপানিজ গার্ডেন আছে। আমি গাড়ি থেকে নেমে এসব দেখছি, এর মধ্যে কিছু দূর থেকে এক সামান্য পৃথুলা মাঝারি হাইটের বছর পঞ্চাশেকের মহিলা এগিয়ে এলেন।

মার্গারেট-এরিকের সেক্রেটারি। আমাকে আমার থাকার জায়গা দেখিয়ে দিয়ে মার্গারেট জানালেন যে এক ঘণ্টা বাদে এরিক আমার সঙ্গে দেখা করবেন। কোনোরকম দরকার হলে যেন মার্গারেটকে জানাই।

সঙ্গের ব্যাগটা ঘরে রেখে মাঝের এই এক ঘণ্টা ক্যাসলের মধ্যে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম।

বহু পুরোনো এই ক্যাসল। তেরোশো সাল নাগাদ তৈরি। পরে অবশ্য বেশ কয়েকবার সংস্কার হয়েছে। ক্যাসল ঘিরে চারটে চারতলা টাওয়ার। টাওয়ারের উপরটা শঙ্কুর মতো। মনে হয়। টুপি পরে কোনো রোগা লোক যেন দাঁড়িয়ে আছে। টাওয়ারের গায়ে অনেক অ্যারোলুপ বা তির ছোড়ার জন্য খুব সরু আয়তাকার ফোকর। টাওয়ারগুলো থেকে ক্যাসলকে সারাক্ষণ পাহারা দেওয়া হত। টাওয়ারের উপর থেকে আইল্যান্ডের প্রায় সব দিকে নজরদারি করা সম্ভব হত। টাওয়ারগুলো একটার সঙ্গে আরেকটা প্রাচীরের উপর দিয়ে একটা প্রায় কুড়ি ফুট চওড়া পথের মাধ্যমে যুক্ত। ক্যাসলের বাইরের দেওয়াল শুনলাম চোদ্দো ফুট চওড়া।

এ ছাড়া ক্যাসলের সব থেকে উঁচু জায়গায় আছে একটা উঁচু টারেট বা চূড়া। টাওয়ার যেখানে নীচের মাটির উপরে খাড়া আছে, টারেট সেখানে তৈরি করা হয়েছে ক্যাসলের দেওয়ালের উপরে। দুটোই অবশ্য শত্রু সেনাকে দূর থেকে লক্ষ্য করার জন্য।

ক্যাসলের ভেতরে বেশ কয়েকটা বাড়ি। তার মধ্যে কিছু বাড়ি এখনও তাদের আগের চেহারায় পড়ে আছে। পাথরের কঙ্কাল নিয়ে। ইতিহাসের অজস্র আক্রমণের সাক্ষ্য রেখে। কিছু বাড়ী ঠিক করে নেওয়া হয়েছে ব্যবহারের জন্য। ক্যাসলের কিছু অংশ ঠিক পাঁচশো বছর আগেও যেরকম ছিল, ঠিক সেরকমই রাখা হয়েছে। তারই মধ্যে একটা বাড়ি এরিকের বিশিষ্ট

অতিথিদের জন্য। তাতেই আমার থাকা ঠিক হয়েছে। এরিক থাকেন আমার বাড়ির ঠিক পাশের বাড়িতে।

ক্যাসলের ভেতরে একটা বড়ো চ্যাপেল আছে। এ ছাড়া আছে কাঠের তৈরি বিশাল ঘোড়ার আস্তাবল। তার একটা অংশ আগের মতো একই রকম রাখা হলেও কিছুটা অংশ জুড়ে এখন বিভিন্ন শৌখিন গাড়ি রাখা আছে। আরেকটা অংশ পরিবর্তন করে টি রুম করা হয়েছে।

পুরো ক্যাসলের মাঝবরাবর আছে বিশাল একটা বাড়ি, যেখানে আগে বিভিন্ন ধরনের উৎসবের আর নৈশভোজের আয়োজন করা হত। তার মধ্যে একটা বিশাল ওক রুম আছে। আমাদের কুড়িটা ড্রয়িং রুম জুড়লে যেরকম জায়গা হবে, সেরকম সাইজ ওক রুমটার। উচ্চতায় ঘরটা প্রায় ছ-তলা বাড়ির সমান।

এসব ক্যাসলের ইতিহাস মানেই যুদ্ধ আর রক্তপাতের ইতিহাস। শুনলাম, আঠেরোবার আক্রমণ করে মোটে একবার এ ক্যাসলের মধ্যে ঢুকতে পেরেছিল শত্রু সেনা।

আমার ঘরটা বিশাল। ঘরের ভেতরের দিকে ভিক্টোরিয়ান স্টাইলের বড়োরকম প্রভাব আছে। ঘরের মধ্যে একটা বাচ্চা মেয়ের পাথরের স্ট্যাচু। ঘরের উপরে কাঠের বিম দিয়ে সাপোর্ট দেওয়া হয়েছে। ঘরের গোল দেওয়ালের মধ্যে বেশ কয়েকটা আর্চ করে জানলা। জানলাগুলো একটু বেরিয়ে আছে। আর সেই জায়গায় বসার ব্যবস্থা আছে। সরু সরু জানলা। এগুলো আগে শত্রুর উপর লক্ষ রাখতে ব্যবহার করা হত। লাল-কালো টালির মেঝে। পুরো ঘরের দেওয়াল জুড়ে টালির উপরে আঁকা ছবি। কিছু ছবিতে যেন গল্প বলা হয়েছে। মেঝে আর দেওয়ালে লাল রং বেশি ব্যবহার করা হয়েছে। বেশ কিছু অয়েল পেন্টিং রাখা আছে। বোঝাই যায় সেসব ছবি বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা।

অন্য কিছু ঘরেও গেলাম। এক-একটা ঘরে এক-এক রং বেশী ব্যবহার করা হয়েছে। একটা ঘরের দেওয়াল জুড়ে পাখি, লতাপাতার ছবি। সে ঘরের মেঝেতে সবুজ টালি ব্যবহার করা হয়েছে।

ঘরগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের কোনো অভাব নেই। তবে তাদের অতীতের চরিত্র ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। ঘরের মধ্যে এখনও একটা বিশাল মার্বেল পাথরের ফায়ারপ্লেস। সেন্ট্রাল হিটিংয়ের সঙ্গে সঙ্গে ফায়ারপ্লেসও চালু রাখা হয়েছে।

শুধু আমার ঘরে নয়, বাড়ির সর্বত্রই এই একই পরিচয়। নতুনের সঙ্গে সঙ্গে অতীতকে খুব সুন্দরভাবে ধরে রাখা হয়েছে। একটা জিনিষস খুব অবাক লাগছিল। পুরো পথে তেমন কোনো লোক দেখিনি। সেটা অবশ্য এজন্য হতে পারে যে এই আইল্যান্ডে এই ক্যাসলের বাইরে

তেমন কিছু নেই। কিন্তু তার বাইরেও এত বড়ো একটা ক্যাসল দেখাশোনার জন্য যত সংখ্যক লোকজনের এখানে থাকার কথা, সেরকম সংখ্যক লোক চোখে পড়ল না। এসব দেশে যদিও ক্যাসলের সিকিউরিটির জন্য আমাদের দেশের মতো অত লোক থাকে না। সিসিটিভি-র মাধ্যমে ও আরও নানান সিকিউরিটি সিস্টেমের মাধ্যমে সুরক্ষা বজায় রাখা হয়।

এক ঘণ্টা বাদে একটা বিশাল ড্রয়িং রুমে এরিকের সঙ্গে দেখা হল। দেখেই মনে হল সেদিনের এরিকের সঙ্গে সামনের এরিকের যেন অনেক তফাত। চোখ বসে গেছে। মুখের মধ্যে যেন কীসের টেনশনের ছাপ। তাহলে কি ওঁর শরীর খারাপ হয়েছে?

উনি আস্তে আস্তে বলে উঠলেন, আমি জানি না তোমাকে এখানে ডাকা উচিত হল কি না। বিশেষ করে কাল রাতের ঘটনার পরে। মনে হচ্ছে, এই ক্যাসলের সেই অতীতের বিভীষিকা আবার ফিরে এসেছে। আমি তোমাকে এখানে থাকতে কোনো জোর করব না। সেদিন তোমার পরিচয় পেয়ে আমার মনে হয়েছিল তুমি হয়তো এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবে। আমি এখানকার পুলিশে এখনই ব্যাপারটা জানাতে চাই না। কারণ এসব পুলিশের কর্ম নয়। একই সঙ্গে এ খবর সাধারণ জনতার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ুক, সেটাও আমি চাই না। অনেকেই এ ক্যাসলের ইতিহাস জানে। সে ঘটনা যদি আবার হয়, তাহলে এখানেও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়বে।

—সেটা কী? খুলে বলতে পারবেন। আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন। আমি কনফিডেনশিয়ালিটি মেন্টেন করব। কেউ জানবে না।

এরিক এবারে উঠে পাশের বুককেসের দিকে এগিয়ে গিয়ে একটা বই বার করে আমার হাতে দিলেন। বইটার নাম 'দ্য গোস্ট অফ বোহাস ক্যাসল'। বলে উঠলেন, লিখিত ইতিহাসে এ ক্যাসলে প্রথম এই প্রেতাত্মার হানার পরিচয় পাওয়া যায় সাড়ে চারশো বছর আগে। তারপর আবার এ ঘটনা ঘটে আজ থেকে প্রায় দু-শো কুড়ি বছর আগে। একই রকম। একই রকমভাবে সেই হানা। বেশ কিছু বই আছে সেই সময়ের ঘটনার উপরে।

সে সময় এখানে প্রায় পাঁচশো লোক ছিল এখানে। রাতারাতি এক প্রেতাত্মার আক্রমণে এক-এক করে এখানকার সব অধিবাসীর মৃত্যু হতে থাকে। বাধ্য হয়ে সে সময়ের রাজা এখান থেকে স্টকহোমে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। তার এক ছেলেও সে সময়ে মারা গিয়েছিল। কোনোমতে একরাতে তখনকার রাজা অস্কার বারোজনকে নিয়ে এখান থেকে পালিয়ে যেতে পারে। বাকি সবাই মারা যায়।

—কী হয়েছিল?

—বইটা পড়লে ডিটেলস পাবে। সংক্ষেপে বলতে গেলে হঠাৎ করে কোন এক প্রেতাত্মার আক্রমণ শুরু হত। তাকে দেখা যেত না। মূলত অন্ধকারেই আক্রমণ করত বা একা পেলে

আক্রমণ করত। মৃতদেহের সারা গায়ে থাকত গভীর আঁচড়ের দাগ। এখানে সে সময়ের এক আর্টিস্টের আঁকা একটা ছবি আছে। ওই যে সে ছবিটা।— বলে দেওয়ালে টাঙানো একটা বিশাল পেন্টিং-এর দিকে নির্দেশ করলেন এরিক।

চওড়ায় পনেরো ফুট, উচ্চতায় প্রায় বারো ফুটের বিশাল এক অয়েল পেন্টিং। সেটা গিয়ে দেখলাম। একটা লোক মাটিতে পড়ে আছে। তার সারা গায়ে কোনো পোশাক নেই। শুধু সারা শরীর জুড়ে গভীর আঁচড়ের দাগ। মাটিতে যেখানে পড়ে আছে, তার চার ধারে ঘর জুড়ে রক্তের দাগ। দূরে এক বিশাল ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। দেখে মনে হয় সে ছায়ামূর্তি কোনো নারীর।

এরকম ভয়ংকর একটা ছবি যে এখানে রাখা আছে, সেটা দেখে আমার একটু অবাক লাগল।

আমার মনের প্রশ্নটা বোধহয় উনি টের পেয়ে গিয়েছিলেন। উত্তর এসে গেল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে।

এরিক বলে উঠলেন, ভাবছ তো যে এরকম একটা ছবি এখানে আছে কেন? আসলে এ ছবির মধ্যে এ ক্যাসলের পরিচয় লুকিয়ে আছে। এত বছর পরেও তাই কেউ এ ঘটনার কথা ভোলেনি। স্মরণকালের ইতিহাসে এটা মোটে দুবার ঘটে থাকলেও, এটা এমনই আতঙ্ক সঞ্চার করেছিল, যে এখনও সবাই এর কথা মনে রেখেছে। আমি অবশ্য চিরকালই এটাকে একটা গাঁজাখুরি গল্প ভেবে এসেছি।

—তা এর আগেও যখন হয়েছিল, মানে ওই সাড়ে চারশো বছর আগে, তখনও কি একই রকম ঘটনা ঘটেছিল?

—একদম একই রকম। শোনা যায়, দশ দিনের মধ্যে এই দ্বীপ পুরো খালি হয়ে যায়। তারপরে প্রায় দশ বছর কেউ এ দ্বীপে কেউ ছিল না। তখন এটা অন্যদিকের ভূখণ্ডের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ছিল। গল্প আছে যে ওই প্রেতাত্মা নাকি মাঝে জল থাকার জন্য অন্যদিকে যেতে পারেনি।

—ঠিক তাই আজও এই দ্বীপ অন্য সব জায়গা থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন আছে। তা-ই তো? মাঝে শুধু একটাই ছোটো ব্রিজ।

—হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। আমি বা আমার পূর্বপুরুষরাও সাধারণের মতের বিরুদ্ধে কোনো আধুনিক বড়ো ব্রিজ তৈরি করিনি। একই সঙ্গে অবশ্য বিচ্ছিন্ন থাকার অনেক সুযোগ-সুবিধে আছে, সেটাও আমরা পেয়েছি। তা না হলে এখানে ট্যুরিস্টের ভিড় থাকত সব সময়। আমাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠত। প্রথমবারের ঘটনার খুব বিশদ বিবরণ অবশ্য পাওয়া যায়

না। সে সময়ের বিখ্যাত ঐতিহাসিক ফ্রিজ মাতসারের লেখা সুইডেনের ইতিহাসে এ ঘটনার উল্লেখ করেছেন।

—তা আমাকে ডেকে আনার কারণের সঙ্গে কি অতীতের ওই দুই ঘটনার কোনো যোগাযোগ আছে? মানে আপনি কী বলতে চান, আবার ওই প্রেতাত্মাকে দেখা গেছে?

এবারে উনি খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। সামনের ওয়াইনের গ্লাস থেকে সামান্য একটু খেলেন। তারপরে বলে উঠলেন, না, এখনও তাকে কেউ দেখেনি। তবে ওই একই রকম ঘটনা শুরু হয়েছে।

—মানে? কেউ মারা গেছে এখানে?

—গত দু-দিনে চারজন।

—সে কী? সেরকম কোনো খবর তো চোখে পড়েনি।

একটু চুপ করে একটু দূরে দাঁড়িয়ে-থাকা কাজের লোকটাকে আঙুলের ইশারায় ডেকে নিল এরিক। তার হাতে ধরা বিভিন্ন পানীয়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে আমি কোনোটা নিতে আগ্রহী কি না জিজ্ঞেস করলেন।

আমি একটা আপেল জুস নেওয়ার পরে লোকটা আবার দূরে সরে গেল। রাজবাড়ির অলিখিত অজস্র নিয়ম আছে, যা না থাকলে বোঝা যায় না। বোঝা যায় না যে প্রায় অদৃশ্য কিছু লোককে নিয়ে কীভাবে নিপুণভাবে কনসার্ট চালানো যায়। আমিও আগে এই লোকটার উপস্থিতি লক্ষ করিনি।

এরিক ফের বলে উঠলেন, আমরাই খবরটাকে মিডিয়ার কাছে রিলিজ হতে দিইনি। এ প্রেতাত্মাকে নিয়ে সাধারণ লোকেদের আগ্রহের অন্ত নেই। সুইডেনের অনেক জায়গায় 'বোহাস ক্যাসলের গোস্ট'-এর' নামে গেম শো পর্যন্ত আছে। লোকে এ খবর পেলে, মিডিয়া সামান্যতমভাবে আন্দাজ করতে পারলে আমাকে— শুধু আমি কেন, আমাদের সবাইকে, ইমিডিয়েটলি এখান থেকে চলে যেতে হবে। শুধু চারজন যে মারাই যে গেছে তা-ই নয়, তাদের আঘাতের চিহ্নও একই রকম। সারা গায়ে একই রকম গভীর আঁচড়ের দাগ।

—মৃত্যু কীসে বোঝা গেছে?

—রক্তক্ষরণ। এমনভাবে আঘাত যে কেউ মনে হয় না আক্রমণের পরে মিনিট দুয়েকের বেশি বেঁচেছে।

—তা তদন্ত করছে কে?

—এখানকার সুইডিশ মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সে কাজ করেছিলেন এরকম আমার চেনা দুজন আছেন। তাঁরা তদন্ত করছেন। আমি ইচ্ছে করে চাইনি যে এ বিষয়ে সাধারণ পুলিশ তদন্তে

নামুক।—একটু থেমে ফের বলে উঠলেন,বুঝতেই পারছ, ওরা বড়ো হয়েছে এই প্রেতাত্মার কথা শুনে। ওরা এখনও তেমন কিছু বুঝে উঠতে পারেনি। কাল রাতে কথা বলে আমার তো মনে হয়েছে যে ওরা যথেষ্ট বিভ্রান্ত। তোমাকে অবশ্য আমি এ তদন্তের বিষয়ে জোর করব না। কিন্তু তোমার সম্বন্ধে সব কথা শোনার পরে আমার মনে হয়েছে, তুমি হয়তো এ বিষয়ে আমাকে সাহায্য করতে পারবে। সত্যি কথা বলতে কী আমরা কেউই নিরাপদ নই। যেখানে আততায়ীকে চোখে দেখা যায় না, সেখানে তাকে ধরা কোনো সাধারণ গোয়েন্দার কাজ নয়। তুমি যদি এখানে থাকতে না চাও, বা এ রহস্যের তদন্তের সঙ্গে যুক্ত না হতে চাও, তোমাকে আমার কর্মচারীরা সময়মতো স্টকহোম পৌঁছে দিয়ে আসবে। তবে তার আগে অবশ্যই তোমাকে হলফনামা দিতে হবে যে তুমি এ খবর কাকপক্ষীকেও দিতে পারবে না।

—কী করলে অনিলিখাদি?— প্রতীক নীরবতা ভঙ্গ করে প্রশ্ন করে উঠল।

—বুঝতেই পারছিস, এরকম একটা রহস্যের গন্ধ পাব, অথচ পালিয়ে চলে আসব, এটা তো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই দু-দিনের জন্য ক্যাসলে থেকে তদন্তে সাহায্য করব বলে কথা দিলাম।

—তো তারপর?

অনিলিখাদি ফের বলতে শুরু করল, উনি আমাকে আরও দুটো বই দিলেন। একটা ফ্রাঙ্ক বার্নাডের লেখা ভ্রমণকাহিনি। যেটা লেখা হয়েছিল প্রায় চারশো বছর আগে, প্রথমবারের ঘটনার কিছু পরে। অন্যটা দুশো কুড়ি বছর আগে লেখা ঐতিহাসিক ফ্রিৎজ মাতসারের। উনি সে সময় এখানে ছিলেন। যে বারোজন বেঁচে পালিয়ে যেতে পারেন, তাদের মধ্যে উনিও ছিলেন।

—তা এবারে কারা মারা গেছেন?— এরিককে প্রশ্ন করে উঠলাম।

—ওহো, যা ভুলো মন, তা-ই তো বলা হয়নি। আমার এখানে বেশ কিছু ঘোড়া আছে। সে ঘোড়ার দেখভাল করত ডেভিড। বছর চল্লিশেক বয়স। এখানে গত দশ বছর কাজ করত। তার মৃতদেহ পাওয়া যায় প্রথম গত পরশু। ক্যাসলের বাইরে এই আইল্যান্ডে ওর বাড়ি। একা থাকত। পরশু দিন দুপুরে ওর কোনো খবর না পেয়ে বাড়িতে লোক পাঠাই। ওরা গিয়ে কোনো সাড়া পায়নি। দরজা ভেজানো ছিল। তারপর দরজা খুলে ঢুকে দেখা যায় এই কাণ্ড। খাটের উপরে শুয়ে আছে। বোঝা যায়, ও কারোর উপস্থিতি টের পেয়েছিল। বাধা দেওয়ার চেষ্টাও করেছিল। ওর রক্তাক্ত দেহ খাট থেকে আধশোয়া অবস্থায় ঝুলছিল।

—দ্বিতীয়জন?

—আমাদের বাড়ির দীর্ঘদিনের অস্ট্রেলিয়ান শেফ— রজার ফ্ল্যানাগান। সেটা এই ক্যাসলের এলাকার মধ্যে। বুঝতেই পারছ যে ক্যাসলের মধ্যে চট করে বাইরের কারোর পক্ষে আসা প্রায় অসম্ভব। ওর মৃত্যুতে স্বাভাবিকভাবেই আমি বিচলিত হয়ে উঠি। হয়েছে খুব সম্ভবত গত পরশু রাতে। রাত আটটার সময় ওকে শেষ দেখা যায়। কাল সকালে সাতটা নাগাদ ওর মৃতদেহ ও ক্যাসলের মধ্যে যে বাড়িতে থাকত, সে বাড়ির ছাদে ওঠার সিঁড়িতে পড়ে থাকতে পাওয়া যায়। একই রকম অবস্থায়। মনে হয়, সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় কেউ যেন পিছন থেকে আক্রমণ করেছে।

—তা সিসিটিভি-তে কেউ ধরা পড়েনি?

—না, অনেক জায়গায় সিসিটিভি থাকলেও পুরো ক্যাসেল তো সিসি টিভিতে কভার করা নেই। কিছু জায়গায় প্রাইভেসির জন্যও বসানো হয়নি। ওখানে কোনো ক্যামেরা ছিল না। তবে ওই সময়ে বাইরে থেকে কেউ এসেছিল কি না তা চেক করতে বিভিন্ন সিসিটিভি ক্যামেরা দেখা হয়েছে। কিন্তু কিছু পাওয়া যায়নি।

—তা বাকি দুজন?

—বাকি দুজনের মৃত্যুই কাল রাতে। তোমার সঙ্গে ফোনে কথা বলার পরে। সকালে বডি পাওয়া গেছে। দুজনের মৃতদেহই ক্যাসলের মধ্যে পাওয়া গেছে। একজন টেকনিশিয়ান— এখানকার পাম্প, বয়লার, ড্র-ব্রিজের মোটর— এসবের দেখাশোনা করত। অন্যজন এক মহিলা নার্স— এ ক্যাসলের মধ্যে একটা সার্জারি আছে। সেখানে কাজ করত।

—আচ্ছা, ডেডবডি দেখা যেতে পারে?

—হ্যা, অবশ্যই। সব ক-টা ডেডবডি এখনও এখানে আছে। মৃতদেহে ক্ষতচিহ্ন একই রকম। তোমাকে সার্জন হিউগো দেখাবেন। আমি ফোনে বলে দিচ্ছি।

কিছুক্ষণের মধ্যে সার্জন হিউগোর সঙ্গে এই আইল্যান্ডের একমাত্র প্রাইভেট হাসপাতালে গেলাম। সেটা অবশ্য ক্যাসলের বাইরে। ওখানেই মৃতদেহগুলো দেখলাম। ফরেনসিকসের জন্য ক্রিমেশন হয়নি। এত হিংস্রভাবে হত্যা করা হয়েছে যে এককথায় চোখে দেখা যায় না। খুব ধারালো ছুরিতে কেউ যেন দেহটাকে ফালা ফালা করে দিয়েছে। একটু খেয়াল করে দেখলেই অবশ্য বোঝা যায় যে এ আঘাত ছুরি দিয়ে নয়। তাতে আঘাতের যে ধরনের গভীরতা হত, বা যেভাবে আঘাত হত, এক্ষেত্রে সেরকম নয়। এটা খুব ধারালো নখের আঁচড়ে শুধু সম্ভব। এরকম আঘাতের পরে কেউ কয়েক মিনিটের বেশি বাঁচে না।

সব ক-টা হত্যাই সন্ধেবেলা হয়েছে।

এরপরে সার্জনকে নিয়ে হত্যাগুলো যেখানে যেখানে হয়েছে, সে জায়গাগুলো দেখে এলাম। ক্রাইম সিন আলাদা করা আছে। বুঝলাম, খুব যত্নের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে। আপাতত সন্দেহজনক কিছু খুঁজে পাওয়া যায়নি। হিউগোর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। তাঁরও মুখে-চোখে ভয়ের ছায়া। কিছুই বুঝে উঠতে পারছেন না।

৩

সেদিন সন্ধেবেলাতে সাতটা নাগাদ আমার ঘরের ফোন বেজে উঠল।

এরিকের ফোন। —অনিলিখা আমার লাইব্রেরিতে আসবে? কয়েকটা বই দেখাতাম। তোমার কাজে লাগবে। একটু সাবধানে এসো। কাউকে পাঠাব কি?

এরিককে জোর দিয়ে কোনো দরকার নেই বলার পরেও মনের মধ্যে যে একটুও ভয় হচ্ছিল না, তা বলব না।

পাশের বিল্ডিং-এ এরিক থাকেন। মাঝের সামান্য পথ পাথরের রাস্তা দিয়ে যেতে হয়। সূর্যাস্ত সবে হয়েছে। বাগানের আলোগুলো স্তিমিতভাবে জ্বলে উঠেছে। কেন জানি না মনে হচ্ছিল, এটুকু পথেও হঠাৎ করে কিছু হতে পারে। কেউ যেন আমার পিছু নিয়েছে। সেই ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। জোর পায়ে হেঁটে পাশের বিল্ডিং-এ ঢুকলাম। সেখানে একজন সিকিউরিটি আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। আমাকে এরিকের লাইব্রেরি অব্দি এগিয়ে দিল।

এরিকের লাইব্রেরিতে ঢুকে সত্যি হকচকিয়ে গেলাম। এত বড়ো ব্যক্তিগত লাইব্রেরি আমি আগে দেখিনি। মনে হচ্ছে যেন ইতিহাসের পাতা থেকে কোনো ঘর বেরিয়ে এসেছে। বিশাল ঘরের উঁচু শিলিং অব্দি বই। বিশাল দেয়ালজোড়া আলমারি। ১৮৫০ সাল থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্রপত্রিকার কালেকশন। অজস্র দুষ্প্রাপ্য বই।

এরিক ঘরের মধ্যে একটা লেদার সোফায় বসে বই পড়ছে।

আমার জন্য উনি একটা বড়ো চামড়ায় বাঁধানো ডায়েরি আলাদা করে রেখেছিলেন। আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন আমার পূর্বপুরুষ দ্বিতীয় অস্কারের ডায়েরি। ওর সময়ে এই ঘটনা ঘটেছিল আজ থেকে ২২০ বছর আগে। ওঁর কিছু অভিজ্ঞতার কথা লেখা আছে এখানে। আমি আগে পড়িনি। আজ খেয়াল হতে পড়ছিলাম। ওঁর ছেলে এলার্ড তো ওই প্রেতাত্মার হাতেই মারা যায়। পড়তে গিয়ে মনে হল তোমারও পড়ে দেখা দরকার। বিশেষ করে এই জায়গাটা। —বলে আমার হাতে ডায়েরিটা এগিয়ে দিলেন একটা বিশেষ অংশ চিহ্নিত করে।

—তা উনি তো এ ঘটনার সময়ে অন্য জায়গায় চলে যান। তা-ই তো?

—হ্যাঁ, উনি ওঁর স্ত্রী, মেয়ে ও শেষ কয়েকজনকে নিয়ে এখান থেকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচান। ছেলে ওই প্রেতাত্মার শিকার হওয়ার পর পরই। এটা প্রমাণ করে, আমরা যতই নিরাপত্তার কথা ভাবিনা কেন, আমরা কেউ নিরাপদ নই।

খেয়াল করলাম, ঘরের ভেতরে এককোণে একজন গার্ড মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে।

ডায়েরিটা হাতে নিলাম। চামড়ার কভার। আগেকার দিনের হাতে বানানো মোটা পাতার উপরে লেখা। হাতে নিলেই কীরকম শিহরন হয়।

ফের এরিক বলে উঠলেন,—ওহো! এটা তো ফ্রেঞ্চে লেখা। ওই সময়ে এখানে ফ্রেঞ্চ ভাষার ভালো চল ছিল। তুমি তো পড়তে পারবে না। তোমাকে আমি সংক্ষেপে পড়ে শোনাই।

—না না, আমি ফ্রেঞ্চ ভালোই জানি। আমার পড়তে কোনো অসুবিধে হবে না।

—বলে পড়তে শুরু করলাম। ভারী সুন্দর হাতের লেখা অস্কারের। পড়তে কোনো অসুবিধে হয় না। তবে প্রতিদিনের ডায়েরি উনি লেখেননি। বিশেষ কিছু দিনের কথা লিখেছেন। সেই বিশেষ দিনের লেখাটা আগে থেকেই এরিক আমার জন্য চিহ্নিত করে রেখেছিলেন। ওঁর এখান থেকে চলে যাওয়ার দু-দিন বাদে লেখা। ওই একটা দিনেই এখানকার ওই ঘটনা ধরা পড়েছে। তাতে লেখা—

"আমি কোনোদিনই বিশ্বাস করিনি যে এ ক্যাসলে কোনো প্রেতাত্মা আছে। বিজ্ঞানে বিশ্বাস করেছি। বন্ধু বিজ্ঞানী লিয়ামও বোধহয় আমার থেকে বেশি ভূতে বিশ্বাস করত। কিন্তু গত কয়েকদিনের ঘটনা যেন সব ওলট-পালট করে দিয়ে গেল। এখনও চোখের সামনে সে দৃশ্য ভাসছে। সেই অশরীরীর ছায়া। সেই একের পর এক মৃত্যু। নখের আঁচড়ে ফালা ফালা করে কাঁটা রক্তাক্ত দেহগুলো। বিশেষ করে এলার্ডের কথা। আমার প্রিয় ছোটোছেলে এলার্ডের কথা।

আমার মা আমার খুব কম বয়সে মারা যান। তাঁর কথা আমার বিশেষ মনে নেই। যার কাছে মূলত মানুষ হয়েছি, সেই গভর্নেস ফ্রেজার মুখে ছোটোবেলা থেকে প্রেতাত্মার গল্প শুনতাম। শুনেছি, বেশ কয়েকশো বছর আগে যখন এ ক্যাসল স্থাপিত হয়, সে সময়ে এ ঘটনা ঘটেছিল। ক্যাসলের কাজের জন্য অনেক দাস-দাসী এসেছিল এখানে। তাদের মধ্যে একজন ছিল এমিলি। তাকে নাকি দেখতে এত খারাপ ছিল যে দিনের বেলাতেও লোকে তাকে দেখে ভয় পেত।

সে প্রায় কারোর সঙ্গেই মিশত না। একা একা থাকত। নানান ধরনের কাঠের পুতুল বানাত। পরে আস্তে আস্তে অনেকের ধারণা হয় যে ও আসলে এক ডাইনি। সে সময় অনেক বাচ্চা এই আইল্যান্ড থেকে নিয়মিত হারিয়ে যেত। এরপর একদিন ওর বাড়ি থেকে অনেক ছোটো

ছোটো হাড়-গোড় নাকি পাওয়া যায়। সন্দেহ করা হয় যে এগুলো সব সেই হারিয়ে-যাওয়া বাচ্চাগুলোর। ও নাকি তাদের মেরে খেয়ে নিত।

ওকে তখন এখানকার রাজা পুড়িয়ে মেরে ফেলার আদেশ দেন। আদেশমতো এ ক্যাসলের মধ্যেই সবার সামনে ওকে পোস্টের সঙ্গে বেঁধে গায়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। এমিলি আগুনে পোড়ার অসহ্য যন্ত্রণার সময় নাকি প্রতিশোধ নেওয়ার কথা বলে।

সেই থেকেই নাকি ওই প্রেতাত্মার আবির্ভাব, যাকে মাঝেমধ্যে দেখা যায়। এ আসলে আর কেউ নয়, এমিলি। যে এখনও মাঝেমধ্যে বেরিয়ে এসে ক্যাসলের সবার উপরে প্রতিশোধ নেয়। অনেক কিছু করেও ওই প্রেতাত্মার উপদ্রব থেকে রক্ষা পাওয়া যায়নি।

ছোটোবেলায় সেসব গল্প শুনে ভয় পেতাম। একটু বড়ো হতে মনে হয়েছিল যে এটা একটা সাধারণ গল্পের বেশি কিছু নয়। কিন্তু গত ক' দিনের ঘটনা আমার সব ধারণা ভুল প্রমাণ করে দিয়ে গেল।

ঘটনার প্রথম শুরু আমাদের আস্তাবলে। চার দিন আগের ঘটনা। আমার ঘোড়ার দেখাশোনা করত আরশাদ। বেশির ভাগই ছিল হাঙ্গেরি থেকে আনা প্যালফ্রে ঘোড়া। সকালে ঘোড়া করে বেরোনো আমার নিয়মিত অভ্যেস। আরশাদ ঘোড়া রেডি করে ভোর ছ-টায় ক্যাসলের সামনে নিয়ে আসত। সেদিন দেরি দেখে লোক পাঠালাম। তখনই খুব খারাপ খবরটা পেলাম। আরশাদকে কে যেন হত্যা করেছে। রাতের দিকেই হয়েছে খুন। কী ব্যাপার দেখতে আমি নিজেই গেলাম ওর বাড়ি। কিন্তু বডি দেখেই শিউরে উঠলাম। এরকম নৃশংসভাবে কী খুন করবে? মনে হল যেন ছুরি দিয়ে কেউ শরীর ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছে। আমার সঙ্গে চার্চের পাদরি বেকেট ছিলেন। ওঁকে দেখে মনে হল যেন উনি খুব উদবিগ্ন হয়ে পড়েছেন।

উনিই আমাকে প্রথম আলাদা করে বললেন, মনে হচ্ছে এ কোনো মানুষের করা খুন নয়। এ সেই প্রেতাত্মার কীর্তি। মনে হয়, সে আবার জেগে উঠেছে। সে এভাবেই খুন করে বলে শুনেছি।

আমি শুনে হেসে উড়িয়ে দিলাম। তখনও বুঝতে পারিনি যে কী হতে চলেছে। যাতে কোনোভাবে এ ধরনের গুজব না রটান, তাই পাদরি সাহেবকে বারণ করে দিলাম।

আমাদের ক্যাসলে প্রায় দু-শো লোক থাকে। তাদের সবাইকে সতর্ক করে দেওয়া হল যাতে কোনো অচেনা লোক দেখলেই খেয়াল করে। এ নিশ্চয়ই বাইরের কারোর কাজ।

এসব বাড়তি সতর্কতার পরেও পরের দিন পর পর দুটো একই রকম ঘটনা ঘটল। আমাদের ক্যাসলে মজা দেখানোর জন্য, গল্প শোনানোর জন্য এক জেস্টার থাকত, নাম ইয়ানে। ইয়ানে থাকত ক্যাসলের বাইরে একটা আলাদা বাড়িতে। খবর এল যে ওর রক্তাক্ত

মৃতদেহ বাড়িতে পাওয়া গেছে। রাতে এখানে একটা ম্যাজিকের প্রোগ্রাম করেছিল। অনেক রাতে বাড়ি যায়। শরীর খুব ধারালো কোনো অস্ত্র দিয়ে ফালা ফালা করে দেওয়া হয়েছে। এ যে সেই একই হত্যাকারীর চিহ্ন তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আমার সঙ্গে এ ক্যাসলে এক গুপ্ত বাহিনী থাকে। তাদের সঙ্গে সঙ্গে এ ঘটনার অনুসন্ধানের দায়িত্ব দিলাম।

এর কয়েক ঘণ্টার পরে পরের হত্যার খবর পেলাম। এবারে রাতে নয়। ভরদুপুরে। এবারে আমাদের বাড়িতে। হত্যা হয়েছে লর্ড ব্যারনের মেয়ে মেরি। গত ছয় মাস ও এখানে থাকত। রাজপরিবারের রীতিনীতি জানতে, মার্জিত ব্যবহার ও আদবকায়দা শেখাতে এখানে অনেক বনেদি পরিবার তাদের সন্তানদের পাঠায়। আমাদের অনুমতি পাওয়ার অপেক্ষায় থাকে। মেরি এখানে সেভাবেই এসেছিল। ভারী ভালো মেয়ে। আমাদের দিক থেকেও একটা বড়ো দায়িত্ব থাকে। খবরটা পেয়ে ছুটে গেলাম।

কাছে গিয়ে সে দৃশ্য সহ্য করতে পারলাম না। কে বা কারা যেন ওর উপরে আক্রমণ করেছে। সাদা পোশাক রক্তে এমনভাবে লাল হয়ে গিয়েছে যে একটা জায়গাও খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে পোশাকের সাদা রং দেখা যাচ্ছে। ওই ঘরে এমন পাহারা ছিল যে বাইরের কারোর পক্ষে আসা অসম্ভব ছিল। বড়ো কাঠের দরজার সামনে সব সময় প্রহরী ছিল। বাইরে থেকে কারোর পক্ষে ঢোকা অসম্ভব।

সেই প্রহরী নাকি হঠাৎ ঘরের মধ্যে থেকে মেরির আর্তনাদ শুনতে পায়। কিন্তু ঢোকার পরেই দেখে এ দৃশ্য। তার চোখের সামনেই ছটফট করতে করতে মেরি মারা যায়। কিন্তু তখন ঘরে কেউ কোথাও নেই। ম্যাজিকের মতো আততায়ী চোখের সামনেই যেন উধাও হয়ে গিয়েছে। এখানে আততায়ী কে তা নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকতে পারে না।

এরপর আর গুজব আটকানো যায়নি। কথাটা আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ল যে আবার ক্যাসলে সেই প্রেতাত্মার আক্রমণ শুরু হয়ে গিয়েছে। আমার সবরকম আশ্বাস সত্ত্বেও সেরাতেই একটা বড়ো অংশ দ্বীপ ছেড়ে চলে গিয়েছিল। আমি বাধা দিইনি। যেখানে আমি আমার ক্যাসলের মধ্যেই কাউকে রক্ষা করতে পারছি না, সেখানে কীভাবে কাউকে থাকতে বাধ্য করব।

আশ্চর্যভাবে সে রাতটা নির্বিঘ্নে কাটল। প্রায় সারারাত জেগে কাটানোর পরে ভোরে উঠে খবর পেলাম যে আর নতুন কোনো হত্যা হয়নি।

সেদিন অর্থাৎ গত পরশুর সন্ধে থেকে আবার তার তাণ্ডব শুরু হল। প্রথম শুরু হল একজন পাহারাদারের মৃত্যু দিয়ে। সে ক্যালের দেওয়ালের প্যারাপেটে পাহারা দিচ্ছিল। তার মৃতদেহ পাওয়া যায় সন্ধে সাতটা নাগাদ। একই রকম অবস্থায়। সে দৃশ্য দেখে অন্য এক

সৈনিক কোনোরকমে পালিয়ে এসেছিল। এরপর প্রায় প্রতি পাঁচ-দশ মিনিট বাদে বাদে মৃত্যুর খবর আসতে থাকে। ঠিক মহামারির মতো।

পরিস্থিতি এরকম দেখে আমি সিদ্ধান্ত নিই যে কয়েক ঘণ্টার জন্য ড্র-ব্রিজ খুলে নেওয়া হবে যাতে ক্যাসলের মধ্যে সবার খোঁজ করা যেতে পারে। যাতে কতজন মারা গেছে, কতজন আছে, তার একটা পরিষ্কার পরিসংখ্যান পাওয়া যায়। বাইরের কেউ এসে থাকলে সে যাতে চট করে পালিয়ে যেতে না পারে। কিন্তু তিন ঘণ্টাব্যাপী চিরুনি তল্লাশিতে অচেনা কাউকে খুঁজে তো পাওয়া গেলই না, উলটে চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে-থাকা আরও আটটা মৃতদেহ পাওয়া গেল। কেউ টারেটে, কেউ টাওয়ারে, কেউ বা চ্যাপেলে। আবার ড্র-বিজ নামিয়ে দিলাম। যে শত্রুকে দেখা যায় না, তাকে সবাই ভয় পায়। বুঝলাম আমার কিছুই করার নেই। এক শুধু ভয় পাওয়া ছাড়া।

সবার মতো আমি আমার বাড়িতে ফিরে এলাম। চারদিকে কড়া প্রহরা। ঘন নিরাপত্তার বেষ্টনী। ফায়ারপ্লেস জ্বালিয়ে রাত ন-টা নাগাদ ড্রয়িং রুমে বসেছি, হঠাৎ মনে হল, সামনের দেওয়ালের উপর দিয়ে যেন একটা কালো ছায়া সরে গেল। সে ছায়া যে ওই প্রেতাত্মার ছিল, এখন আর তা নিয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। ঘরে আমার নিরাপত্তার দায়িত্বে আমার ব্যক্তিগত দেহরক্ষীজন ছিল, কিন্তু সে কিছু দেখতে পায়নি। তাকে সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক করলাম।

জনও আমি ঘরের মধ্যে সবকিছু তন্ন তন্ন করে দেখছি, ঠিক এর মধ্যে হঠাৎ উপর থেকে চিৎকার শুনতে পেলাম। আমার ছেলে এলার্ডের ঘর থেকে। উন্মাদের মতো ছুটে গেলাম উপরে। গিয়ে দেখি, এলার্ডের ছিন্নভিন্ন রক্তাক্ত দেহ খাটের উপরে পড়ে আছে। সব শেষ। প্রাণ নেই।

আর থাকিনি ওই আইল্যান্ডে। ভোররাতেই বেরিয়ে পড়েছিলাম বাকি সবাইকে নিয়ে। আমার সঙ্গে মোটে এগারোজন ছিল যারা ওই প্রেতাত্মার তাণ্ডব থেকে রক্ষা পেয়েছে। উফ কী বিভীষিকা। এখনও মনে হয় যেন হঠাৎ করে সে ছায়াকে দেখতে পাচ্ছি।

বেশ বিভোর হয়ে ডায়েরিটা পড়ছিলাম। হঠাৎ মনে হল, দেওয়ালে যেন একটা কালো ছায়া দ্রুত একদিক থেকে আরেক দিকে সরে গেল। চমকে দাঁড়িয়ে উঠলাম।

এরিক বলে উঠলেন, কী ব্যাপার অনিলিখা? কিছু হয়েছে?

—না না। আচ্ছা, আপনি কি কিছু দেখতে পেলেন? আমার মনে হল, একটা ছায়া যেন দেওয়ালের উপর দিয়ে সরে গেল।

—না। আমি তো কিছু দেখতে পেলাম না।

আমি কোনো কথা না বলে দেওয়ালের ওইদিকে উঠে এগিয়ে গেলাম। যদি কিছু দেখা যায়। কিন্তু কিছুই নেই। আমি কি ভুল দেখলাম? এটা কি অস্কারের ডায়েরি পড়ার প্রভাব?

দেওয়াল আলমারিতে অজস্র বই। তার মধ্যে বেশ কিছু বই পোকামাকড়ের উপরে। অবাক হয়ে বইগুলো নেড়েচেড়ে এরিককে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, আপনার কোনো পূর্বপুরুষের কি এসব বিষয়ে আগ্রহ ছিল?

—হ্যাঁ, ওই অস্কারের এক মেয়ে ছিল। উইলমা। তার এ বিষয়ে ও বিজ্ঞানে খুব আগ্রহ ছিল। একটা বড়ো ল্যাব ছিল তখনকার দিনে। তাতে এসব পোকামাকড় নিয়ে পরীক্ষা করতেন। চিরকাল অবিবাহিত ছিলেন।

—তা উনি কি ক্যাসলে ছিলেন ওই ঘটনার সময়ে?

—হ্যাঁ, ওঁর বয়স ছিল তখন দশ বছর। বাবার সঙ্গে সেরাতে পালিয়ে বাঁচেন। কিন্তু সেজন্যই নাকি উনি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিলেন না। ওরকম একটা ট্রমা দেখেছেন। এক বছরের ছোটো নিজের ভাইয়ের মৃতদেহ দেখেছেন। উনি ওঁর সম্পত্তির একটা বড়ো অংশ এন্টোমোলজির অর্থাৎ ওই পোকামাকড়ের রিসার্চের জন্য দান করে যান।

কথা বলতে বলতে জানলার দিকে এগিয়ে গিয়েছিলাম। এবার যেন আরও স্পষ্ট দেখলাম। একটা ছায়াশরীর বাইরের স্বল্পালোকিত ঘাসের উপর দিয়ে দ্রুত চলে গেল।

কিন্তু যা দেখলাম তা কি সত্যি? সত্যিই কি তাহলে কোনো প্রেতাত্মা আছে বোহাস ক্যাসলে?

৪

সে রাতে কিছু হল না। পরের দিন বেলা এগারোটার সময় এরিকের সঙ্গে প্রথম দেখা হল। উনি এ বয়সেও প্রায় এক ঘণ্টা ধরে ছোটেন। এরিকই জিজ্ঞেস করলেন আমি ওঁর সঙ্গে ক্যাসল দেখতে আগ্রহী কি না।

এ সুযোগ কে ছাড়ে! এরিকের সঙ্গে ক্যাসলের নানান অংশ ঘুরে ঘুরে দেখলাম। উনি একই সঙ্গে আমাকে ক্যাসলের বিভিন্ন সময়ের ইতিহাস বলতে থাকলেন, যার প্রমাণ এখনও ক্যাসলের ভাঙা পাথরে রয়ে গেছে। বুঝতে পারছিলাম, পায়ের নীচের এই মাটি কত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের আর ষড়যন্ত্রের সাক্ষ্য থেকেছে। এরিক একটা রাত নিশ্চিন্তে কাটাতে পেরে যেন একটু এনার্জি পেয়েছেন। একজনকে দিয়ে একটা মধ্যযুগীয় তির ধনুক নিয়ে এনে টাওয়ারের অ্যারোলুপগুলো কীভাবে ব্যবহার করা হত, কীভাবে তির ছোঁড়া হত, কতদূর যেত, তাও দেখালেন।

প্যারাপেটের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি, হঠাৎ প্রায় পায়ের উপর দিয়ে একটা বিকটদর্শন বড়ো কালো মাকড়সা চলে গেল। আমি চমকে উঠেছিলাম। কীরকম যেন লোমশ চেহারা। বড়ো বড়ো পা ফেলে দ্রুত হারিয়ে গেল।

এরকম মাকড়সা তো আগে কখনো দেখিনি।

—হ্যাঁ, এটা এই আইল্যান্ডের স্পেশালিটি। এদের আরেক প্রজাতিও এখানে দেখা যায়। যদিও একসঙ্গে দেখা যায় না। এদের থেকে খানিকটা ছোটো। লালচে রঙের। কিন্তু ওরা অন্য সময়ে হয়। একই রকম লোমশ চেহারা। —বলতে বলতে থেমে গেলেন। কারণ উনি যেটা দেখছিলেন, আমিও তা-ই দেখছিলাম। আর কিছু বলার দরকার ছিল না।

কিছু দূরে ক্যাসলের পাথরের দেওয়ালের উপরে ঠিক একই রকম একটা লাল মাকড়সা। খুব আস্তে আস্তে হেঁটে দেওয়ালের একটা অ্যারোলুপের মধ্যে ঢুকে গেল। উনি ফের বলে উঠলেন,— এদের ভেনোম কিন্তু বেশ বিষাক্ত। অনেক বছর বাদে বাদে এদের দেখা যায় এই আইল্যান্ডে।

বলে উঠলাম,— এরকম মাকড়সা অন্য কোথাও দেখা যায়?

—নিশ্চিত নই। তবে আমার পড়াশোনামতো এরকম মাকড়সা খুব কমই দেখা যায়। তোমাকে উইলমার কথা বলছিলাম না! উইলমার অন্য পোকামাকড়ের সঙ্গে মাকড়সাতেও খুব আগ্রহ ছিল। এখানে একটা বড়ো ল্যাব আছে, সেখানে গেলে এরকম অনেক মাকড়সার প্রজাতির কথা জানতে পারবে।

—সেটা দেখা যেতে পারে?

—এসবের মধ্যে ওই ঘরটা দেখানো— একটু দ্বিধা করে উনি ফের বলে উঠলেন,— ঠিক আছে, আমি বলে দেব কাউকে তোমাকে ওই ল্যাবটা দেখাতে। চলো, তার আগে একটা ফিকা হোক।

ফিকা বলতে এখানে কফি ব্রেক বোঝানো হয়। এরিক টিপিক্যাল সুইডিশ লোকেদের মতো। প্রথমদিকে একটা বাড়তি কথা বলতেন না। যতক্ষণ না ভালো করে পরিচয় হয়, এঁরা আলাপে একটা বাড়তি শব্দও ব্যবহার করেন না। কিন্তু ভালো পরিচয় হয়ে গেলে, তখন আবার কোনো কথা বলতেই দ্বিধা করেন না। এখন যেমন এরিক কোনো কথা বলতেই দ্বিধা করছিলেন না।

বিকেল পাঁচটা নাগাদ সেই ল্যাবটা দেখার সুযোগ হল। অদ্ভুত সে ঘর। নানান ধরনের পোকামাকড়, মাকড়সা, মৌমাছি, আরশোলা, ফড়িং—আরও কত কী সংরক্ষণ করে রাখা আছে। লেখা আছে, প্রায় পঞ্চাশ হাজার বিভিন্ন ধরনের পোকামাকড় এখানে সংরক্ষিত আছে।

লেবেলের মাধ্যমে তাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে বিভিন্ন ধরনের তথ্য লেখা আছে। তার মধ্যে হাজারখানেক বিভিন্ন ধরনের প্রজাপতি, প্রায় পাঁচশোভিন্ন ধরনের গুবরেপোকা, বিভিন্ন ধরনের মৌমাছি, ঝিঁঝিপোকা, ফড়িং। খুঁজতে খুঁজতে দেখা পেয়ে গেলাম আমার সকালে দেখা দুটো মাকড়সারও।

উপরে লেখা লেবেলে দেখলাম, প্রথম মাকড়সা প্রজাতি নাকি প্রতি ১৩ বছর অন্তর অন্তর এ দ্বীপে দেখা যায়। অন্য প্রজাতির মাকড়সা দেখা যায় এ দ্বীপে প্রতি ১৭ বছর বাদে বাদে। অর্থাৎ দুটো মাকড়সাকে যে একই সঙ্গে দেখলাম, সেটা সত্যি ভাগ্যের ব্যাপার।

ইতিমধ্যে আমার সেল ফোনটা বেজে উঠল। এরিকের ফোন। উলটোদিকে এরিকের উত্তেজিত গলা। কাঁপা গলায় বলে উঠলেন, তুমি কোথায়?

—আমি ল্যাবে একটু এসেছিলাম। খুব ভালো লাগল।

—এক্ষুনি ফিরে এসো। কোনো খোলা জায়গায় থেকো না। এখনই নিজের ঘরে ফিরে যাও। আবার ওর আক্রমণ শুরু হয়ে গিয়েছে। ক্যাসলে তিনজনের মৃতদেহ পাওয়া গেছে। তার মধ্যে এখানকার আবাসিক একজন অ্যাকাউন্ট্যান্টের বারো বছরের মেয়েও আছে। ও, তোমার সঙ্গে তো তার আলাপও হয়েছে। আয়ানের মেয়ে। তার মৃতদেহ পাওয়া গেছে ক্যাসলের চার নাম্বার বাড়িতে।

আমি সঙ্গে সঙ্গে ল্যাব থেকে বেরিয়ে এলাম। তবে ঘরে না গিয়ে আগে চললাম ক্যাসলের সেই চার নাম্বার বাড়ির দিকে। আয়ানের সঙ্গে আমার গতকাল মিনিট পাঁচেক আলাপ হয়েছে। আমি যখন গতকাল এরিকের লাইব্রেরিতে ছিলাম, খানিকক্ষণের জন্য আয়ান এসেছিল। খুব খারাপ লাগল খবরটা পেয়ে।

এখানে এরকম পাঁচটা বাড়ি আছে, যেখানে ক্যাসলে কর্মরত সিনিয়র অফিসাররা থাকে। অবশ্য তাদের ঠিক কর্মচারী বলা যায় না, একসঙ্গে থাকতে থাকতে সবাই একটা বড়ো পরিবারের অংশ হয়ে গেছে। কিছু দূর যেতেই চার নাম্বার বাড়ির সামনে কয়েকজন লোকের ভিড় চোখে পড়ল। আয়ান এখানে তিরিশ বছর কাজ করেছে। স্ত্রী ও মেয়ে নিয়ে থাকত। যে ঘরে মেয়ের মৃতদেহ আছে, সেখানে ঘরের এককোণে কিছু দূরে দাঁড়িয়ে আয়ান কাঁদছে। চেয়ারে, খাটে অনেক রক্ত লেগে আছে। মেয়েটার সারা শরীর সাদা কাপড়ে ঢেকে খাটে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। ঘরের দুটো জানলাই বন্ধ, ঘরে একটা ফায়ারপ্লেস আছে। জিজ্ঞেস করে জানলাম, মেয়েটা ঘরেই ছিল। ল্যাপটপে খেলছিল। ঠিক একই রকম আঘাতের চিহ্ন। সারা শরীর কারো আক্রমণে ক্ষত-বিক্ষত।

ক্যাসলের বাইরে একটা বড়ো গলফ কোর্স আছে। বেরোনোর পরে শুনলাম, সেখানেও নাকি দুজনের ডেডবডি পাওয়া গেছে।

সন্ধে হয়ে আসছে। ঘরে ফেরামাত্র এরিকের সই করা একটা নোট পেলাম। ক্যাসলের সিকিউরিটি উপদেষ্টার থেকে নোটটা, তাতে এরিকের স্বাক্ষর। জরুরি মিটিং-এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে রাত এগারোটার এই দ্বীপ ছেড়ে দেওয়া হবে। বাসে করে এই আইল্যান্ড থেকে বার করে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হবে। এখানে আর থাকা সম্ভব হবে না।

এরিককে ফোন করতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তার আগেই এরিকের ফোন এল।

ক্লান্ত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম—আমারই ভুল। নিজের জেদে এখানে থেকে সবার বিপদ বাড়িয়ে দিয়েছি। আজকেই মনে হচ্ছে সেই রাত। সবে সে তাণ্ডব শুরু হয়েছে। এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী স্টেফানের সঙ্গেও কথা হল। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে সুইডেনের পুলিশের হাতে এ কেস তুলে দেওয়া হবে। এক ঘণ্টার মধ্যে বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সবাইকে তাদের বাড়ি বা পছন্দমতো জায়গায় ছেড়ে দিয়ে আসা হবে। যাদের অন্য কোনো বাসস্থান নেই, তাদের জন্য আমি হোটেলের বন্দোবস্ত করেছি।—একটু থেমে উনি আবার বলে উঠলেন, আমি খুব দুঃখিত। তোমাকে এরকম একটা সাংঘাতিক বিপদের মধ্যে শুধু শুধু টেনে এনেছি। এর মধ্যে দ্বীপের নানা জায়গায় আরও পাঁচটা ডেডবডি পাওয়া গেছে। শি ইজ অন এ র‍্যাম্পেজ। আমাদের কিছুই করার নেই। —লক্ষ করলাম, এরিকের গলা ভয়ে কাঁপছে।

—কিন্তু আপনি কোথায় যাবেন?

এরিকের গলা যেন দুঃখে বুজে এল— আসলে আমাদের অন্য কিছু বাড়ি আছে। আগে যদিও কোনোদিন থাকিনি। তবে রেডি করতে কিছুদিন লাগবে। আপাতত কিছুদিন হোটেলে গিয়ে উঠব।

আশ্বস্ত করার কোনো শব্দ খুঁজে পেলাম না। একই সঙ্গে এই রোবট, স্পেস সায়েন্স আর আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের যুগে একটা প্রেতাত্মার ভয়ে আমরা সবাই এই ক্যাসল ছেড়ে বেরিয়ে যাব, সেটাও মেনে নিতে পারছিলাম না।

ঠিক করলাম, যতই রিস্ক থাকুক, না কেন, এক-এক করে ক্যাসলের ভেতরের বিভিন্ন বাড়িতে যাব। হয়তো এর মধ্যেই কিছু রহস্য লুকিয়ে আছে। সঙ্গে টর্চ আর ফোনটা শুধু নিলাম।

বাইরে ক্যাসলের সব আলো জ্বলে উঠেছে। সোনার কাজ করা পোস্টের উপরে ষড়ভুজের মতো আলোর শেড। আলোগুলো তার মধ্যে এমনভাবে জ্বলে উঠেছে যে মনে হচ্ছে

অন্ধকারকে তার নিজস্ব জায়গা দেওয়ার জন্যই তাদের উপস্থিতি। এরকম কত যে দামি জিনিস ছড়িয়ে আছে এ ক্যাসলে তার কোনো ইয়ত্তা নেই।

সব মিলিয়ে মনে হচ্ছে এ যেন এক রূপকথার ছবি। বাইরে কোনো লোকজন দেখতে পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে এ যেন ঘুমিয়ে-পড়া এক পঞ্চদশ শতাব্দীর শহর। ক্যাসলের বিভিন্ন বিল্ডিং-এর ঘরগুলোতে আলো জ্বলে উঠেছে। কালো বেড়ালের চোখের মতো তারা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। একটা টাওয়ারের দিকে এগিয়ে গেলাম। আজ সব খোলা, প্রহরাহীন। হয়তো খানিকক্ষণের মধ্যে পুলিশবাহিনী এসে পড়বে। কিন্তু মাঝের এ সময়টুকু সবাই তাদের সব থেকে নিরাপদ স্থানে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। ঘোরানো সরু সিঁড়ি টাওয়ারের উপরের দিকে উঠে গেছে। সিঁড়িতে অন্ধকার থাকায় টর্চ জ্বেলে এগিয়ে গেলাম। সিঁড়ির রেলিং ধরে ধরে চারটে তলা পেরিয়ে টাওয়ারের উপরে ছাদে উঠে এলাম।

এর উপর থেকে পুরো দ্বীপটা দেখা যায়। অবশ্য এখন যথেষ্ট অন্ধকার হয়ে গেছে। তার উপরে আকাশ কালো মেঘে ঢাকা। কিছুই দেখা গেল না। কনকনে ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে। মাঝেমধ্যে মনে হচ্ছে এ যেন হাওয়ার স্পর্শ নয়, এমিলির প্রেতাত্মার তীক্ষ্ন নখের আঁচড়। শুনেছি, এই টাওয়ারের সামনেই একটা পোস্টে বেঁধে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছিল এমিলিকে। একা এমিলিকে নয়, এমিলির সঙ্গে ওর একমাত্র সন্তানও ছিল। ফ্রিৎজ মাতসারের লেখা বইটা ইতিমধ্যে পড়ে ফেলেছি। আসলে এমিলি ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছিল। সে ডাইনি ছিল না। সে ছিল এক অতি সাধারণ মেয়ে যে রাজার অন্যায় কিছু কাজের প্রতিবাদ করেছিল। সে ছিল এ ক্যাসলের অবিচারের শিকার। এরকম কত অসহায় মানুষের রক্ত— আর্তনাদ যে মিশে আছে এ ক্যাসলের মাটিতে। সেখানে এমিলির আত্মা যে এ ক্যাসলের বাসিন্দাদের ক্ষমা করবে না, এ তো স্বাভাবিক।

ঠিক বলেছ— কে যেন একটু খোনা গলায় আমার কানের পাশে ফের বলে উঠল,—কী করে আমি ক্ষমা করি বলো তো!

চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়ালাম। কেউ তো নেই! মনের ভুল?

নামার সময় টাওয়ারের প্রত্যেকটা ঘরে আলো জ্বেলে দেখলাম। কিছুই খুঁজে পেলাম না। সত্যি কথা বলতে কী যতবার কোনো ঘরে আলো ফেলছিলাম, হৃৎস্পন্দন যেন বেড়ে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, হঠাৎ আলোর ওপারে দেখব তাকে। এমিলির সেই বীভৎস প্রেতাত্মাকে। মুখে হয়তো তার এখনও রক্ত লেগে আছে। সে হয়তো আমার দিকে স্থিরভাবে হিংস্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে খানিক দূরেই দাঁড়িয়ে আছে।

কিন্তু সেটা দেখতে হয়নি। আলোয় ধরা পড়েছে শুধুই তার নীরব অনুপস্থিতি। পুরো টাওয়ারে কারোর দেখা পেলাম না।

টাওয়ার থেকে নেমে এবারে যে বিল্ডিং-এর মধ্যে 'ওক হল', সেদিকে এগিয়ে গেলাম। এখানেই ক্যাসলের সব থেকে বড়ো ইভেন্টগুলো হয়। এখানেই গত চারশ বছর ধরে রাজারাজড়ারা তাদের সম্মানিত অতিথিদের নৈশভোজের আয়োজন করতেন।

ওক কাঠের বিশাল দরজা ঠেলতেই খুলে গেল। প্রসিদ্ধ ওক হল এখন আমার সামনে। বিশাল ঘরে শুধু কিছু আলো জ্বলছে। দূরে বিশাল মার্বেলের ফায়ারপ্লেস। দেওয়ালে টাঙানো বিভিন্ন দুর্মূল্য ছবি।

—আপনি কি কিছু খুঁজছেন?

প্রশ্নে চমকে উঠে দেখি, একজন সিকিউরিটি আমাকে দেখে বাইরে থেকে এগিয়ে এসেছে।

—হ্যাঁ, বেরিয়ে যাওয়ার আগে একটু ঘুরে দেখছি। আর তো মাত্র কয়েক ঘণ্টা।

লোকটা আমাকে কিছু না বলে একটু দূর থেকে আমার উপরে লক্ষ রাখতে লাগল। সেটা অবশ্য অস্বাভাবিক নয়। আমাকে তো চেনে না। ঘরে অনেক দুর্মূল্য জিনিষস আছে।

ওক রুমের ভেতরে শেষের দিকে একটা চওড়া ঘোরানো সিঁড়ি আছে। সেটা উপরে উঠে গেছে। কী মনে হল, সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে এলাম। এখানে যখন কোনো পার্টি হত, তখন উপরে হয়তো কিছু বিশিষ্ট অতিথির বা রাজপরিবারের সদস্যদের জন্য আলাদা করে বসার ব্যবস্থা ছিল। ভারী সুন্দর কাঠের কাজ করা দেওয়াল।

আমি পিছনের লোকটার থেকে একটু এগিয়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎ মনে হল কীসের যেন আওয়াজ। সামনে থেকে আওয়াজটা আসছে। চমকে উঠলাম। মনে হল, একটা কালো ছায়া যেন সামনে থেকে চট করে সরে গেল। সতর্ক হয়ে সেদিকে এগিয়ে গেলাম। পা হঠাৎ করে পিছলে কাঠের মেঝেতে পড়ে গেলাম। মাটিতে চারদিকে রক্তের ধারা। কিছু দূরে একজন সিকিউরিটির দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে আছে। লোকটার প্রাণ আছে কি না দেখতে উবু হয়ে বসে পালস দেখার চেষ্টা করলাম। নাহ, প্রাণ নেই। কিন্তু শরীর এখনও গরম। মিনিটখানেক আগেই বলা যায়, আমার সামনেই এ ওই প্রেতাত্মার শিকার হয়েছে। দেখতে গিয়ে আর পিছলে পড়ে আমার সারা গায়ে রক্ত লেগে গেল। কীরকম শিরশিরিয়ে উঠল সারা গা।

ইতিমধ্যে পায়ের আওয়াজ পেয়ে ঘুরে তাকাতেই দেখি, অন্য সিকিউরিটি এসে দাঁড়িয়েছে যার সঙ্গে আগে কথা বলেছিলাম। কিন্তু আমাকে ওরকম ডেডবডির সঙ্গে বসে থাকতে দেখে লোকটার মুখ ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। আমাকে লক্ষ করে কাঁপা হাতে বন্দুক ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তারপর লোকটা আস্তে আস্তে পিছু হাঁটতে শুরু করল।

আমাকেই এই আধো-অন্ধকারে ভূত ভাবছে নাকি? অবশ্য এটা ঠিক যে এখানে আলো এত কম যে আমাকে ভালো করে দেখা সম্ভব নয়। একই সঙ্গে সহকর্মীর রক্তাক্ত দেহ ও নিশ্চয়ই দেখতে পেয়েছে।

হাত তুলে দাঁড়িয়ে কিছু বলার আগেই লোকটা এলোপাথাড়ি কয়েকটা গুলি চালিয়ে সিঁড়ি দিয়ে পাগলের মতো নামতে শুরু করল। উপর থেকে দেখতে পেলাম, সিঁড়ি দিয়ে নেমে ওক রুমের মধ্যে দিয়ে ছুটে দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু ওটা কী? মাঝপথে কাঠের ফ্লোরের উপরে একটা জায়গা জুড়ে যেন জমাট-বাধা অন্ধকার। কে যেন মেঝের উপরে বসে আছে। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। কিন্তু তার আগেই লোকটা যেন ওই অন্ধকার ছায়ার মধ্যে ঢুকে পড়েছে। আর ঢুকতেই যেটা হল, সে ভয়ানক দৃশ্য আমি মুখে বলতে পারব না। ছায়াটা যেন ঢেউয়ের মতো নড়ে উঠল। আর তার পরক্ষণেই লোকটার চিৎকার শুনলাম। তীব্র আর্তনাদ, কিন্তু সে আর্তনাদ কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে থেমে গেল। টর্চের আলো অতদূরে ফেলে কিছু লাভ হল না। যেটুকু দেখা যাচ্ছে, সেটা ওক রুমের সামান্য আলোতেই। আর তাতে দেখলাম, লোকটার রক্তে ভাসা ক্ষতবিক্ষত দেহটা পড়ে আছে। ঘন কালো ছায়াটা এবার দেহটাকে ছেড়ে দ্রুত সিঁড়ির দিকে অর্থাৎ আমার দিকে এগিয়ে এল। বুঝতে পারলাম আমার সময় নেই। আমি ওই আত্মার পরবর্তী শিকার হতে চলেছি।

যেদিকে অন্য লোকটার মৃতদেহ পড়ে ছিল, সেদিকে ছুটে গেলাম। মৃতদেহটা পেরিয়ে হলঘরের শেষের দিকে একটা ঘর, তার দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে দরজা টেনে দিলাম।

বিশাল কাঠের দরজা খিল দিয়ে বন্ধ করে দিলাম। এটা যদিও কোনো প্রেতাত্মার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিরোধ গড়বে না, তবু এই দূরত্ব যদি কোনোভাবে আমাকে প্রাণ বাঁচাতে সাহায্য করে।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বুঝলাম, বাইরে সে এসে গেছে। অর্থাৎ দরজার ঠিক বাইরেই এমিলি।

যেন ঘরের দরজায় হাতড়ে হাতড়ে ঢোকার পথ খুঁজছে। বেশ বুঝতে পারছি দরজার উলটোদিকে এ কোনো জীবিত মানুষের উপস্থিতি নয়। একটা অদ্ভুত হিজ হিজ আওয়াজ শুরু হয়েছে। কেউ যেন অনেকগুলো হাত দিয়ে দরজার বিভিন্ন জায়গা ছুঁয়ে দেখছে। কাঠের দরজাটা উচ্চতায় প্রায় চোদ্দো ফুটের হবে। দরজার উপরের প্রান্তে কোনো জীবিত মানুষের পক্ষে পৌঁছোনো সম্ভব নয়। কিন্তু বাইরের সে যেই হোক না কেন, তার হাত যে দরজার

উপরের প্রান্ত অব্দি অনায়াসে পৌঁছোচ্ছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সে হাত দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখছে, ঢোকার উপায় খুঁজছে, বেশ বুঝতে পারছি। সঙ্গে সেই অদ্ভুত আওয়াজ। হিজ হিজ।

কেন জানি না কী করব, তা বুঝে উঠতে পাচ্ছিলাম না। নিজেকে ফিরে পেতে কয়েক মিনিট লেগে গেল। বাইরে তখনও যেন সেই প্রেতাত্মা দরজার উপরে চূড়ান্ত আক্রোশে আঁচড়ে যাচ্ছে। মুখে সেই অদ্ভুত আওয়াজ। মাঝেমধ্যে সামান্য নীরবতা। যেন ঘরে ঢোকার নতুন কোনো উপায় খুঁজছে।

হঠাৎ ভারী কাঠের দরজা কাঁপতে শুরু করল। কারোর অমানুষিক শক্তি না থাকলে এভাবে কাঁপাতে পারে না। খিল ভেঙে যাবে না তো! এরপরে যেটা হল, সেটার জন্য আমি আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না। মনে হল যেন অন্যদিক থেকে মোটা কাঠের দরজার মধ্যে কেউ ধারালো নখ বার বার ঢুকিয়ে দিচ্ছে।

টর্চ জ্বেলে ঘরের চারদিকে ফেললাম। বিশাল ঘরের এককোণে কিছু পানীয়ের বোতল রাখা আছে। তার মধ্যে কয়েকটা অ্যাপেল সাইডার ভিনিগারের বোতলও আছে। ঘরে একটা জানলা আছে। কিন্তু সেটা আশ্চর্যরকম ছোটো। তার মধ্যে দিয়ে বেরোনো অসম্ভব। সেরকম কিছু হলে জানলা খুলে যে লাফ দেব নীচে, সে উপায়ও নেই। ফোন করতে গিয়ে দেখলাম, নেটওয়ার্ক নেই। যখন দরকার, ঠিক তখনই নেটওয়ারক নেই।

ঘরে কোন ফায়ারপ্লেস নেই।

বাইরে যে-ই থাকুক-না কেন, সে এখনও যে যায়নি তা বেশ টের পাচ্ছিলাম। সে যেন তার পরের স্ট্র্যাটেজি ঠিক করছে।

হঠাৎ করে সেই হিজ হিজ আওয়াজটা আবার শুরু হয়ে গেল। একই সঙ্গে কেউ যেন ছেনি দিয়ে দরজার কাঠ কাটতে শুরু করেছে নীচ থেকে। তাহলে কি দরজার নীচটা কেটে ফেলে ঢোকার চেষ্টা করছে যাতে সে ঘরে ঢুকে আসতে পারে?

কী মনে হল জানি না। অ্যাপেল সাইডার ভিনিগারের বোতলগুলো এক-এক করে খুলে দরজার দিকে লক্ষ করে ঢেলে দিলাম।

আশ্চর্যভাবে বাইরের আওয়াজটা সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল। কিন্তু বাইরে যে ছিল, সে চলে গেল কি না তা বুঝতে পারলাম না।

হঠাৎ করে এর মধ্যে আমাকে খানিকটা চমকে দিয়ে ফোনটা বেজে উঠল। চারদিকের এসব অপার্থিব ঘটনার মধ্যে এ পার্থিব শব্দটা যে কতটা স্বস্তি দিল, তা বলে বোঝাতে পারব না। কখন জানি নেটওয়ার্ক ফিরে এসেছে। এরিকের ফোন।

—অনিলিখা, কোথায় তুমি? তোমায় কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না। ফোনেও পাচ্ছি না।

আমি ফিসফিস করে বলে উঠলাম, আমি ওক রুমে আটকে আছি। সে এখানে আমার ঘরের বাইরে বসে আছে।

উলটোদিক থেকে এরিকের দুর্বল গলা শুনলাম— শুনতে পাচ্ছি না। তোমার গলা শোনা যাচ্ছে না। জোরে বলো। কোথায় তুমি?

এবারে চেঁচিয়ে বলে উঠলাম। লাভ হল না। ওদিক থেকে শুনতে পাচ্ছে না। আবার নেটওয়ার্ক চলে গেছে।

আরও মিনিট পনেরো বসে থাকলাম। কিন্তু সে পনেরো মিনিট যেন পনেরো ঘণ্টার সমান। মনে হচ্ছিল বাইরে যে ছিল, সে আর নেই। অন্তত তার উপস্থিতি বোঝার কোনো উপায় নেই।

হাতে তখনও একটা ভিনিগারের বোতল ধরে আছি। এর মধ্যে কি কিছু আছে, যা দরজার উলটোদিকের প্রেতাত্মাকে ভয় পাওয়াল? নিজের প্রশ্নে নিজের হাসি পেল।

সাইডার মানে অ্যাসেটিক অ্যাসিড। একটা কথা সঙ্গে সঙ্গে মাথায় এল। তাহলে কি...?

নাহ, ভয় পেলে চলবে না। যা ভাবছি, সেটা যদি সত্যি হয়, তাহলে তার সমাধান খুব শক্ত নয়।

পর পর কয়েকটা জিনিস মাথায় চলে এল। এ ঘটনা প্রায় ২২০ বছর পর পর হয়েছে। ১৩ আর ১৭ গুণ করলে হয় ২২১। দুটোই প্রাইম নাম্বার।

মাই গড!

তবে তাতে আততায়ীরা যে কম হিংস্র হবে তা তো নয়। তারা আমাকে সামনে পেলে এক মুহূর্তের মধ্যে কেটেছিঁড়ে ফেলবে।

—তারা মানে? এতক্ষণ তো একটা প্রেতাত্মার কথা বলছিলে। —প্রতীক আর ধৈর্য না রাখতে পেরে বলে উঠল, ওখানে কি একাধিক প্রেতাত্মা ছিল? অবশ্য তা না হলে একসঙ্গে এতজনকে মারত কীভাবে!

—উঁহু, সব তো আর এত সহজে বলে দেওয়া যাবে না। শোন। গল্পের সামান্য বাকি আছে।

অনিলিখা ফের বলে উঠল—দরজা খুলে আস্তে আস্তে বাইরে বেরিয়ে এলাম। বাইরে কেউ নেই। কিন্তু সাইডার ফেলার জন্য সারা ঘরে একটা বিচ্ছিরি গন্ধ হয়ে রয়েছে। গন্ধ পাচ্ছি মানে নিশ্চিন্ত। তারা এখানে থাকবে না।

সত্যি নেই। সিঁড়ি দিয়ে নেমে ওক রুমের থেকে বেরিয়ে এলাম।

বাইরে বেরিয়ে দেখি চারদিকে অনেক সিকিউরিটি। সুইডিশ পুলিশফোর্শ এসে গেছে। হঠাৎ করে যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে এ ক্যাসল।

৫

এরিককে খুঁজে বার করতে বেশি সময় হল না। দুটো বাস ইতিমধ্যেই স্টকহোমের উদ্দেশে বেরিয়ে গেছে। বাকি আরও কয়েকটা বাসে সবাই তাড়াহুড়ো করে উঠছে।

এরিক আমার জন্য দুশ্চিন্তা করছিলেন। আমাকে দেখে অবাক হয়ে এগিয়ে এলেন।—কী ব্যাপার? তোমার সারা গায়ে রক্ত! কী হয়েছে? আমি তোমার জন্য খুব চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। ভাবছিলাম, তোমার কোনো বিপদ হল কি না।

পুরো ঘটনাটা এরিককে বললাম। আর এও বললাম যে এখানে কোনো প্রেতাত্মা নেই। যা আছে, তার একটাকে আমি মরে পড়ে থাকতে দেখেছি ওই বন্ধ ঘরের সামনে।

—মানে সেটা কী?— মিলন বলে উঠল।

—মাকড়সা। একটা নতুন প্রজাতির মাকড়সা, যার মতো হিংস্র মাকড়সা খুব কমই হয়। যারা হাজারে হাজারে একসঙ্গে ঘোরে। একসঙ্গে শিকার খুঁজে বার করে আক্রমণ করে। যারা এ আইল্যান্ডে আসে ঠিক ২২১ বছর পর পর। তারপরে বিচিত্র কোনো কারণে হয়তো আবার সব মারা যায়।

—কিছুই বুঝলাম না। এ কি নতুন কোনো মাকড়সা! তুমি তো দু-ধরনের মাকড়সার কথা বলেছিলে। এর কথা তো বলোনি?

—হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস। এ আইল্যান্ডে দু-ধরনের বিরল প্রজাতির মাকড়সা হত। কিন্তু একটা জন্মাত প্রতি ১৩ বছর পরে পরে, অন্যটা আসত প্রতি ১৭ বছর বাদে বাদে। ১৩ আর ১৭ দুটোই প্রাইম নাম্বার। অর্থাৎ এমনিতে ওই দু-ধরনের মাকড়সা কখনোই একসঙ্গে দেখা যায় না। এরিক ঠিকই বলেছিলেন যে উনি কখনোই ওদের একসঙ্গে দেখেননি। কিন্তু ২২১ বছর বাদে বাদে একটা সময় আসত, যখন ওই দুই মাকড়সার প্রজাতি একই সঙ্গে আসত। যেটা এবারে হয়েছিল। আগেও ক্যাসলের ইতিহাসে দুবার হয়েছে। এই দুই প্রজাতি যখনই একসঙ্গে আসত, এদের মধ্যে প্রজননের বা ইন্টারব্রিডিং-এর জন্য জন্মাত এক নতুন তৃতীয় প্রজাতির মাকড়সা, যাদের মতো হিংস্র মাকড়সা খুব কম হয়। যারা দলে মিলে আক্রমণ করে। খুব দ্রুত এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলে যেতে পারে। সেজন্যই দেখলে মনে হত যেন কোনো ছায়াশরীর হঠাৎ করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সরে যাচ্ছে। ধারালো

পায়ের সাহায্যে এরা মানবশরীর চিরে টুকরো করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখত। একই সঙ্গে যথেষ্ট বুদ্ধি রাখত।

—তার মানে এমিলির প্রেতাত্মা কোনোদিন ছিল না?— সহেলি বেশ হতাশ হয়ে বলে উঠল।

—না, ছিল না। ছিল শুধু হাজারে হাজারে জন্মানো এক সাংঘাতিক মাকড়সা, যারা একরাতের মধ্যে আমাদের সবাইকে মেরে ফেলার ক্ষমতা রাখত। আমরা তাই আইল্যান্ড ছেড়েছিলাম সেইরাতেই। আমার ধারণা যে ভুল ছিল না, তা পরে প্রমাণিত হয়েছিল। পুরো আইল্যান্ডকে ওই মাকড়সামুক্ত করতে বেশ কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। সেগুলো কাজও করেছিল। ওই বিশেষ প্রজাতির মাকড়সা নিয়ে এখন অনেক রিসার্চও হচ্ছে।

আমার ধারণা, অস্কারের মেয়ে উইলমাও আসল কারণটা বুঝতে পেরেছিলেন। সেজন্যেই ওই ল্যাব তৈরি করেছিলেন। কিন্তু সে ধারণা প্রমাণ করার কোনো উপায় পাননি। কারণ ওরা তখন এই আইল্যান্ডে আর ছিলেন না। ওরা ফিরে আসেন প্রায় পঁচিশ বছর পরে, যখন ওই প্রজাতির মাকড়সারা আর আইল্যান্ডে ছিল না। প্রশ্ন— কেন ছিল না? সে প্রশ্নের উত্তর পেতে অবশ্য এখনও অপেক্ষা করতে হবে। আশা করি, ওই প্রেতাত্মার কথা ইতিমধ্যেই সুইডেনের ইতিহাসের বই থেকে বাদ পড়ে গেছে। তবে মানুষের মন থেকে যে অত সহজে মুছে যাবে না তা আমি জানি।

আমরা ভয় পেতে চাই। সত্যি বলতে কী অ্যাপেল সাইডার ভিনিগারের বোতলগুলো থেকে ভিনিগার ঢালার সময়ও আমি কিন্তু ওই প্রেতাত্মাকে সত্যি বলে ভাবতে শুরু করেছিলাম। ঘরের বাইরে এসে ওই একটা মৃত মাকড়সা দেখেই প্রথম বুঝতে পারি, বাইরে কারা এসেছিল আর কেন তারা অ্যাপেল সাইডার ঢালার পরে সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল। ওতে অ্যাসেটিক অ্যাসিড থাকে, যা মাকড়সারা সহ্য করতে পারে না।

অনিলিখা একটু থেমে ফের বলে উঠল, এর পরেও তোরা বলবি সংখ্যা মানে নিছকই কিছু সংখ্যা!

আমরা সবাই চুপ করে থাকলাম।

তন্ময় শুধু বলে উঠল, ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হল, আজ এখানে আমরা ঠিক সতেরোজনই আছি। আর আঠেরোটা মাছের কচুরি। তাই একটা আমি আজ বেশি নিলাম।—বলে আমরা ভদ্রতা করে যে শেষ কচুরিটা অনিলিখাদির জন্য রেখে দিয়েছিলাম, সেটা ও তুলে নিল।

৮ এপ্রিল ২০১৯

আরলি, ইংল্যান্ড

এ যুদ্ধ শেষ হবেই

এরকম বিপদে আগে কখনো পড়িনি। তাও আবার বিদেশে। দেশের মাটি থেকে আট হাজার কিলোমিটার দূরে। আত্মীয়-পরিজন, চেনাজানা সব মানুষের থেকে অনেক অনেক দূরে।

যেখানে শিকড় থাকে না, সেখানে উৎখাত হতে বড়ো ঝড়ও লাগে না। এখানে ইংল্যান্ডে এখন পরিস্থিতি ঝড়ের থেকেও খারাপ। কোভিড যেন কিছুদিনের জন্য সবকিছু স্তব্ধ করে দিয়েছে। একই সঙ্গে স্তব্ধ করে দিয়েছে আমার ভবিষ্যৎ। আমার কেরিয়ার।

এখন নভেম্বরের শুরুর দিক। বাড়ির পিছনের দিকে একটা বড়ো মাঠ। তারপরে একটা চার্চ আছে। চার্চ-লাগোয়া একটা বড়ো কবরখানাও আছে। এই মাঝের খোলা মাঠ আর ঘাসজমিকে ঘিরে বেশ কিছু ওক, সিলভার বার্চ, হর্স চেস্টনাট আর হথহর্নের মতো বড়ো বড়ো গাছ আছে এখানে। এখন অবশ্য তাদের সব পাতা পড়ে গেছে। রিক্ত কঙ্কালসার চেহারায় তারা এখন সব বসন্তের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। ঘাসের উপরে শুধুই শুকনো পাতার ভিড়।

শেষ কদিন হঠাৎ করে বেশ ঠান্ডা পড়েছে। দিনের বেলাতেও জবুথবু হয়ে বসে থাকি। আমার একমাত্র পুরোনো রংজ্বলা লংকোটটা পরে। এখন দিনের বেলা বেশ ছোটো হয়ে এসেছে। বিকেল পাঁচটা নাগাদ গাছের উপরের দিকের ডালগুলো ডুবন্ত সূর্যের সোনালি আলোয় সেজে ওঠে। তারপরে ছ-টায় চারদিক অন্ধকার হয়ে যায়। তবু বসে থাকি। একজনের অপেক্ষায়।

গত কয়েক মাস আলাপ হয়েছে। সে অবশ্য আরেকটু রাত হলে এখানে আসে। তার কথায় পরে আসছি।

তার আগে আমার কথা বলি।

দেড় বছর হল, ইংল্যান্ডে একটা নামী ইউনিভার্সিটিতে অঙ্ক নিয়ে BA পড়তে এসেছি। দেশ থেকে পরীক্ষা, ইন্টারভিউয়ের পরে যখন এই বিশ্ববিখ্যাত ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সুযোগ পেলাম, তখন মনে হল, হাতে চাঁদ পেয়েছি। কতদিনের স্বপ্ন এই আটশো বছরের পুরোনো বিখ্যাত ইউনিভার্সিটিতে পড়ব। এ সুযোগ ছাড়া যায়! আমাদের মধ্যবিত্ত পরিবার। বাবা এডুকেশন লোন নিয়ে অনেক কষ্ট করে ইউনিভার্সিটি ফি-র ব্যবস্থা করলেন।

এতটা অব্দি সব ঠিক ছিল। যেন এক অত্যন্ত সফল ছাত্রের সিঁড়ি ভাঙার গল্প। কিন্তু তারপরেই সবকিছু পালটে গেল।

এ বছরে মার্চ মাসে ইংল্যান্ডে ও সারা বিশ্বে হঠাৎ করে কোভিড শুরু হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু বন্ধ হয়ে গেল। এমনকী দেশে ফেরার উপায়ও। এখানে কিছু ছোটোখাটো কাজ করে পড়াশোনার খানিকটা খরচ জোগাব, সেরকম ভরসায় এসেছিলাম। সেসব কাজ-পাওয়ার কোনো উপায় থাকল না। লকডাউনে কাজের সুযোগ প্রায় নেই। পড়াশোনার খরচের বাইরে ইউনিভার্সিটির হস্টেলের খরচ— সে আরেকটা বড়ো খরচ। বাধ্য হলাম খুব ছোটোখাটো কোনো থাকার জায়গার খোঁজ করতে যেখানে খুব কম ভাড়ায় থাকা যায়।

শেষে পেলামও। একটা ছোটো একতলা বাড়ি। বাড়ি বলতে একটাই বড়ো ঘর। তার একপাশে রান্নার ব্যবস্থা। সঙ্গে একটা ছোটো টয়লেট। এর সামনে একটা ছোটো বাগান আছে। এটা আসলে একটা বড়ো বাড়ির পিছনের দিকের একটা আলাদা ঘর। মুল বড়ো বাড়িতে অন্য এক পরিবার ভাড়া থাকেন। পিছনের দিকে অবহেলায় পড়ে ছিল এই ঘরটা। এর বয়স কত হবে বলা মুশকিল। মনে হয়, একটা সময় আস্তাবল ছিল। তারপরে এটা পড়ার ঘর হিসেবে কেউ ব্যবহার করত।

পাথরের বাড়ি। উপরে অনেক পুরোনো দিনের স্লেট পাথরের ছাদ। সে ছাদ ধরে রেখেছে বড়ো বড়ো ওক কাঠের বিম। কাঠের মেঝে। জানলাগুলো ঘরের তুলনায় ছোটো। সেজন্য ঘরে আলো একটু কম। এটা ফাঁকা পড়ে ছিল। খুব কম ভাড়ায় পেয়ে গেলাম। যদিও সেটাও কতদিন দিতে পারব জানি না।

বিদেশে আসার এরকম স্বপ্ন দেখাটাই ভুল হয়েছিল। বুঝতে পারি, বাবা কত কষ্ট করে ইউনিভার্সিটির পড়ার খরচ জোগাচ্ছে। তার উপরে যদি থাকার খরচ দিতে হয় ভারত থেকে!

এ বাড়িটার পিছনেই এই মাঠটা। যখনই মন খারাপ হয়, ফেন্সের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এখানে এসে বসি। এখানেই ওই মহিলার সঙ্গে আলাপ।

প্রথম আলাপে বেশ চমকে উঠেছিলাম। কখন যে ওই মহিলা পাশের বেঞ্চিতে এসে বসেছিল, জানি না।

ভারী মিষ্টি গলা। স্কটিশ উচ্চারণ। প্রশ্নটা করেছিল। প্রশ্ন অবশ্য ঠিক নয়। মন্তব্যই বলা যায়।

—যুদ্ধ যে কবে শেষ হবে, কে জানে!

—হ্যাঁ, এটা যুদ্ধের মতোই বটে। কবে যে শেষ হবে, কে জানে!

অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, যুদ্ধের মতো কেন! যুদ্ধই তো! ফ্রান্সে যে যুদ্ধ চলছে, আমি তার কথা বলছি।

এবার আমার একটু অবাক হওয়ার পালা। ব্রেক্সিট নিয়ে কিছু কি বলতে চায়? ইংল্যান্ডের ইয়োরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে আসার ব্যাপারে কিছু? কিন্তু সেক্ষেত্রে ব্রাসেলস বলা

উচিত। এই বিষয়ে কিছু বলতে চায়?

একবার কিছু দূরে বসে-থাকা ওই মহিলার মুখ দেখে নিলাম।

ভারী সুন্দর চোখ দুটো। চোখের মণি নীল। বড়ো বড়ো চোখের পলক। মুখে কোনো প্রসাধন নেই। কিন্তু তাতেই যেন বেশ আকর্ষণীয় লাগছে। বয়স কুড়ির কাছাকাছি হবে।

মুখে গভীর বেদনার ছাপ। যেন হঠাৎ করে এক সোনালি বিকেল কালো মেঘের আড়ালে হারিয়ে গেছে।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে ফের বলে উঠল, জন যখন প্রথম গেল বলেছিল, এক মাসের মধ্যে ফিরে আসবে। তারপরে দেখতে দেখতে যে কত মাস কেটে গেল। তারপর মাস কেটে বছর। কিন্তু কবে যে যুদ্ধ শেষ হবে!

আবার আড়চোখে তাকালাম। ঠিক পাগল বলে মনে হয় না। তবে যে পোশাক পরে আছে, এখন সেরকম পোশাক কম দেখি। পা অব্দি গ্রেলংকোট। কোমরে বেল্ট। পায়ে গামবুট।

ফের বলে ওঠে, জন শুরুর দিকে অনেক চিঠি লিখত। এখন খুব কমই লেখে। একদম সময় পায় না। সব চিঠি নাকি সিকিউরিটি চেক হয়ে আসে। সব কথা লেখার নিয়ম নেই। এমনকী কোথায় আছে, সে বিষয়েও লিখতে পারে না। ও আছে যুদ্ধের ফ্রন্টলাইনে, ট্রেঞ্চের মধ্যে। আগে নাকি ট্রেঞ্চের পরিবেশ অনেক শান্ত ছিল। শুধু সতর্ক হয়ে অপেক্ষা করতে হত, কখন শত্রু ট্রেঞ্চ থেকে গোলাগুলি শুরু হয়। এখন আর সে পরিস্থিতি নেই। প্রায় রোজই মর্টার ফায়ার হচ্ছে। বড়ো বড়ো গোলা এসে পড়ছে। মাঝেমধ্যেই ট্রেঞ্চের বড়ো ক্ষতি হয়। তখন ওদের চটজলদি আবার ট্রেঞ্চ মেরামতি করতে হয়। সব সময় খুব ব্যস্ত থাকে।

একটু থেমে মহিলা ফের বলে উঠল—তুমি হয়তো এসব বুঝতে পারছ না। অনেকেই এই যুদ্ধ কীভাবে হচ্ছে তা জানে না। আমি ওর চিঠি থেকেই জেনেছি।

কথা শুনে বিড়বিড় করে বলে উঠলাম, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।

মহিলা যেন না শুনেই বলে উঠল, আমাদের বিয়ের ছয় মাসের মাথায় জন যুদ্ধে গিয়েছিল। আমার রোজ খুব চিন্তা হয়, কোনো বিপদ হল না তো? ফিরে আসতে পারবে তো? রাতে এসব চিন্তায় ঘুমই আসে না।

একটু থেমে মহিলা ফের বলে উঠল, তা তুমি যাওনি?

—কোথায়?

—যুদ্ধে! আবার কোথায়? সবারই তো যুদ্ধে যাওয়া উচিত। নিজের দেশকে বাঁচানোর জন্য। তা-ই না?

—মানে, আমি আসলে—

কী আর বলব। চুপ করে থাকি।

আমার বিব্রত মুখ দেখে মহিলা ফের বলে উঠল, বুঝেছি, তুমি ভারতীয়, তা-ই না?

আমি এতক্ষণে একটা বোধগম্য কথা শুনে মাথা নাড়লাম।—হ্যাঁ, ভারতীয়।

মহিলা মাথা নাড়ল—ঠিক কথা। তুমি কেন যাবে? আমরাও তো তোমাদের সঙ্গে সঠিক কাজ করিনি। তা-ই না? তোমাদের দেশ তোমাদের থেকে কেড়ে নিয়েছি।

বলে আমার দিকে তাকিয়ে ফের বলে উঠল, আমি কিন্তু কাগজ নিয়মিত পড়ি। তোমাদের ওখানে কী হচ্ছে, সবকিছুর খবর রাখি। এই তো কিছুদিন আগে দেখলাম তোমাদের দুই দলের নেতা—একজনের নাম জিন্না, অন্যজনের নাম বাল গ্যাঙ্গা না কী যেন—তাদের মধ্যে কী এগ্রিমেন্ট হয়েছে।

মহিলা কি ১৯১৬-র ডিসেম্বরের লখনউয়ে ন্যাশনাল কংগ্রেসের নেতা বাল গঙ্গাধর তিলক ও ইন্ডিয়ান মুসলিম লিগের মহম্মদ আলি জিন্নার মধ্যে সেই এগ্রিমেন্টের কথা বলছে?

বলে উঠলাম,বাল গ্যাঙ্গা নয়, বালগঙ্গাধর তিলক।

—হ্যা, ঠিক বলেছ। তোমাদের কিছু কিছু নাম এত শক্ত হয়। আগে আমি কাগজ পড়তাম না। জন যাওয়ার পর থেকে যুদ্ধের সব খবর রাখতে কাগজ পড়ি। তুমি তাহলে কী করো?

—আমি এখানে ইউনিভার্সিটিতে পড়ি।

—বাহ। তুমি খুব ভালো ছাত্র তাহলে! কী বিষয় নিয়ে পড়ো?

—কম্পিউটার সায়েন্স।

—কী সায়েন্স? যাক, সেসব অবশ্য আমার মাথায় ঢুকবে না। আমি স্কুলে পড়ার পর আর পড়িনি। তার পর পরই আমাদের বিয়ে হয়ে গেল। এই দু-বছর হল। জন এখানকার একটা কটন মিলে কাজ করত। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হতে ওকে আর্মিতে জয়েন করতে হল। আমার একটা ছোটো মেয়ে হয়েছে, তাকেও জন এখনও দেখেনি।

সেদিন এরকম আরও কিছু কথার পরে, হঠাৎ দেখি সে মহিলা উধাও।

সেদিনই প্রথম আলাপ। তারপরে মাঝেমধ্যেই দেখা হয়। ওর নাম জেনেছি। ইভা।

ঠিক যখন দিনের আলো ফুরিয়ে যায়, দূরে রাস্তার আলো জ্বলে ওঠে, বাসায় ফেরা পাখির ডাক কমে এসে শুধু মাঝেমধ্যে অচেনা রাতপাখির মিশ্রস্বর শোনা যায়, দূর থেকে শেয়ালের ডাক শোনা যায়, তখন ও আসে। আমার থেকে খানিক দূরে এসে বসে।

ও অবশ্য একা আসে না। সঙ্গে সঙ্গে ঘন কুয়াশাকে ডেকে আনে। আর থাকে একটা ভিজে মাটির গন্ধ। মেঘের আড়ালে লুকিয়ে-পড়া চাঁদের মতো ও সেই কুয়াশার মধ্যে হারিয়ে যায়

মাঝেমধ্যে। তার মধ্যে থেকেই ওর কথা ভেসে ভেসে আসে দূর থেকে ভেসে-আসা রেডিয়ো স্টেশনের চ্যানেলের মতো।

প্রথম দিন ভেবেছিলাম মহিলার বোধহয় মাথা খারাপ। এখন আর তা ভাবি না। ও কে তা আমি বেশ আন্দাজ করতে পারি। একটু যে ভয় করে না, গা ছমছম করে না, তা বলব না। কিন্তু তবু আসি। কী এক অজানা আকর্ষণে আসি।

ও হয়তো আমার মতোই বন্ধু খোঁজে। কথা বলার লোক খোঁজে। মন খারাপের কথা কারোর সঙ্গে শেয়ার করতে চায়। ঠিক আমার মতোই। একই সঙ্গে নানান প্রশ্ন। বুঝতে অসুবিধে হয় না ও এখনও পড়ে আছে একশো বছর আগে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে।

—আচ্ছা, তুমি জানো, ওখানে ট্রেঞ্চে শুধু মানুষ থাকে না। কী থাকে, আন্দাজ করতে পারো?

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে দ্বিগুণ উৎসাহে বলে ওঠে, জন বলে, বিশাল বিশাল বিশাল ইঁদুর থাকে ট্রেঞ্চে।

আমিও আমার সদ্য-পড়া জ্ঞান ফলাই। —হ্যাঁ, ওদের বলা হয় মৃতদেহের ইঁদুর। কর্পস র‍্যাট। এরা নাকি মৃতদেহ খেয়ে খেয়েই বড়ো ও মোটা হয়ে ওঠে। দুই ট্রেঞ্চের মধ্যে পড়ে থাকা অজস্র মৃতদেহ খেয়ে খেয়ে ওরকম চেহারা হয়।

বলেই বুঝতে পারি, কথাটা বলা ঠিক হয়নি। ও একটু চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফের বলে ওঠেঠিক বলেছ। বিশাল বিশাল ইঁদুর। জন চিঠিতে বলে, ও নাকি প্রথমদিকে রাতে ভয়ে ঘুমোতে পারত না। ও যে ডাগ আউটে শোয় সেখানেও ওর গায়ের উপর দিয়ে বড়ো বড়ো ইঁদুর ছুটে যায়। এখন নাকি ওর অভ্যেস হয়ে গেছে।

—হ্যা, তা-ই তো শুনেছি। জন ট্রেঞ্চে জলকাদার কথা বলে নি? ট্রেঞ্চের মধ্যে অনেক জলকাদা থাকে।

—হ্যাঁ, ও বলেছিল যে অনেকসময় জামাকাপড় সব জলকাদায় ভিজে যায়। যেখানে দাঁড়িয়ে থাকে, সেই কাঠের ডাকবোর্ডেও অনেক সময় জল জমে যায়। সে জলে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অনেকের নাকি 'ট্রেঞ্চফুট' হয়। ওর একজন বন্ধুর তার জন্য পা হাঁটু থেকে কাটা গেছে। তবে এখন ও এসব কথা আর লেখে না। জানে, আমি কষ্ট পাব। আমার এক বন্ধু আছে। শেলি। এসব কথা এখন আমি শেলির মুখে শুনি। এখন অনেকে নাকি গুরুতর আহত হচ্ছে। অনেকের হাত-পা কাটা পড়ছে।

অনেক সময় আবার হঠাৎ করে ট্রেঞ্চ অ্যাটাক হয়। শত্রু সেনা হ্যান্ড গ্রেনেড দিয়ে ওদের ট্রেঞ্চআক্রমণ করে। গোলাগুলি শুরু হলে মনে হয় যেন চারদিকে পেরেক বৃষ্টি হচ্ছে। সে

পেরেক আর লোহার টুকরো ছিটকে এসে শরীরের মধ্যে ঢুকলে আর দেখতে হবে না!

সত্যি এরকম হয়?— ওর মুখে দুশ্চিন্তা ফুটে ওঠে। কুয়াশার আড়াল থেকে কথা বললেও বুঝতে পারি, ওর চোখ ছলছল করছে।

সাহস জোগাই।

—সব সময় যে হয়, তা নয়। ওরা তো ট্রেঞ্চে প্যারাপেটের আড়ালে থাকে। বালির বস্তার আড়ালে থাকে। তার আড়ালে থেকে হেলমেট পরে শত্রু ট্রেঞ্চের উপর নজর রাখে। জনের কিছু হবে না।

ইভা যেন নিশ্চিন্ত হয়। —ঠিক বলেছ। জন ওর মেয়েকেও দেখেনি এখন। নিশ্চয়ই সে কথা খেয়াল রেখে খুব সাবধানে যুদ্ধ করছে।

আমি চুপ করে থাকলাম। গত কদিন ট্রেঞ্চ নিয়ে কিছু পড়াশোনা করেছি, যাতে ওর প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারি।

আবার ও বলে উঠল, জার্মানরা খুব বাজে লোক হয়। ওদের জন্যই এত সমস্যা। যুদ্ধে না গেলে জন এতদিনে এখানে একটা বড়ো বাগান করত। আপেল, পেয়ারা, কমলালেবুর বাগান। আমরা সবাই একসঙ্গে থাকতে পারতাম। আমার বাগান খুব ভালো লাগে। তোমার?

—হ্যাঁ, আমারও খুব পছন্দ।

—তোমার ভারতের কথা মনে পড়ে না?

—হ্যাঁ, মনে পড়ে। খবর পাই। কিন্তু তবু খুব চিন্তা হয়। —ফোনের কথা আর বলি না ওকে। শুধু বলি বাড়ির কথা। বাবা-মার কথা। বোনের কথা। রিমার কথা। ও যেন খুব কৌতূহলের সঙ্গে শোনে। বিশেষ করে রিমার কথা।

আমাকে অবশ্য বেশি কিছু বলতে হয় না। ও আবার বলে ওঠে, জন আগে রক্তারক্তি খুব অপছন্দ করত। কিন্তু এখন ও এসব দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। সেদিন লিখেছে, বন্দুকের বেয়োনেট নাকি এক শত্রু সেনার পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে। আমি ভাবতেই পারি না যে ও এরকম হিংস্র হয়ে উঠতে পারে! যে একটা পোকাকেও মারে না, সে এরকম কাজ করতে পারে!

ও ফের বলে ওঠে —যুদ্ধ নাকি এখন খুব ভয়ানক হয়ে উঠেছে। রোজঅনেক সেনা মারা যাচ্ছে। দু-পক্ষেই। মাঝেমধ্যে যেন বোমাবৃষ্টি হয়। ওর ডাগ আউটও নাকি কদিন আগে ভেঙে গিয়েছিল। ওরা ফ্রন্টলাইন থেকে পিছিয়ে রিজার্ভ ট্রেঞ্চে চলে এসেছে। যখন হাওয়া দেয়, তখন বাতাসে ভেসে আসে বারুদের আর পচা মৃতদেহের গন্ধ।

আমি বলেছি, যুদ্ধ ছেড়ে চলে আসতে। আচ্ছা, বলো তো। ও তো ওর মেয়েকেই দেখেনি। একবার কি ফিরে আসতে পারে না!

গলায় যেন কাকুতি। কথা বলতে বলতে কান্নায় গলা বুজে আসে।

অবাক লাগে। আমাদের মধ্যে কত তফাত। বলতে গেলে কোনো মিলই নেই। কিন্তু তবু এ দূরত্ব কোথায় যেন মুছে যায়।

আমারও যেমন প্রতিমুহূর্তে মনে হয় রিমার কথা। জানি, সে-ও সব সময় আমার অপেক্ষায় থাকে। রোজ ফোনে কথা হলেও কবে যে আবার ওকে সামনাসামনি দেখব। কে জানে! মাঝেমধ্যে মনে হয়, এ জীবনে হয়তো আর দেখাই হবে না। আমি যেন এক দ্বীপে বন্দি হয়ে পড়ে আছি। ও আরেক দ্বীপে।

ইভা একদিন একটা চিঠি পড়ে শোনায়। জনের চিঠি।

''তোমরা সবাই ভালো আছ তো? মেরি কেমন আছে? কতটা বড়ো হল? কী কথা বলতে শিখেছে?

আমি এখানে একরকম আছি। আমার কথা চিন্তা কোরো না। এখানে দুপুরে রোজ 'কর্ন বিফ' টিনে খাই। আজ চিজ আর সিগার দিয়েছিল। মনে হয়, সামনে কোনো বড়ো হাঙ্গামা আছে। এটা আমাদের চাঙ্গা করার একটা উপায়। এখানে আমরা কয়েকজন মিলে মাঝেমধ্যে তাস খেলি। তোমার কয়েকটা ছবি এঁকেছি। খুব ভালো অবশ্য হয়নি। তোমার সেই মায়াবী চোখের চাহনি যেন কিছুতেই আঁকতে পারি না! পরে ভাবি, খারাপ আঁকা হতে পারে, কিন্তু তার মধ্যে তুমি তো আছ!

চিঠি পড়তে পড়তে ইভার গলা কান্নায় বুজে আসে।

বড়ো চিঠি। শুনে বুঝি এ চিঠিতে লেখা শব্দের আড়ালে আসল কথাগুলো শুধু না-লেখা শব্দ দিয়ে সাজানো। এ চিঠি শুধু প্রতীক্ষার আর ভালোবাসার। এসব চিঠির কাছে যুদ্ধের রং ফিকে হয়ে যায়।

ইভা ফের বলে ওঠে— ও অনেক দেরি করে উঠত। এখন সে অভ্যেস বদলে গেছে। সকাল সকাল উঠে পড়ে। রোজ নাকি পাঁচটায় উঠে পড়তে হয়। সকালের দিকে আর সন্ধের ঠিক আগে ওই দুটো সময়েই সব থেকে বেশি আক্রমণ হয়। খুব সাবধানি হতে হয় ওই সময়ে।

একদিন দেখলাম ও বেশ চিন্তিত। বেঞ্চিতে এসেই বলে উঠল, জন হাসপাতালে ভরতি হয়েছিল। এখন ছাড়া পেয়েছে। বোমা ফেটে ওর মাথা ছুঁয়ে একটা পেরেক চলে গিয়েছিল।

ভাগ্য ভালো, কোনোরকমে বেঁচে গেছে। আমি ওকে বলেছি আবার হাসপাতালে যেতে। ওখানে আরও কিছুদিন বিশ্রাম নিতে। আবার ট্রেঞ্চে ফেরার কী যে দরকার ছিল! যদি আবার এরকম হয়!

আমার দিকে তাকিয়ে ইভা ফের বলে ওঠে, আচ্ছা বন্ধু, বলো তো, ও সত্যি ফিরবে তো! আমি যে আর অপেক্ষা করতে পারছি না। মনে হচ্ছে, এভাবেই যেন অপেক্ষা করে আমার সারাজীবন কেটে যাবে।

আমি ভরসা দিই, যুদ্ধ শেষ হলেই চলে আসবে। এ যুদ্ধ তাড়াতাড়ি শেষ হবেই।

ওর মুখটা যেন সামান্য উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কষ্ট করে হেসে ওঠে।

তারপর আমরা দুজনেই চুপ করে বসে থাকি। দূরে যতদূর দেখি শুধুই অন্ধকার। তারারাও যেন এ অন্ধকারে মেঘের আড়ালে মুখ লুকোয়।

আবার কোনো একদিন আমার মনমরা ভাব দেখে জিজ্ঞেস করে ওঠে, তুমি আজ খুব চিন্তায় পড়েছ দেখছি।

—কী করে বুঝলে?

—এতদিন তোমায় দেখছি, আমি বুঝব না! আজ তুমি যেরকম অন্যমনস্ক আছ, যেভাবে শুধু 'হুঁ' 'হুঁ' করে উত্তর দিচ্ছ, তাতেই বুঝেছি। বাড়ির সবাই ঠিক আছে?

ঠিক ধরেছে। ফোনে গতকাল শুনলাম মা-র শরীর খুব খারাপ। নাকি স্টমাক ক্যান্সার বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। অনেক খরচ। আমি যে এর মধ্যে কীভাবে কবে ফিরব কে জানে! এতদিন বন্ধ থাকার পরে আবার ইউনিভার্সিটির ক্লাস চালু হয়েছে। এখন ফিরতেও পারব না। তা ছাড়া যাতায়াতেও অনেক খরচ। মা-কে যে কবে দেখতে পাব! মা আজ ফোনে কথা বলছিল না। জানি, কাঁদছিল। হয়তো ভাবছিল, আমাকে আর দেখতে পাবে না। আমাকে যেতেই হবে। খুব শিগগিরি। আরেকটা বড়ো সমস্যা দেখা দিচ্ছে। কবে অব্দি যে এ বাড়িতে থাকতে পারব, কে জানে! ভাড়া দেব কী করে!

কোভিড বা এসবের কথা ও বুঝবে না। শুধু ওর প্রশ্নের উত্তরে বলি, আমাকে শিগগিরি এ বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে। ভাড়া দিতে পারছি না।

ও শুনে হেসে ওঠে। —এই কথা! এ তো আমারই বাড়ি। তুমি চিন্তা কোরো না। এখান থেকে কেউ তোমাকে সরাতে পারবে না। তুমি এখানেই থাকবে।

বলে গভীরভাবে আমার চোখের দিকে তাকায়। নীল চোখ যেন অন্ধকারে জোনাকির মতো জ্বলে ওঠে। তারপর আবার কুয়াশায় হারিয়ে যায়।

কিছুদিন বাদে বাড়ি ছাড়ার নোটিশ আসে। আমি নিরুপায়। উত্তর দিই না। বাড়িভাড়া দেব কোথা থেকে! আবার চিঠি আসে। আবার।

তারপরে একদিন ওরা আসে। আমার রেন্টাল এজেন্সির এজেন্ট। জানি আমাকে আর ওরা থাকতে দেবে না।

কিন্তু তা বলে কি আর ওদের এড়িয়ে থাকা যায়! কিছুক্ষণ জানলায় উঁকিঝুঁকি মারার পরে দরজায় ধাক্কা দিতে শুরু করে।

আমি চুপচাপ ঘরের মধ্যে অপেক্ষা করি। অন্ধকারে। মুখ দেখানোর উপায় নেই। লজ্জায় মাথা নিচু করে বসে থাকি।

ওরা বার বার জোরে জোরে ধাক্কা দেয়। শেষে দরজার লক ভেঙে ঢোকে।

ঘরে ঢুকে ওরা আলো জ্বালায়। তারপরে আমাকে খাটের উপরে শুয়ে থাকতে দেখে যেন চমকে ওঠে। কাছে এসে দেখে। দেখে, আমার অসাড় দেহ পড়ে আছে। উত্তেজিত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

আমার আর ভাড়া লাগবে না এ বাড়িতে।

আমি এখন এখানকার চিরকালের অতিথি। ইভাও শুনেছিলাম, এ ঘরেই আত্মহত্যা করেছিল যুদ্ধে জনের মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার পরে।

বাইরে আজ বিকেলের আলো ঘন কালো একটা মেঘ এসে চুরি করেছে। খানিকক্ষণের মধ্যে টিপটিপ করে বৃষ্টি শুরু হল। সঙ্গে ঠান্ডা ঝোড়ো হাওয়া। আমি মাঠের সেই বেঞ্চিতে এসে বসি।

খানিক বাদেই আবার ইভার সঙ্গে দেখা হবে। আমরা আবার আমাদের যুদ্ধের গল্প একে অন্যকে শোনাব। একজন আরেকজনকে আশ্বস্ত করব, বলব, এ যুদ্ধ শেষ হবেই। তারপরে আবার চুপ করে বসে থাকব। প্রতীক্ষায়।

১৭ সেপ্টেম্বর ২০২০

কেনিলওয়ার্থ, ইংল্যান্ড

অচেনা মুখ

রাহুল
রাহুলের স্ত্রী শরণ্যা
আমার স্ত্রী গার্গী
আমার নাম ইন্দ্রনীল
রিনি রাহুলের মেয়ে
সুরজিৎ শরণ্যার প্রেমিক
প্রথম কেস—পল, মেরি
ডিটেকটিভ কনস্টেবল লিসা
জেসিকা
ডিটেকটিভ সার্জেন জেমস পারটন
দমদম ঘুঘুডাঙা থানা থেকে ও.সি. মোহিত সরকার
এইচ. আর. ম্যানেজার পিটার
এইচ. আর. ডিরেক্টর ম্যাথিউ

১

১০ ফেব্রুয়ারি ২০২০ রাত এগারোটা

তোর সঙ্গে একটু আলাদা কথা আছে। আজ রাতে এখানে থাকতে পারবি?—রাহুলের এই একটা প্রশ্নে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। পাঁচ ঘণ্টার আড্ডার পর ওর বাড়ি থেকে ঠিক বেরোনোর মুখে এই প্রশ্ন! একটু যেন দ্বিধা-জড়ানো গলায় আস্তে আস্তে বলে উঠল।

আমরা একে অন্যকে ঠিক কতটা জানি, সেটা নিয়েই আজকের আড্ডা ছিল।

পছন্দের খাওয়া থেকে শুরু করে পছন্দের জায়গা— কে অন্যের পছন্দ কতটা আন্দাজ করতে পারি— এসব নিয়ে চ্যালেঞ্জ। দেখা গেল আমি এসব ব্যাপারে সব থেকে খারাপ। সত্যি কথা বলতে কী, অন্যের মন বোঝা আমার কোনোদিনই ঠিকভাবে আসে না। এ যেন ঠিক আধুনিক কবিতার মতোই দুর্বোধ্য। আমি নেহাত কাঁচা এ ব্যাপারে।

রাহুলের বাড়ি আড্ডার খুব ভালো জায়গা। কলকাতার থেকে একটু দূরে মধ্যমগ্রামের কাছে প্রায় কুড়ি কাঠার উপরে বিশাল বাড়ি। বড়োরাস্তার থেকে খানিকটা দূরে। তাই শহরের কোলাহল এখানে যেন পৌঁছোয় না। বাগানে বসলে দু-একটা অচেনা পাখির ডাক মাঝেমধ্যে কানে আসে। আজ যেমন কিছু আগে একটা নীলকণ্ঠি লাল বসন্তবৌরি দেখলাম।

রাহুল খুব মিশুকে ছেলে। আড্ডা পছন্দ করে। শনিবার হলেই আমরা ওর বাড়িতে চলে আসি। সন্ধে থেকে রাত অব্দি আড্ডা চলে। নিখাদ আড্ডা। এ জিনিসটা এখনকার দিনে কাজের চাপে বেশ রেয়ার হয়ে উঠেছে। কীভাবে জানি না ফোনের থেকে চোখ সরাতেও ভুলে যাই। কিন্তু এখানে এলে ফোনের কথাই আড্ডার মাঝে ভুলে যাই। সে আড্ডায় সাহিত্য থেকে দেশ-বিদেশের অর্থনীতি থেকে রাজনীতি কোনোটাই বাকি থাকে না। অবশ্যই এর পিছনে একটা বড়ো কারণ রাহুলের পড়াশোনা ও সব বিষয়ে আগ্রহ।

কথায় কথায় এমন একটা প্রসঙ্গ তুলবে যে সেটা নিয়ে তখন আমরা আলোচনা-তর্কে সবাই মেতে উঠি। আজ যেমন আলোচনা হচ্ছিল ল্যাম্বটনের ভারতের সার্ভে ও ম্যাপ তৈরি করা নিয়ে। ল্যাম্বটন ত্রিকোণমিতির বিশেষ জ্যামিতিক শেপের মাধ্যমে নির্ভুলভাবে কোনো জায়গা মাপার ব্যবস্থা করেছিলেন। বহু বছর এর উপরে কাজ করার পরে ১৮২৩ সালে উনি মারা যান। এভাবেই প্রথম ভারতের ম্যাপ নির্ভুলভাবে করা হয়। সে প্রসঙ্গ থেকে ভারতকে একসঙ্গে জুড়ে একটা রাষ্ট্রের পরিচয় দেওয়ার ক্ষেত্রে ইংরেজদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা থেকে তর্কাতর্কি।

ওর মতো বন্ধুবৎসল ছেলে কমই হয়। যখন যা দরকার, একবার বললেই হল, ঠিক একটা ব্যবস্থা বার করে ফেলবে। একই সঙ্গে খুব প্রাণখোলা স্বভাবের। সবকিছু খুলে বলা যায়।

দেশ-বিদেশে আমিও যেমন নানা জায়গায় গেছি, একইভাবে ও নানান দেশে ঘুরে বেড়িয়েছে। অনেক সময় প্ল্যান করে গেছি যাতে বিদেশে একই জায়গায় থাকার সুযোগ হয়। আবার কখনোই বিদেশে দীর্ঘদিন থাকব বলে যাইনি। সেজন্য আমরা দুজনেই অন্য কোনো বিদেশি কোম্পানিতেও জয়েন করিনি।

এককথায় বলা যায়, ওকে আমার মতো ভালো কেউ চেনে না।



আজ আড্ডায় আমি, সুদীপ, রজত, পার্থ এসেছিলাম। অন্যদিন আমার সঙ্গে গার্গী আসে। গার্গী আমার স্ত্রী। আজ আসতে পারেনি। ছেলের পরীক্ষা চলছে। সেজন্য বাড়িতে এখন যুদ্ধের পরিস্থিতি। সে যুদ্ধ ছেড়ে সেনাপতি তো আর কোথাও যেতে পারে না। আমার মতো ছোটোখাটো সৈনিক অবশ্যই আসতে পারে।

পার্থ অবিবাহিত। সুদীপ, রজত ফ্যামিলি নিয়ে এসেছিল। কোথায় একসঙ্গে বেড়াতে যাওয়া যেতে পারে তা নিয়েও কিছুক্ষণ আলোচনা হল। এখনও তেমন গরম পড়েনি। এটাই এখন বেড়াতে যাওয়ার ভালো সময়।

কদিন বাদে পার্থ কানাডা যাবে। অন্তত এক বছরের জন্য। সে বিষয়েও কথা হল। আমি একসময় প্রায় দেড় বছর ছিলাম টরন্টোতে। বিভিন্ন অভিজ্ঞতা শেয়ার করছিলাম। এমনকী তুষারঝড়ে আটকে পড়ার আজব অভিজ্ঞতা একবার হয়েছিল।

রাহুল একা থাকে। গত এক বছর ধরে শরণ্যার সঙ্গে ওর ডিভোর্সের মামলা চলছে। এক বছর আগে যখন প্রথম খবর পাই যে ও আর শরণ্যা আলাদা হয়ে যাচ্ছে, তখন খবরটা শুনে খুব অবাক হয়েছিলাম। বেশ খারাপও লেগেছিল। ওদের বিয়ের আঠেরো বছরের মাথায় হঠাৎ করে এভাবে দুজনের পথ আলাদা হয়ে যাবে ভাবতে পারিনি। অনেক দিক দিয়ে বলা যায় ওরা ছিল আইডিয়াল কাপল। কী জন্য যে সম্পর্কটা ভাঙল, সেটা এখনও বুঝতে পারিনি।

এ ব্যাপারে রাহুল বিশেষ কথা বলতে চায় না। আমাকেও না।

আমি শরণ্যার সঙ্গে দেখা করে সে সময় কথা বলেছিলাম। শরণ্যার প্রতিক্রিয়ায় খানিকটা অবাকও হয়েছিলাম। ও যেন কিছু একটা বলতে গিয়েও বলতে চায়নি।

শুধু যে ছাড়াছাড়ি হয়েছে তা নয়, দুজনের মধ্যে যে যথেষ্ট তিক্ততা তৈরি হয়েছে, তা বুঝতে পারি। সে তিক্ততা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কমেনি, আরও বেড়েছে। অতীত সম্পর্কের কোনো চিহ্ন ওরা পুরোনো খাতার ছেঁড়া পাতার মতো সঙ্গে রাখতে চায় না।

আড্ডা দিয়ে তারপরে রাতের খাবার খেয়ে উঠতে রাত দশটা বেজে গেল। আমি থাকি লেক গার্ডেনসে। এখন যেতে অন্তত দেড় ঘণ্টার মতো সময় লেগে যাবে। গল্প করতে করতে যে এতটা রাত হয়ে গেছে, খেয়াল করিনি।

বেরোতে যাব, এমন সময় রাহুল আমার কাছে এগিয়ে এসে আস্তে আস্তে বলে উঠল। তখনই ওই কথাটা বলে উঠল, তোর সঙ্গে একটু আলাদা কথা আছে। আজ রাতে এখানে থাকতে পারবি?

এরকম প্রস্তাবে বেশ অবাকই হলাম। তা ছাড়া ও যেভাবে সাধারণত কথা বলে, সেভাবেও বলেনি। যেন কী একটা দ্বিধা-শঙ্কা মিশে আছে গলার স্বরে।

আগে বলেনি। এখন হঠাৎ করে বাড়ি না ফিরলে গার্গী মারাত্মকরকম খেপে যাবে।

—না রে, আজ থাকা যাবে না। গার্গী এমনিতে খেপে আছে। ছেলের পরীক্ষা নিয়ে সাংঘাতিক বাড়াবাড়ি শুরু করেছে। তার মধ্যে আমি আবার বাড়ি যদি না যাই। জাস্ট কুরুক্ষেত্র হয়ে যাবে! আর্জেন্ট কিছু?

ও কিছু কথা না বলে সম্মতিসূচক মাথা ঝাঁকাল। বলে উঠল,—হ্যাঁ, আর্জেন্ট। থাকলে খুব ভালো হত।

বুঝলাম, থাকতেই হবে। ও অহেতুক জোর খাটানোর ছেলে নয়। সত্যিকারের কিছু জরুরি কাজ না হলে ও এটা বলত না।

ঠিক করলাম, রাতে না গিয়ে ওর বাড়িতেই থেকে যাব। কাল সকালেই না হয় ফেরা যাবে। বাড়িতে জানিয়ে দিলাম।

উলটোদিক থেকে যতটুকু কথা হওয়ার ছিল, তার থেকেও কম কথা হল। গার্গী গম্ভীর থমথমে গলায় বলে উঠল, 'সে তোমার ব্যাপার।' বুঝতে পারলাম, কাল ফিরে কালবৈশাখীর সামনাসামনি পড়তে হবে।

সবাই বেরিয়ে যাওয়ার পরে আবার আমি আর রাহুল ড্রয়িং রুমে এসে বসলাম।

ও দেখি, চুপ করে বসে আছে। রাহুল খুব আমুদে হলেও মাঝেমধ্যে ওকে খুব অন্যরকম লাগে। মনে হয় তখন যেন ওকে বুঝতে সময় লাগে। দাবার মিডল গেমে যেমন খুব পাকা দাবাড়ুর কৌশল বোঝা যায় না, ও তখন ঠিক তেমনই।

কিছুক্ষণ একটু উসখুস করে বলে উঠল, একটু স্কচ চলবে?— বুঝলাম, কিছু কথা বলতে ও দ্বিধা করছে। এমনিতেও আমি আর ও দুজনেই ড্রিঙ্ক করি না।

—এত রাতে?

—আরে, কাল তো অফিস নেই। সামান্য। —বলে ওই দুই গ্লাস রেডি করে একটা আমার সামনে দিয়ে বলল, একটা খবর আছে। কীভাবে বলব, জানি না। শরণ্যাকে গতকাল থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। —বলে চুপ করে থাকল।

ওর চোখে কিন্তু তেমন কোনো টেনশনের অনুভূতি ধরা পড়ল না। অবশ্য সেটাই স্বাভাবিক। ওদের সম্পর্ক শেষের দিকে যেভাবে খারাপের দিকে গিয়েছিল, তাতে ওর বিশেষ আবেগ না-থাকাই স্বাভাবিক।

—বলিস কী? কী করে জানলি?

—পুলিশ থেকে ফোন করেছিল। আমার সঙ্গে রিসেন্টলি দেখা হয়েছে কি না, জানতে চাইছিল।

—কী বললি?

—যেটা সত্যি, সেটাই বললাম। ওদের সামনে কথা লুকিয়ে লাভ কী? প্রায় কুড়ি দিন আগে রিনিকে দেখতে গিয়েছিলাম। বর্ধমানে। তখনই দু-তিন মিনিট ওর সঙ্গে কথা হয়েছিল। ব্যাস।

—কিন্তু, কী হতে পারে?

—সেটাই তো ভাবছি। কোথায় যেতে পারে?

—তুই বলেছিলি যে ওর সঙ্গে এখন অন্য একটা ছেলের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ছেলেটা নাকি ব্যাংঙ্কে কাজ করে। তার কথা পুলিশকে বলেছিস?

ওর মুখেই প্রথম শুনেছিলাম যে শরণ্যা নাকি এক অন্য একজনের প্রেমে পড়েছে। তার সঙ্গে নাকি বিয়ের আগে থেকেই যোগাযোগ ছিল। সেটাই হয়তো এ ডিভোর্সের মূলে। যদিও

রাহুল সেটা কখনো স্পষ্ট করে বলেনি।

—না জেনে আরেকজনকে বিপদে ফেলার তো মানে হয় না। যেটুকু জানি, সেটুকুই বলেছি।

মনে মনে সত্যি ভালো লাগল। এটাই রাহুলের আসল পরিচয়। খুব ভদ্র ছেলে। যাকে পছন্দ করে না, তার সম্বন্ধেও একটা অদ্ভুত নিরপেক্ষতা বজায় রেখে সত্যি কথা বলার ক্ষমতা রাখে।

কথার মধ্যে হঠাৎ মাসিমা, মানে রাহুলের মা ঘরে এসেছেন। উনি উপরের ঘরে ছিলেন। বন্ধুদের মধ্যে আড্ডা হচ্ছে জেনে উনি আগে নীচে আসেননি। তবে আমাকে উনি ছেলের মতোই দেখেন। তাই নিশ্চয়ই শুধু আমার গলা পেয়ে এসেছেন। আমাদের কথা একটু থামল। উনি এখনও শরণ্যার নিখোঁজ হওয়ার খবরটা জানেন কি না জানি না।

রাহুল হঠাৎ করে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল।

মা-কে উদ্দেশ, করে বলে উঠল, ইন্দ্রনীলকে আজ থাকতে রাজি করিয়েছি, মা। ওকে আটকে দিলাম। আজও এখানে থাকবে।

খুব ভালো করেছিস।—বলে মাসিমা আমাকে লক্ষ করে বলে উঠলেন, গার্গী ভালো আছে তো? অনেকদিন ওকে দেখিনি।

—হ্যাঁ, ভালো আছে। অনেকদিন মানে? এই তো চার সপ্তাহ আগে এসেছিল এখানে। ছেলের পরীক্ষা নিয়ে খুব ব্যস্ত আছে। এখন ছোটোবেলা থেকেই পড়াশোনার টেনশন। আমার থেকে ও-ই বেশি সব সময় টেনশন করে।

—কোন ক্লাস হল তোমার ছেলের?

—ক্লাস ফোর।

মাসিমা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন,দেখতে দেখতে বড়ো হয়ে যাচ্ছে। পরে একদিন নিয়ে এসো। আমার তো আর নাতনির সঙ্গে ইচ্ছেমতো দেখা করার উপায় নেই।—বলে একটু থেমে ফের বলে উঠলেন, যাও, তোমরা গল্প করো। আমি যাই। রাত হয়ে গেছে। কাল সকালে কথা হবে।

বুঝতে পারলাম, উনি এই শরণ্যার ব্যাপারটা জানেন না এখনও।

রাহুলের বাবা মারা গেছেন প্রায় কুড়ি বছর হল। মাসিমা ধর্মকর্ম নিয়েই বেশি থাকেন। শরণ্যার সঙ্গে রাহুলের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়ার পরে আরও কেমন যেন আড়ালে সরে গেছেন।

বউ-শাশুড়ির মধ্যে খুব ভালোই সদ্ভাব ছিল। মেয়ের মতো দেখতেন। শরণ্যার মধ্যে একটা ছেলেমানুষি ছিল। তার জন্য সবাইকে খুব তাড়াতাড়ি আপন করে নিতে পারত। এই

ডিভোর্সটাকে মাসিমা এখনও তাই ঠিক মন থেকে মেনে নিতে পারেননি।

মাসিমা চলে যাওয়ার পরে আবার আমরা কথায় ফিরে এলাম।

—তা ঠিক কখন থেকে পাওয়া যাচ্ছে না?

—গতকাল রাত আটটা নাগাদ বাজার করতে বেরোয়। ওদের বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে দমদম স্টেশনে। তারপর থেকেই খবর পাওয়া যাচ্ছে না।

—সঙ্গে কোনো ফোন ছিল না?

—শুনেছি, ছিল না। বাড়িতে নাকি ফোন রেখে গিয়েছিল। আমিও একবার ওর নাম্বারে ফোন করেছিলাম। বলছে সুইচড অফ। দেখ, আমার সঙ্গে যা করেছে, তাতে আমি এ বিষয়ে নিজে থেকে বেশী কিছু করতে চাইছি না। তবে রিনিকে নিয়ে চিন্তায় আছি। একা বাড়িতে আছে দিদিমার সঙ্গে। কিন্তু বুঝতেই পারছিস, এখন হঠাৎ করে ওকে নিয়ে আসা যাবে না। কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।

সত্যি গত এক বছরে যা হয়েছে, তাতে রাহুলের পক্ষে আগ বাড়িয়ে কিছু করাটাই অস্বাভাবিক। অথচ ওদের দুজনের মধ্যে সব সময়ে কী সুন্দর সম্পর্ক ছিল। শরণ্যা সব সময় সুযোগ পেলেই রাহুলের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করত। অবশ্য তার পিছনে বেশ কিছু কারণও ছিল। রাহুল খুব কেয়ারিং। সব ছোটোখাটো বিষয়েও খেয়াল রাখত।

কিন্তু এক বছর আগে যখন হঠাৎ শুনলাম যে শরণ্যা ঠিক করেছে, ও আর রাহুলের সঙ্গে থাকবে না, রিনিকে নিয়ে বেরিয়ে যাবে, সত্যি খুব অবাক হয়েছিলাম। যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত। বিশ্বাসই করতে পারিনি। পরে শুনেছিলাম যে এর পিছনে ওই ছেলেটার হাত ছিল।

—আচ্ছা, ওই ছেলেটার নাম যেন কী ছিল?

রাহুল স্কচে একবার আলতো চুমুক দিল। তারপর গভীর চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, কী হবে তা দিয়ে?

—সবার আগে তো তার সঙ্গেই যোগাযোগ করে দেখা উচিত।

চুপ করে বসে রইল রাহুল। খানিক বাদে বলে উঠল, সুরজিৎ।

—তা এখনও নিশ্চয়ই যোগাযোগ ছিল!

—দেখ, এসব নিশ্চয়ই পুলিশ দেখবে। ওর আর সুরজিতের তো বিয়ের কথা হচ্ছিল। দিনক্ষণও দেখা হচ্ছিল শুনেছি।

কথা বলতে গিয়ে থেমে গেলাম। রাহুল অন্যদিকে তাকিয়ে আছে। বুঝতে পারছি এটা ওর কাছে কতটা বেদনার। আসলে রাহুল শরণ্যাকে যথেষ্ট ভালোবাসত। সেটা আমি দেখেছি। দুজনেরই কম বয়সে বিয়ে। তারপরে আঠেরো বছর একসঙ্গে কাটিয়েছে, দেশ-বিদেশ

একসঙ্গে ঘুরেছে। তারপরে হঠাৎ করে সুতো কেটে গেছে। পথ বদলে গেছে। ডিভোর্স তো অনেকই হয়। কিন্তু ওদের ক্ষেত্রে দুজনের মধ্যে যেভাবে তিক্ততা হঠাৎ করে গড়ে উঠেছিল, তা সচরাচর দেখা যায় না।

—একটু দাবা খেলবি?

বুঝতে পারছিলাম, ও মনটাকে অন্যদিকে ঘোরাতে চাইছে।

আমরা দুজনে এখনও সময় পেলেই দাবা খেলি। একটা সময় আমি ইউনিভার্সিটি চ্যাম্পিয়ন ছিলাম। কিন্তু রাহুলও খুব ভালো খেলে। এখন মাঝেমধ্যে ওর কাছে হারি। ও মেন্সার মেম্বার। মেন্সার মেম্বার হওয়া খুব সহজ নয়। খুব হাই আই. কিউ. ছাড়া মেন্সার মেম্বার হওয়া সম্ভব নয়। ওর ইন্টেলিজেন্স সাধারণের থেকে অনেক বেশি।

সেজন্য ওর সঙ্গে খেলাটা বেশ উপভোগ করি। আজও সেটাও হল। একটা দীর্ঘ এন্ড গেমের পরে আমি যখন জিতলাম, তখন পাশে ব্লু লেবেল স্কচের এর বোতল প্রায় খালি হয়ে গেছে। রাত একটা। এবারে শুয়ে পড়তে হবে।

রাহুল যেন শুধু একবার বলে উঠল, শরণ্যা উধাও। সুরজিতের ভাগ্যে কী আছে, কে জানে!

কেন বলল, বুঝলাম না। বুঝলাম, নেশাটা ভালোই হয়েছে।

২

নীচে একতলায় ড্রয়িং রুমের পাশেই ওর পড়ার ঘর। সেটা বেশ বড়ো ঘর। একধারে বেশ বড়ো একটা খাট আছে। ওই ঘরটা আমার পছন্দ। যখনই এখানে থাকি, এই ঘরেই থাকি। আজও সেখানে শুয়ে পড়লাম।

রাহুল উপরে ওর শোয়ার ঘরে শুতে গেল।

কেন জানি না, মনটা খুব বিক্ষিপ্ত হয়ে ছিল। বাইরে জোর বৃষ্টি হচ্ছে। কলকাতার বৃষ্টি আমি বেশ উপভোগ করি। রূপকথার মতো যেন জানলার কাচের উপরে প্রেমিকার নিশ্বাস এসে পড়ছে। সঙ্গে বজ্রপাত। ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি হচ্ছে। বাড়ির পাশে বেশ খানিকটা জমি আছে। সেখানে রাহুল একটা ফুলের বাগান করেছে। বেশ কয়েকটা আম গাছ আছে। পড়ার ঘরের জানলা দিয়ে বাগানটা দেখা যায়। পড়ার ঘরের সঙ্গে একটা বারান্দা আছে। অন্যদিকের দরজা খুলে বারান্দায় যাওয়া যায়। কিন্তু বাইরে যেভাবে বৃষ্টি হচ্ছে, তাতে এখন সে দরজা খোলা সম্ভব নয়।

ঘুম আসছিল না। পড়ার ঘরের একদিকে সার দিয়ে বইয়ের আলমারি। এ ঘরটা আমার এজন্যই পছন্দ। বই বার করে করে দেখতে লাগলাম। এখনকার লেখকদেরও অনেক বই

আছে। একধার দিয়ে স্টিফেন কিং, জেফ্রি আর্চার, খালেদ হোসেনি যেমন আছে, তেমনই আছে বুদ্ধদেব গুহ, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, অনীশ দেবের লেখা। আমার মতো ওর এখনও সেই গল্পের বই পড়ার অভ্যেসটা ভালোই আছে।

বইয়ের আলমারির নীচের তাকটা সাধারণত তালাবন্ধ থাকে। কেন থাকে তা জানি না। হয়তো ওর কিছু দরকারি কাগজ আছে। আজ দেখলাম সেখানে তালায় চাবি লাগানো। হয়তো চাবিটা সরাতে ভুলে গেছে। একটু কৌতূহল হল। কী যেন মনে হল। চাবি ঘুরিয়ে নীচের তাকটা খুললাম।

নাহ, বই না। অ্যালবাম। বেশ কিছু ফোটো অ্যালবাম রাখা। ডিজিটাল যুগের আগে ক্যামেরায় তোলা সব ছবি প্রিন্ট করে এভাবেই অ্যালবামে রাখা থাকত। কত যত্ন নেওয়া হত প্রত্যেকটা ছবির পিছনে। ওর সঙ্গে অনেক দেশে গেছি। কিছু ছবিতে আমিও হয়তো থাকব। দেখার আগ্রহ বাড়ল।

তা ছাড়া আমাদের মধ্যে যেরকম সম্পর্ক, তাতে এসব ব্যাপারে পারমিশনের প্রশ্নটাও থাকে না।

বেশ কয়েকটা ওর বিয়ের অ্যালবাম। বিয়ের অজস্র ছবি। একটা অ্যালবামে ইংল্যান্ডের ছবি। কত সহজে অতীত হারিয়ে যায়। বেশ কিছু ছবিতে আমিও আছি। অনেক কথা মনে পড়ে গেল।

আমেরিকার বেশ কিছু জায়গার ছবি দেখলাম। সেখানেও আমি আছি। বেশ কিছু ছবিতে আমি আর গার্গীও আছি। বিভোর হয়ে দেখছিলাম। সময়ের খেয়াল ছিল না। যেন সেই সময়ে হারিয়ে গিয়েছিলাম। তাকটা বন্ধ করব ভাবছি, হঠাৎ পিছনের একটা ছোটো কালো অ্যালবামে চোখ পড়ল। যেন লুকিয়ে রাখা আছে।

অন্যগুলোর পিছনে আলাদা করে এটা লুকিয়ে রাখার কারণ কী! ওতে হয়তোওদের খুব পার্সোনাল ছবি আছে। এটা নিয়ে পরে মজা করা যাবে। কী যেন মনে হতে ওটা বার করলাম। বিদেশের নানান জায়গার ছবি মেশানো। ওই অ্যালবামের মধ্যে একটা খামে আলাদা কিছু ছবি আছে। খামটা খুলতে গিয়ে ছবিগুলো আমার অসাবধানতার জন্য মার্বেলের মেঝের উপরে এসে পড়ল।

কি কিন্তু এ ছবিগুলো কোথা থেকে এল? এ কাদের ছবি? খবরের কাগজ থেকে কাটা কিছু ছবিও এর মধ্যে আছে। এত যত্ন করে রাখা কেন!

পরমুহূর্তে আমার হার্টবিট যেন বেড়ে গেল।

এসব ছবি এখানে কেন রাখা? শুধু শখ! নাকি বিশেষ সংগ্রহ?

প্রত্যেকটা ছবির উপর আবার পেনসিলে একটা ছোটো সিম্বল আঁকা। কী জন্য আঁকা? ছবিগুলোর মধ্যে কিছু ছবি আমার চেনা। তাদের কেউই আজ জীবিত নয়। শুধু তা-ই নয়, তাদের কারো মৃত্যুই স্বাভাবিক নয়।

বুঝতে পারলাম, আমি নিজের চোখকে, নিজের মনকে বিশ্বাস করতে পারছি না। বিশেষ করে ওই ছবিগুলোর পিছনের গল্পগুলো যখন মনে পড়ছে।

বাইরে বৃষ্টি ঝমঝমিয়ে পড়ছে। এর মধ্যে যদি দরজার বাইরে কেউ চলে আসে, পায়ের শব্দ পাব না। খামে ছবিগুলো রেখে, আবার ঠিক যেভাবে অ্যালবামের মধ্যে খামটা ছিল, ঠিক সেভাবে রেখে বন্ধ করে দিলাম।

মনে হল, কয়েক মিনিটের মধ্যে সেই রাহুল, যাকে আমি ভাবতাম, আমার থেকে ভালো আর কেউ চেনে না, সে আমার কাছে সম্পূর্ণ অচেনা হয়ে উঠেছে।

ওদের মৃত্যুর সঙ্গে রাহুলের কি কোনো সম্পর্ক আছে?

৩

এক বছর আগে

১৮ মার্চ ২০১৯, দুপুর দুটো, সল্ট লেক

আমার উলটো দিকে শরণ্যা বসে আছে। সল্ট লেকের সেক্টর ফাইভের একটা ক্যাফেতে আমরা বসে আছি। এর আগেও আমরা কয়েকবার এখানে এসেছি। তবে তখন সঙ্গে রাহুল ছিল। এখন শরণ্যা একাই।

কয়েকদিন আগে খবরটা রাহুলের মুখে শুনে বিশ্বাস করতে পারিনি। আঠেরো বছর বিয়ের পরে হঠাৎ করে বিবাহবিচ্ছেদ। সেটা এখনকার সময়ে খুব অস্বাভাবিক নয়, তাও জানি।

কিন্তু তা বলে রাহুল আর শরণ্যা? ভাবতেই পারছি না। এত সুন্দর সম্পর্ক পারস্পরিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং খুব কম দম্পতির মধ্যে আজকাল দেখেছি। দুজনেই দুজনের খেয়াল রাখত সব সময়। মনে হত, দুজনে একে অপরকে ছাড়া এক মুহূর্ত থাকতে পারে না। অফিসে রাহুলের টিফিন দেখে আমি হাসতাম। শরণ্যা এত সুন্দর করে গুছিয়ে দিত, মনে হত যেন সেই স্কুলের দিনেই রাহুল পড়ে আছে।

এত বছরে রাহুল কখনো শরণ্যাকে ছেড়ে এক সপ্তাহের বেশি থাকেনি। এ নিয়ে মজাও করতাম। বুঝতে পারি, দুজনের মধ্যে একটা গভীর আকর্ষণ এখনও আছে। একটা নতুন বইয়ের গন্ধের মতো ওদের প্রেম এখনও টাটকা। এমন একটা সহজ সুন্দর সম্পর্ক ছিল দুজনের মধ্যে যে দেখলেই ভালো লাগত।

শরণ্যার বিয়ে হয়েছিল খুব কম বয়সে। ১৮ বছর বয়সে, যখন ও ইঞ্জিনিয়ারিং-এ সবে চান্স পেয়েছে। তখনই বিয়ে হয়ে যায়। এটা খুব কমই হয়। বিশেষ করে ইঞ্জিনিয়ারিং-এর স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে। এর পিছনে অবশ্য একটা কারণ ছিল।

শরণ্যা মামাবাড়িতে ওর দিদিমার কাছে মানুষ। ওর যখন পাঁচ বছর বয়স, তখন মা মারা যায়। কীভাবে ঠিক জানি না। তারপর থেকে মামাবাড়িতে দিদিমার কাছে মানুষ। শুনেছি, মামা খুব ভালোবাসলেও, মামি শরণ্যাকে বিশেষ পছন্দ করত না। সেই মামিও নাকি মারা যায়। দিদিমারও বয়স হয়েছিল। ইচ্ছে ছিল শরণ্যার বিয়ে দেখে যাবে, যাতে পরে কোনো অসুবিধেয় না পড়তে হয় শরণ্যাকে। সেজন্যই এত তাড়াতাড়ি বিয়ে হয়।

শরণ্যার ছোটোবেলা নিশ্চয়ই তেমন সুখের হয়নি। সেখান থেকে বেরিয়ে এসে বিয়ে, এত সুখের সংসার। সেসব অস্বীকার করে ও এখন এরকম অনিশ্চিত এই জীবন খুঁজে নিচ্ছে কেন, কে জানে!

রাহুল ওর থেকে পাঁচ বছরের বড়ো। যখন বিয়ে হয়, তখন ও আমার সঙ্গে সবে চাকরিতে ঢুকেছে। তাই এসবই আমার চোখের সামনে দেখা। ওর বিয়েতেও গিয়েছি। বিয়ের প্রত্যেকটা ঘটনা মনে আছে। সেজন্য এ ঘটনা আমার কাছেও খুব বেদনার।

শরণ্যা ওয়াশরুম থেকে ঘুরে এসে আমার সামনে বসল। শরণ্যাকে উল্লেখ করে বলে উঠলাম, তুমি কী নেবে?

—না, না, আমি কিছু নেব না। আমার কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না।

—তা বললে হয়? তুমি তো ক্যাপুচিনো খাও, বলে দিচ্ছি।

নীরবে সায় দিল শরণ্যা।

অর্ডার দিয়ে ফিরে এসে টেবিলে বসলাম।

দেখলাম, শরণ্যা ওর উজ্বল চোখটকে রোদচশমার আড়ালে লুকিয়েছে। হয়তো ওর চোখের জল ও দেখাতে চায় না। ওর বয়স চল্লিশের কাছে হতে চলল। কিন্তু এখনও ওকে যথেষ্ট আকর্ষণীয় দেখতে। অনেক নামী নায়িকা বা মডেলের থেকে ওকে এখনও দেখতে ভালো। একটা অতি সাধারণ সালোয়ার-কামিজ পরা সত্ত্বেও এখানে যারাই ঢুকছে, তাদের মুগ্ধ দৃষ্টি একবার ওর দিকে ঘুরে যাচ্ছে, সেটা বুঝতে পারছি। মুখে আজ বিষণ্ণতা, যদিও ঠোঁটের লাল লিপস্টিক চোখ এড়াল না।

রাহুলকে অনেকবার জিজ্ঞেস করার পরে ও বলেছিল যে শরণ্যার সঙ্গে নাকি কোন এক ছেলের রিসেন্টলি সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। সেজন্য এই বিচ্ছেদ।

শরণ্যাকে দেখে যে কেউ প্রেমে পড়বে। শুধু সৌন্দর্য নয়, একটা অদ্ভুত আকর্ষণ আছে, যেটা খুব সুন্দরী মহিলাদের মধ্যেও অনেক সময় থাকে না। ওর স্বভাবের উষ্ণতা এই আকর্ষণকে আরও বাড়িয়ে দেয়। যে কাউকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করবে। তা সে ছেলেটাকে শুধু দোষ দিতে পারি না। কিন্তু ওর দিক থেকে এটা কী করে ও হতে দিল? তাও আবার জীবনের এরকম এক প্রান্তে এসে, যেখানে তার প্রভাব ওদের মেয়ের উপরেও পড়বে!

আমার এ প্রসঙ্গটা তুলতে খারাপ লাগছিল। যদিও ফোনে বলেছিলাম যে ওর সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলতে চাই। ও-ই বলেছিল যে ফোনে কথা বলবে না। আমার সঙ্গে এখানে দেখা করতে পারে। আমি ভেবেছিলাম, আমার এই দৌত্যে যদি এই ভাঙা সম্পর্ক আবার জোড়া লাগানো যায়।

খানিকক্ষণের অস্বস্তিকর নীরবতা ভেঙে বলে উঠলাম,—এরকম কেন হল, শরণ্যা? তোমাদের এত সুখী সংসার? তোমরা দুজন দুজনকে ছেড়ে এক মুহূর্তও থাকতে পারবে বলে মনে হয় না। কেন এ সংসার ভাঙছ?

—আমি এ সম্পর্ক ভাঙছি, কে বলল?— ওর চোখ যেন জ্বলে উঠল মুহূর্তের জন্য। একটু থেমে ফের বলে উঠল, আমার আর কোনো উপায় ছিল না। ও তো তোমার খুব বন্ধু। কিন্তু তোমার বন্ধুকে তুমি কতটা জানো?

—খুব ভালো করে জানি। একজন সব থেকে প্রিয় বন্ধুর পক্ষে যতটা জানা সম্ভব। ওর মতো ছেলে খুব কমই হয়।

শরণ্যা চোখের রোদচশমাটা খুলে নিল। পাশে টেবিলের উপরে রেখে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, আমিও তা-ই ভাবতাম। ভুল ভাবতাম। ওকে আমি এখনও চিনি না। তুমিও না।

—মানে? ওর দিক থেকে কোনো মেয়ের সঙ্গে প্রেম?

—না, না, সেরকম কিছু নয়। একটু থেমে বলে উঠল, ধরো, তুমি হঠাৎ করে একজনের সম্বন্ধে এমন কিছু জানলে যাতে তার সম্বন্ধে তোমার সবরকম বিশ্বাস-ধারণা মুহূর্তে ভেঙে গুড়িয়ে গেল। তারপরে কি আর তার সঙ্গে থাকা যায়? সম্পর্ক দাঁড়িয়ে থাকে একটা বিশ্বাসের উপরে। সে বিশ্বাসেই যখন ধাক্কা লাগে।

—সে আবার কীরকম?

—তোমাকে আমি সেটা বলতে পারব না। তবে এটুকু বলতে পারি, দোষটা আমার দিক থেকে নয়।

—মানে তুমি বলতে চাও, তোমার আর সুরজিতের মধ্যে কোনো সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি?

—আমি সেটা বলিনি। আমি সুরজিৎকে অনেক বছর ধরেই চিনি। কিন্তু সেটার জন্য কিছু ভাঙেনি। বলা যায়, ভাঙার পরেই সে আশ্রয় আমি খুঁজে নিয়েছি। যেরকম স্রোতে ভেসে-যাওয়া মানুষ ভাঙা গাছের ডালপালা বা কিছু একটা ধরে ভেসে থাকতে চায়, সেরকমই ধরো — বলে ও চুপ করে রইল।

খেয়াল করলাম, ওর চোখের নীচটা সামান্য ফুলে গেছে। বুঝতে পারলাম, এ নিয়ে ও সমানে কান্নাকাটি করছে।

—কিন্তু কোনোভাবে কি রাহুলের সঙ্গে থাকা সম্ভব নয়? অনেক সময়ে তাড়াহুড়োয় ভুল ডিসিশন হয়। সময় দিলে সেটা ঠিক করে নেওয়া যায়। তোমাদের মেয়ের কথা ভেবে দেখেছ?

ওর মায়াবী চোখ যেন ফের এক মুহূর্তের জন্য জ্বলে উঠল। শুধু বলে উঠল,না, এখন আর সেটা কোনোভাবে সম্ভব নয়। কিছু জিনিস একবার ভাঙার পরে আর জোড়া যায় না।

এরপরে আর বেশি কিছু কথা বলা যায় না। আমরা ক্যাপুচিনোয় চুমুক দিতে দিতে খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থাকলাম। তারপরে অন্য আলোচনায় চলে গেলাম।

ও শুধু শেষে বলে উঠল, আমি তোমার নাম্বার রেখে দেব। দরকার হলে ফোন করব। অনেক সময় কাছে থেকেও মানুষ চেনা যায় না। আবার অনেক দূরে থেকেও মানুষ চেনা যায়। তোমাকে আমি এখনও বিশ্বাস করি। তুমি চিরকাল আমার বন্ধুই থাকবে।

৪

১৬ জুন ১৯৯৭, ডেনভার, কলোরাডো

—রাহুল বাড়িতে আছে?

—হ্যাঁ, এত সকালে কোথায় যাবে? —দরজা খুলে শরণ্যা বলে ওঠে,রোববার ঘুম থেকে উঠতে উঠতে ওর এগারোটা বেজে যায়। রাত অব্দি টিভি-তে কী সব প্রোগ্রাম দেখে। সকালে ওঠানোই যায় না।

দেখেই বোঝা যায়, শরণ্যা বেশ খানিকক্ষণ উঠে গেছে। গায়ে একটা হলুদ ড্রেস। পরিপাটি সাজ। লিপস্টিক, চোখে কাজল। শরণ্যাকে শুধু দেখতে যে ভালো তা-ই নয়, কী পরলে ওকে ভালো মানায়, সে সম্বন্ধে ওর খুব ভালো ধারণা আছে। বাড়ির বাইরে শুধু নয়, বাড়িতেও সব সময় পরিপাটি থাকে।

ওকে আমি বিয়ের পর থেকে এত বছর দেখছি। সেই একই রকম। আর রাহুল?

রাহুলের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বটা প্রায় প্রাগৈতিহাসিক। দু-এক বছরের নয়। একই সঙ্গে আমরা এক আই. টি. কোম্পানিতে জয়েন করি। যে সময়ে জয়েন করি, সে সময়টাকে বলা যায় আই. টি. জগতের হামাগুড়ির সময়। কর্মীসংখ্যা তখন খুব কমই ছিল। আমার আর রাহুলের

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আলাদা ছিল। তবে আগে থেকেই চিনতাম। ও ছিল আমাদের ব্যাচের জয়েন্টে প্রথম। আমি ছিলাম তৃতীয়। উচ্চমাধ্যমিকেও দুজনেরই প্রথম দশের মধ্যে র‍্যাঙ্ক ছিল।

পড়তাম পাশাপাশি উত্তর কলকাতার খুব নামকরা দুই স্কুলে। অনেক প্রতিযোগিতায় একদম শেষ পর্যায়ে ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। সেজন্য মুখ চেনা ছিল। নাম জানতাম। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও একটা অঘোষিত প্রতিযোগিতা আমাদের মধ্যে অবশ্যই ছিল।

কিন্তু চাকরির আগে কখনো ভালো করে পরিচয় ছিল না। চাকরিতে এসে সে সুযোগ হল। একই ব্যাচে ওই সংস্থায় জয়েন করি। একটা নতুন অপারেটিং সিস্টেম তৈরি করতে হবে। কাজটা সহজ ছিল না। দিনরাত জেগে একসঙ্গে কাজ করেছি। সেই তবে থেকে বন্ধুত্ব। কেন জানি না খুব সহজেই আমাদের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল।

সেজন্যে আমরা অনেক সময়-অসময়েও একে অন্যের বাড়িতে গিয়ে হাজির হই।

এখন সকাল আটটা। বিদেশে ছুটির দিনে দেরি করে ওঠাটা প্রায় সব বাঙালির অভ্যেস। বাকি কদিনের সকাল সকাল ওঠা কমপেনসেট করে নেওয়া।

—ঠিক আছে। আমি পরে আসব।—বলে উঠি।

—না না, তা বললে হয়! আজ লুচি করব। তোমার জন্যই না হয় ওকে আজ সকাল সকাল তুলে দেব। এমনিতেও তোমার নাম শুনলেই হয়তো ঘুম ভেঙে যাবে। আমার সঙ্গে তো ওর আর তেমন গল্প জমে না। তুমি বরঞ্চ গার্গীকেও ডেকে নাও। একসঙ্গে লুচি খাওয়া যাবে।

—ও এসব খায় না। ডায়েট করছে। সব অখাদ্য খাবারের উপরেই থাকে। স্যালাড, সেদ্ধ খাবার। লো-কার্ব ডায়েট। অনেক কায়দা আছে ওর। উলটে আমার এসব খাওয়া আজ বন্ধ হয়ে যাবে।

হেসে ওঠে শরণ্যা—ঠিক আছে, তুমি তো ভেতরে এসো। না হয় আমার সঙ্গেই খানিকক্ষণ গল্প করলে।

শরণ্যার পীড়াপীড়িতে ভেতরে এসে বসতেই হয়। আমার ফ্ল্যাটটাও একই কমপ্লেক্সে। ডেনভার শহরের সেন্টারের কাছে। ডেনভার ভারী সুন্দর শহর। বলা হয় মাইল হাই সিটি। শীতে প্রচুর বরফ পড়লেও, শীত এখানে মেঘের ভিড়ে মুখভার করে থাকে না। আমেরিকার মধ্যে সব থেকে বেশি রোদ ঝলমলে দিন এখানে। বরফ পড়লেও রোদের দাপটে চট করে ফের রাস্তা ছেড়ে দেয়।

আমরা এখানে এক বছর হল এসেছি। আমি আর রাহুল একই প্রোজেক্টে কাজ করি। ইন ফ্যাক্ট, একসঙ্গে কাজ করার ও থাকার সুযোগ হবে বলেই প্ল্যান করে এসেছি। দেশ থেকে

এতদূরে বাকি সবাইকে ফেলে আসতে হয়েছে। সেখানে একজন খুব কাছের বন্ধু না হলে চলে! এখান থেকে ভারতে ফোন করাও বেশ কস্টলি। প্রতি মিনিটে প্রায় এক ডলার। সেজন্য বাড়ির দূরত্ব যেন আরও বেশি মনে হয়। মা-র সঙ্গেও খেয়াল করে মিনিট গুনে গুনে কথা বলতে হয়। সেখানে বাড়ির পাশে এক বন্ধুকে পেলে দূরে থাকার অনেক কষ্ট ভোলা যায়। সব বিষয়ে মন খুলে গল্প করা যায়।

সোফায় বসে শরণ্যাকে লক্ষ করে বলে উঠি, হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে গল্প করতে পারলে তো ভালো লাগবেই। দেখবে, কথা শুরু করলে এমনিতেই রাহুল উঠে চলে আসবে। সুন্দরী বউকে সব সময় চোখে চোখে রাখে।

বলতেই শরণ্যা খিলখিল করে হেসে উঠল, মোটেও না। সারাদিন আমার সঙ্গে কথা বলারই সময় পায় না। তা ছাড়া ওর তো বাড়িতে মনই টেকে না! সারাক্ষণ বাইরে বাইরে ঘুরছে। তা তোমার হাতে ওটা কী?— আমার কাগজ লক্ষ করে বলে উঠল।

—ও, এটা দেখাতেই তো এসেছিলাম। আজকের ডেনভার পোস্টে বেরিয়েছে।

—কী দেখি?

—এই লোকটাকে মনে পড়ে?

শরণ্যা দেখে অবাক হল। —না, কে লোকটা?—বলে একটু ভালো করে দেখে ফের বলে উঠল, আরে, কয়েক মাস আগে যার গাড়ির সঙ্গে আমাদের গাড়ির অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল, সেই লোকটা না?

—একজ্যাক্টলি। একটু অস্পষ্ট হলেও ঠিক সেই মুখ। সেদিন কথা শুনেই মনে হয়েছিল, লোকটা ক্রিমিন্যাল হলেও অবাক হব না। ঠিক তা-ই। লোকটাকে আর ওর বড়ো মেয়েটাকে পুলিশ ধরেছে বউ খুনের মামলায়।

—বলো কী?

—হ্যাঁ, ছোটো করে লিখেছে। নাকি বিষ খাইয়ে হত্যা করেছিল কয়েকমাস আগে। পড়ে যা বুঝলাম খুব ইন্টারেস্টিং কেস। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে তবে পুলিশ লোকটার নাগাল পেয়েছে। সেটা পড়াতেই এনেছিলাম।

এর মধ্যে পিছন থেকে রাহুলের গলা পেলাম।—দেখি সকাল সকাল কে আবার আমার বউয়ের সঙ্গে প্রেম করতে এসেছে?

—ওই দেখেছ। এবার থেকে আমি রোববার সকাল সকাল এসে যাব। তোর ঘুম ভাঙাতে। এজন্য সকালে তোর সঙ্গে টেনিস খেলা হয়ে ওঠে না। —এবার মজা ছেড়ে কাগজটা ওর সামনে ধরলাম—লোকটাকে মনে পড়ে?

রাহুল ঘরে গিয়ে চশমা পরে এল। তারপর কাগজটা একঝলক দেখেই বলে উঠল,—আরে, ব্যাটাকে মনে পড়বে না! এ তো সেই অন্য গাড়ির লোকটা। সেদিন যা রাগ হয়েছিল-না!

—ভাগ্যিস মাথা ঠান্ডা রেখেছিলে। —শরণ্যা বলে উঠল, এখানে যার-তার কাছে বন্দুক থাকে। এর কাছে তখন যে ছিল না, তা-ই বা কে বলতে পারে? যে এরকম বউকে খুন করতে পারে, সে যে ওদিন আরও কিছু ক্ষতি করেনি, সেটাইও ভাগ্য। শুধু গাড়ির উপর দিয়ে গেছে।

আমি বলে উঠলাম, হ্যাঁ, যেভাবে তোকে আচমকা চড় মেরেছিল এসে, তুই বলেই মাথা ঠান্ডা রাখতে পেরেছিলি। আমি তো আরেকটু হলে লোকটাকে তখনই মারতাম।

—এ তো আর আমাদের কলকাতা নয়। মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে। তা ছাড়া কে বলতে পারে, সেদিন হয়তো গাড়িতে বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া করতে করতে যাচ্ছিল। তার মধ্যে আমাদের গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা। যাদের বউ থাকে, আমি তাদের এসব ছোটোখাটো অপরাধে ক্ষমা করে থাকি। —বলে আড়চোখে শরণ্যার দিকে তাকিয়ে হাসল রাহুল।

—দেখি, খবরটা ভালো করে পড়ি—বলে কাগজটা আমার হাত থেকে নিয়ে রাহুল পড়তে শুরু করে দিল।

শরণ্যা পাশ থেকে বলে উঠল, হ্যাঁ, ভালো করে পড়ো। দেখো, বউ-হত্যার কোনো ভালো উপায় শিখতে পারো কি না! তোমরা গল্প করো। আমি ততক্ষণ লুচি করে আনি।

সেদিনকার কথাটা সত্যি। ভাগ্যিস রাহুল মাথা গরম করেনি। না হলে সে এক কেলেঙ্কারি কাণ্ড হত। রাহুলের অবশ্য এমনিতেই মাথা খুব ঠান্ডা।

টেবিলের উপরে ইকনমিস্ট ছিল। আমি ওটা হাতে নিয়ে পা টেবিলের উপরে আয়েশ করে তুলে দিয়ে পড়তে শুরু করলাম।

অনেক বাড়িতে গিয়ে কখনোই সহজ হওয়া যায় না। রাহুল-শরণ্যা দুজনেই এমন যে কিছুক্ষণের মধ্যেই ভুলে যেতে হয় যে এটা আমার বাড়ি নয়। দুজনের ব্যবহারে একটা সহজ উষ্ণতা আছে, যা খুব তাড়াতাড়ি সবাইকে আপনার করে নেয়।

ঘটনাটা কী ছিল তা একটু বলি। এটা মাস ছয়েক আগের ঘটনা। খুব সম্ভবত ডিসেম্বরের মাঝামাঝির সময়কার ঘটনা। হঠাৎ বরফ পড়া শুরু হয়ে গেল। সেরকম বরফ পড়া আমি আগে কখনো দেখিনি। সারাদিন, সারারাত ধরে ঝুরঝুর করে তুলোর মতো বরফ পড়ছে। মনে হচ্ছে, বস্তা বস্তা তুলো কেউ যেন আকাশ থেকে ঢেলে দিচ্ছে। তারপরে রাতে সেই অনির্বচনীয় অনুভূতি। চারদিক যেন চাঁদের আলোয় ভাসছে। যেদিকে তাকাই শুধু বরফ আর

বরফ। কোনো শিল্পী যেন পেন্টব্রাশে চারদিকে সাদা রং করে দিয়েছে। আমরা সবাই বাড়িতে বন্দি দু-দিন। ভেবেছিলাম, তারপরে বেশ কয়েকদিন লাগবে রাস্তা পরিষ্কার হতে। কিন্তু বরফ পড়া থামার পরের দিনই দেখলাম, রাস্তায় গাড়ি চলাচল শুরু হয়ে গেল।

আমার বরফের মধ্যে চালানোর বিশেষ অভিজ্ঞতা নেই। তাই ঠিক করলাম, আমরা রাহুলের গাড়িতে করে দোকান-বাজার করে আসব। ও গাড়ি বেশ ভালো চালায়।

পথে সে এক কাণ্ড। বরফ পরিষ্কার করলেও জায়গায় জায়গায় হার্ড আইস। অনেক সময় বোঝা যায় না। রাহুল যথেষ্ট সতর্ক হয়ে চালাচ্ছিল। হার্ড আইসের উপরে ব্রেক কাজ করে না। কিন্তু একটা রেডলাইটে গাড়ি থামাতে গিয়ে হার্ড আইসে এমনভাবে স্কিড করল যে কোনোরকমে স্টিয়ারিং কন্ট্রোল করে গাড়ি থামাতে হল। কোনোরকমে আগের গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা বাঁচানো গেল। কয়েক ইঞ্চি আগে থামানো গেছে। কিন্তু পিছনের গাড়িটা ঠিকমতো থামতে পারেনি। এসে সজোরে আমাদের গাড়িতে ধাক্কা দিল। রাহুল গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল। আমিও নেমে এলাম। পিছনের গাড়ি থেকে বিশাল লম্বা-চওড়া একটা লোক নামল। অসম্ভব মোটা। ডাবল চিন। গলা-মুখ সব এক হয়ে গেছে।

অকথ্য সব গালাগাল দিতে দিতে কথা নেই, বার্তা নেই, সোজা এসে রাহুলের মুখে একটা সজোর থাপ্পড় মারল।

রাহুলের মুখ রাগে-অপমানে লাল হয়ে গেছে। তবু ও কীভাবে নিজেকে সামলাল জানি না। আমি লোকটাকে মারতে যাচ্ছিলাম। রাহুল ধমক দিল, কী করছিস? মাথা খারাপ হয়ে গেছে?

আমাকে খেপে যেতে দেখে লোকটা আরও উত্তেজিত হয়ে কীসব গালাগাল করতে লাগল।

এর মধ্যে এক মহিলা, লোকটার স্ত্রীই হবে হয়তো, রাস্তায় বেরিয়ে এসে লোকটার সঙ্গে যোগ দিল। স্বভাবে সে-ও তার হাজব্যান্ডের মতোই। একই রকম খারাপ ভাষায় আমাদের বেশ খানিকক্ষণ গালাগাল দিয়ে গেল।

এ ধরনের ক্ষেত্রে পিছনের গাড়িরই দোষ হয়। তারই উপযুক্ত দূরত্ব রেখে চালানোর কথা। রাহুলের কোনো দোষই নেই। ওদেরই ইনসিয়োরেন্স থেকে খরচ দেওয়া উচিত। রাহুল অবশ্য সেসব কথা একবারও বলেনি। কিন্তু পুরো উলটো। যেন নিজের ভুল আড়াল করার জন্য লোকটা আরও চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করল।

আমাদের গাড়ির অবশ্য তেমন কোনো ক্ষতি ছিল না। ওদেরও সেরকম বড়ো কোনো ক্ষতি হয়নি। এক্ষেত্রে ঠান্ডা মাথায় ইনসিয়োরেন্স ডিটেলস শেয়ার করাই নিয়ম। বাকিটা তারাই দেখবে। লোকটা চেঁচামেচি করে গাড়ির ইনসিয়োরেন্স ডিটেলস না দিয়ে আবার গাড়িতে উঠে চালিয়ে দিল। আমরা এত হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম যে গাড়ির নাম্বারটা ছাড়া কিছু দেখিনি। এ

বিষয়ে কমপ্লেন করাও হয়নি। কিন্তু চাইলে আমরা ওদের বিপদে ফেলতে পারতাম। বড়ো ধরনের ফাইনের মুখে পড়ত।

সেদিনের সে ঘটনার জন্য লোকটা সম্বন্ধে মনটা বেশ বিষিয়ে ছিল। খবরটা দেখে ভালোই লেগেছে।

জিজ্ঞেস করলাম রাহুলকে, কী লিখেছে?

—কেন, তুই পড়িসনি?

—না, ডিটেলসে পড়িনি। কী দেখলি?

রাহুল দেখি, খবরটা খুব মন দিয়ে পড়ল। তারপরে খানিক বাদে বলে উঠল,ইন্টারেস্টিং। লোকটা নাকি দুবছর আগে দ্বিতীয় বিয়ে করেছিল। কিন্তু রিসেন্টলি কিছু গণ্ডগোল শুরু হয়েছিল দ্বিতীয় স্ত্রী-র সঙ্গে। তাকেই নাকি জানুয়ারিতে খুন করার দায়ে ধরা পড়েছে। খুনের দায়ে লোকটার প্রথম পক্ষের মেয়েকেও ধরেছে।

তার মানে সেদিন যে মহিলা সঙ্গে ছিল, সে-ই নিশ্চয়ই দ্বিতীয় স্ত্রী। সে-ই নিশ্চয়ই খুন হয়েছে। কী অবস্থা। সেদিন গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে সে-ও তো অকথ্য ভাষায় গালাগাল করছিল।

রাহুল লেখাটা পড়া শেষ করে যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল। শুধু একবার 'হুম' বলে অস্ফুট শব্দ করে উঠল।

আমার অবশ্য অন্যমনস্ক হওয়ার সুযোগ ছিল না। ডাইনিং টেবিলে ডাক পড়েছে। লুচি রেডি। সঙ্গে আলু-ফুলকপির তরকারি। দারুণ। দেশের বাইরে এরকম খাবার নিয়মিত পাওয়া যায় না।

৫

১০ ফেব্রুয়ারি ২০২০, রাত তিনটে, মধ্যমগ্রাম

অনেকক্ষণ এপাশ-ওপাশ করেও ঘুম এল না। মাঝেমধ্যে মনে হচ্ছে, টেনশনে দমবন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ঘর অন্ধকার। কিন্তু তার থেকেও বেশি অন্ধকার যেন আমাকে ঘিরে ধরেছে। তার মধ্যেই খাটের উপরে চুপ করে বসে রইলাম নিজেকে অদৃশ্য করে। একটা চাপা উত্তেজনা যেন ভারী হয়ে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বুকের উপরে আরও বেশি করে চেপে বসেছে। বাইরে এখনও অঝোর বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে।

আমি যেটা ভাবছি, সেটা কি সত্যি? না, না, এ অসম্ভব। আমি রাহুলকে এত বছর ধরে চিনি। আমার ক্লোজেস্ট ফ্রেন্ড। এত বড়ো ভুল করব!

কিন্তু তাহলে এ ছবিগুলো এত যত্ন করে রাখা আছে কেন? যার মধ্যে তিনজনকে আমি ভালো করেই জানি। মুখগুলো আমার এত বছর বাদেও স্পষ্ট মনে আছে। বাকি কয়েকটা ফোটো কাদের, সেটা অবশ্য জানি না।

খুব সন্তর্পণে বিছানা ছেড়ে উঠলাম। দরজায় কোনো লক নেই। দরজার নীচ দিয়ে কোনো আলো আসছে না। বাইরে তার মানে কোনো আলো জ্বলছে না। কেউ নির্ঘাত জেগে নেই। ঘরের আলো জ্বালালাম না। ফোনের টর্চ জ্বালিয়ে বুককেসের সামনে মাটিতে বসে পড়লাম। আবার চাবি ঘুরিয়ে বইয়ের আলমারির নীচের তাক খুললাম। ডালাটা সাবধানে নিঃশব্দে তুলে একটা একটা করে অ্যালবাম নামাতে থাকলাম।

মনে রাখতে হবে, কোনটার পরে কোনটা ছিল। সেভাবেই মাটিতে সাজিয়ে রাখতে থাকলাম।

আগের বারে অবশ্য এত সাবধানে করি নি। তখন কিছু ভুল করে থাকতে পারি।

ওই ছোট অ্যালবামটা পিছনে ঠিক যেখানে ছিল, সেখানে রেখে দিয়েছিলাম। আবার বার করতে গিয়ে সামনের একটা অ্যালবাম পড়ে গেল। সামান্য আওয়াজ হল। চমকে উঠে দরজার দিকে তাকালাম। নাহ, এই বৃষ্টির আওয়াজের মধ্যে সে আওয়াজ শোনা সম্ভব নয়। তবু হৃৎস্পন্দনের হার যেন বেড়ে গেল। যদি কেউ এসে যায়!

ফোনের আলো নিভিয়ে খানিকক্ষণ ওখানেই বসে থাকলাম। কেউ শুনতে পায় নি তো? বাইরে থেকে কেউ আসছে কি না বোঝার চেষ্টা করলাম। নাহ, কোনো পায়ের শব্দ নেই। ফের ফোনের টর্চের আলো ওই অ্যালবামে ফেললাম। খামে কয়েকটা ছবি ছিল। কয়েকটা খবরের কাগজ থেকে কাটা। কয়েকটা ক্যামেরায় তোলা। ফোনে সব ক-টা ছবি তুলে নিলাম। লক্ষ করলাম সব ক-টা ছবির উপরে একটা অদ্ভুত সিম্বল।

একটা চোখ। মাঝখান থেকে কাটা।

ছবিগুলো নিয়ে অ্যালবামগুলো আবার যেখানে যেখানে ছিল, ঠিক সেভাবে রেখে দিলাম। তাক বন্ধ করে চাবি আবার যেরকম লাগানো ছিল, ঠিক সেভাবেই রেখে দিলাম।

ছবিগুলো এখানে আছে কেন? সে রহস্য আমাকে বার করতেই হবে। এত আবোল-তাবোল ভাবছি, রাহুলকে জিজ্ঞেস করলেই সন্দেহ মিটে যায়। ওকে প্রায় সব কথাই বলা যায়। কিন্তু এটা সেরকম কথার মধ্যে পড়ে না।

ও যদি সত্যি ইনভলভড থাকে! সেক্ষেত্রে? শুধু শুধু একটা লোক এভাবে কয়েকজনের কাগজে ছাপা ছবি সংগ্রহ করে এত বছর ধরে এত যত্ন সহকারে গুছিয়ে রাখে?

নাহ, শুয়ে পড়াই ভালো। হাতঘড়িতে দেখলাম রাত দুটো। শুয়ে ঘুম এল না। আরও আধ ঘণ্টা কেটে গেল। এ ঘরে রাহুলের পার্সোনাল ল্যাপটপ থাকে। ওটা অন করে একবার দেখব কি! তাতে যদি কোনো তথ্য পাওয়া যায়। করাটা উচিত নয় জানি। কিন্তু এরকম রহস্যের সমাধান করার সুযোগ কি আর কোনোদিন আসবে?

উঠে কম্পিউটার অন করলাম। পাওয়ার অন পাসওয়ার্ড কী হতে পারে? ও আই. টি.-র লোক, খুব সহজ কোনো পাসওয়ার্ড রাখবে না। কয়েকবার চেষ্টা করলাম। ওর পছন্দের জিনিসের নাম, জন্মদিন, শরণ্যার নাম, বিভিন্ন কম্বিনেশন— ট্রাই করলাম। ওকে কি সত্যি আমি এখনও চিনি না! ব্যর্থ হয়ে আবার কম্পিউটার অফ করে শুয়ে পড়লাম।

এবার নিশ্চিত হওয়ার জন্য ফোনে ইন্টারনেটে সার্চ করলাম। অনেক বছর কেটে গেছে। লোকটার নাম যেন কী ছিল? পল, না না, ডেভিড। খুঁজে পেতে অবশ্য সময় লাগল না।

ডেনভার ১৯৯৭ মার্ডার কেস বলে সার্চ করতেই, যেসব ঘটনার কথা খবরে খুঁজে পেলাম, তার মধ্যে ওই কেসটা খুঁজে পেতে সময় লাগল না। লোকটার নাম পল কোলাঞ্জেলো। ডেনভার পোস্টে ছবিটাও খুঁজে পেয়ে গেলাম। ফোনে তোলা ছবির সঙ্গে মিলিয়ে দেখলাম। একই ছবি। হ্যাঁ, কাগজ থেকে কাটা এরই ছবি রাহুলের অ্যালবামে দেখলাম। ওর স্ত্রী-র নাম টনিয়া। তার ছবিটাও ঠিক চিনতে পেরেছি। দুটোই প্রকাশিত খবর থেকে নেওয়া। তার বাইরেও এদের দুজনের একসঙ্গে একটা কালারড ছবি আছে। সেটা ও কীভাবে জোগাড় করল?

এরপরে কেনিলওয়ার্থ ২০০৪ সাল, ইংল্যান্ড। একইভাবে জেসিকা স্মিথের নাম বার করতেও সময় লাগল না। সে ছবিটা অবশ্য অস্পষ্ট। ডেলি মেল-এ খবরটা বেরিয়েছে। ২০ জুন ২০০৪-এর খবরে। বলা হয়েছে যে যার মৃতদেহ পাওয়া গেছে, তার নাম জেসিকা স্মিথ। ৩১ বছরের মহিলা। না, অস্পষ্ট হলেও ছবিটা চিনতে ভুল হয়নি। জেসিকার মুখ এখনও আমার চোখে ভাসে। জেসিকা আমাদের সঙ্গেই কাজ করত। আরেকটা ছবিও পেলাম সেই অ্যালবামে। জেসিকা ও জেসিকার বয়ফ্রেন্ডের। ওর এরকম পার্সোনাল ছবি এখানে রাহুলের কাছে এল কী করে?

আমাদের প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট টিমে সেক্রেটারির কাজ করত জেসিকা। কাজের বাইরে তেমন কোনো কথা হত না। ভারী মিষ্টি মেয়ে ছিল। নীল চোখ। সোনালি চুল।

তারপরে একদিন হঠাৎ করে অফিসে আসা বন্ধ করে দিল। তিন দিন না-আসার পরে পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। মেয়েটার বাবা-মা ইংল্যান্ডের কেন্টে থাকত। আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম যে ও বোধহয় আর্জেন্ট কোনো কাজে সেখানে গেছে। তারাও কিছু

না বলতে পারায় তারপরেই পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছিল। সে সময় পুলিশ এসে আমাদের সবাইকে অনেক প্রশ্ন করেছিল। মনে আছে। শুনেছিলাম, জেসিকার এক বয়ফ্রেন্ডকে পুলিশ অনেক জেরা করেছিল। সে ছেলেটাও কিছু বলতে পারেনি।

এর পাঁচ মাস বাদে হঠাৎ আবার একদিন পুলিশ অফিসে এসে হাজির। তখনই জানতে পারি যে ওর ডেডবডি পাওয়া গেছে টাইল হিলে। আমাদের অফিস ছিল বার্মিংহ্যামে। সেখান থেকে জায়গাটা খুব দূরে নয়। একটা বাক্সের মধ্যে ওর কঙ্কাল পাওয়া যায়। মার্ডার।

হঠাৎ করে যখন জেসিকার মার্ডারের খবটা পেয়েছিলাম, খুব খারাপ লেগেছিল। এত হিংস্রভাবে কে ওকে মারতে পারে, ভাবতে পারিনি। মার্ডার কেসে শেষে কাকে ধরা হয়েছিল, সেটা জানা নেই। আমি সে বছরে জুনে দেশে ফিরে আসি। ভুলেই যাই এ ঘটনা।

কিন্তু রাহুলের কি কোনো মোটিভ থাকতে পারে এই খুনের পিছনে? কিছু কিছু ঘটনা মনে পড়ছে। সেগুলো বিক্ষিপ্তভাবে মনে আসতে লাগল।

এ ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে। ২০০৪-এর জুলাই নাগাদ রাহুল ফিরে আসে ইংল্যান্ড থেকে। আমিও তার এক মাস পরে ফিরে আসি। প্রোজেক্ট থেকে ওকে তখন ছাড়তে চাইছিল না। ও মা-র শরীর খারাপ বলে ফিরে এসেছিল। মাসিমার শরীর অবশ্যই খারাপ ছিল, কিন্তু শুধু তা-ই কি? নাকি এ ঘটনার জন্যই? ও-ই কি যুক্ত ছিল এই জঘন্য অপরাধের সঙ্গে? আজ রাতে আর ঘুম হবে না। বিছানায় শুয়ে ছটফট করতে লাগলাম।

কিন্তু ঘুম এল। সেদিন স্বপ্নে জেসিকাও এল।

৫

১৮ জানুয়ারি ১৯৯৭, ডেনভার, কলোরাডো

শীতের সকাল। আজ বরফ পড়েনি। বাইরে আলো ঝলমল করছে। তার মধ্যে মাঝেমধ্যে ঠান্ডা কনকনে হাওয়া। ডেনভার পাহাড়ে ঘেরা উপত্যকা। সেজন্য মাঝেমধ্যে আশপাশের বরফ ঢাকা রকি মাউন্টেন থেকে ঠান্ডা কনকনে হাওয়া হানা দেয়।

লিসা শিকাগোতে বড়ো হয়েছে। সেখানে বেশি বরফ পড়লে বেরোনো শক্ত হয়ে যেত। এখানে সেরকম নয়। বরফ যেমন প্রচুর পড়ে, সূর্যের আলোর কড়া মেজাজে সে বরফ গলেও যায় তাড়াতাড়ি।

ডিটেকটিভ কনস্টেবল লিসা এক বছর ডেনভারের পুলিশ ডিপার্টমেন্টে জয়েন করেছে। কাল বিকেলে একটা নতুন কেস এসেছে। পুরো কোলাঞ্জেল ফ্যামিলি হাসপাতালে ভরতি। ডেনভারেই বহু বছর থাকে এই পরিবার। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার। পল কোলাঞ্জেল কাছেই

অ্যাস্পেনের একটা মাইনিং কোম্পানিতে কাজ করে। সে-ই একমাত্র সুস্থ আছে। তার পুরো পরিবার হাসপাতালে।

পরিবার বলতে স্ত্রী মেরি, দুই ছেলে, এক মেয়ে। তিন দিন আগে হাসপাতালে ভরতি হয়েছে। প্রথমে ভাবা হয়েছিল নতুন কোনো ভাইরাসে আক্রান্ত। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে বিষক্রিয়া।

বার বার বমি। হার্টবিট স্বাভাবিক নয়। সারা গায়ে হাতে-পায়ে অসহ্য যন্ত্রণা। এর মধ্যে মেরির অবস্থা সব থেকে খারাপ। মনে হচ্ছে, কোনোভাবে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম আক্রান্ত হয়েছে। বাঁচবে কি না সন্দেহ। অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপ হচ্ছে। যেকোনো সময় কোমায় চলে যেতে পারে। সে তুলনায় দুই ছেলে ও মেয়ের অবস্থা ভালো। কম বয়সের জন্য বিষক্রিয়ার থেকে খানিকটা বেরোতে পেরেছে। তাও যেকোনো সময়ে হাত বা পা কেটে ফেলতে হতে পারে। কোনো অচেনা বিষ খাবারে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে মনে করা হচ্ছিল। সকালে সেই ধারণা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। মেডিক্যাল রিপোর্ট এসেছে। রক্তে থ্যালিয়াম পাওয়া গেছে।

থ্যালিয়াম মানে পিরিয়ড টেবিলে ৮১ নাম্বারে থাকা বিপজ্জনক সেই মৌলিক।

লিসা কেস হিস্ট্রি যত্ন নিয়ে পড়ছিল। এরকম শক্ত কেস আগে ওর হাতে আসে নি। এর মধ্যে ওর বস মাইক ঘরে ঢুকল।

ওকে লক্ষ করে রিপোর্টটা দেখিয়ে মাইক বলে উঠল, থ্যালিয়াম জোগাড় করা সহজ নয় কিন্তু। সেটাই কী করে জোগাড় করল, বা কীভাবে কে মেশাল, সেটাই প্রথমে দেখতে হবে।

মাইকের বেশ সুখ্যাতি আছে ডিপার্টমেন্টে। মাঝারি হাইট। অ্যাথলেটিক চেহারা। খুব পরিশ্রমী। হাল ছাড়ে না কিছুতে। চেয়ার পাশে টেনে বসে বলে উঠল, মেরির হাজব্যান্ড পলের খুব একটা সুনাম নেই। খুব বদমেজাজি লোক। কিছুদিন আগে এক কলিগের সঙ্গে মারামারি করেছে অফিসে। শোনা যায়, মেরির সঙ্গেও সম্পর্ক খুব একটা ভালো ছিল না। বলা যায়, কারো সঙ্গেই ভালো সম্পর্ক ছিল না। ও-ই হল প্রাইম সাসপেক্ট।

—ওদের কিন্তু বেশি দিন বিয়ে হয়নি।

—হ্যাঁ, এক বছর আগে বিয়ে হয়েছে। এটা দুজনেরই দ্বিতীয় বিয়ে। এ কেসটা নিয়ে তাড়াতাড়ি এগোতে হবে। আমি চাই, তুমি এখন ওদের বাড়ি গিয়ে খোঁজখবর নাও। পলকে জেরা করো। দরকার হলে ওর অফিসেও যাও। দেখো, ওর এই বিষ জোগাড় করার কোনো উপায় ছিল কি না। শুনেছি, পল ওইদিন কোথাও বেড়াতে গিয়েছিল। অ্যালিবাইটা ভালো করে চেক করো।

একটু থেমে মাইক ফের বলে উঠল, বাড়ির সবকিছু চেক করা হয়েছে? কোনো কিছুতে বিষ ছিল কি না।

—না, গতকাল বিকেলেই আমাদের দপ্তরে কেসটা এসেছে। তার আগে এর পিছনে নতুন কোনো ভাইরাস কি না ভাবা হচ্ছিল।

—মেন সাসপেক্ট মেরির হাজব্যান্ড পল হলেও মার্ডার কেসে সবাইকে সন্দেহ করবে। এমনকী ওদের ছেলে-মেয়েদেরও সন্দেহের বাইরে রাখবে না। সবারই কিছু না কিছু মোটিভ থাকতে পারে। আমি কিছু খোঁজখবর নিয়েছি।

—তা স্যার, এ কেসে আপনার সাহায্য পাব তো?

—অবশ্যই। আমার আরেকটা খুব দরকারি কেসে কাজ করতে হচ্ছে। ওই যে সিনেমা হলের শুটিং-এর কেসটা। ওটার তদন্তভার আমাকে নিতেই হবে। তা না হলে এটাই করতাম। তোমার ভালো এক্সপিরিয়েন্স হবে। যত সহজ কোনো কেস মনে হয়, ভেতরে ঢুকলে দেখবে সেটা হয়তো তত কঠিন। সেখানেও অনেক প্রশ্ন থেকে যায়। যেমন এখানে ধরো 'থ্যালিয়াম' জোগাড় করা অত সহজ কাজ নয়। সন্দেহ অনেককে করা যায়।

—হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন স্যার। আপনার ধারণা কী?

—এক, অবশ্যই পল প্রথম সন্দেহ। এটা ওর দ্বিতীয় বিয়ে। এক বছর আগে বিয়ে হয়। কিন্তু খবর পেয়েছি, নিয়মিত অশান্তি হত।

দুই, ওর বোন, পলের বোন অ্যানা। তার সঙ্গে মেরির মোটেও ভালো সম্পর্ক ছিল না। অ্যানার নিয়মিত ও বাড়িতে যাতায়াত ছিল। বিষ মেশানোর সুযোগ ছিল।

তিন, ওর ছেলে-মেয়েরা। দুই ছেলে মেরির দিক থেকে, মেয়ে পলের প্রথম পক্ষের। এরকম ক্ষেত্রে যখন দুটো পরিবার হঠাৎ করে এক জায়গায় চলে আসে, তখন ছেলে-মেয়েদের মধ্যে অনেক টেনশন তৈরি হতে পারে। এক্ষেত্রেও হচ্ছিল। সেরকমই খবর পেয়েছি। এদের মধ্যেও কেউ বিষ মেশাতে পারে। খেয়াল করো এরা কেউ মারাত্মক অসুস্থ নয়।

চার, পলের প্রথম স্ত্রী। তারও রাগ থাকা স্বাভাবিক। শুনেছি, খুব মারধর করত পল। প্রতিহিংসা? হয়তো পল লাকিলি সেদিন ছিল না।

পাঁচ, মেরির প্রথম স্বামী। এরকম অনেকেরই মোটিভ থাকতে পারে। এমনকী কোনো প্রতিবেশীও এর সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে। মোদ্দা কথা, কাউকেই সন্দেহের বাইরে রাখলে চলবে না।

—হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন স্যার। আপনি তো অনেক কিছুই জেনে নিয়েছেন এর মধ্যে। আমি সবরকম গ্রাউন্ড ওয়া এখনই শুরু করে দিচ্ছি। প্রথমেই ওই বাড়ির প্রত্যেকটা জিনিস টেস্ট করে দেখছি, কোথা থেকে বিষ আসতে পারে।

—গুড, হ্যাঁ, ওটা পেলেই সেটাতে বিষ মেশানোর সুযোগ কার কার ছিল, সেটা ভাবতে পারবে। আর থ্যালিয়াম নিয়ে একটু রিসার্চ করে নিয়ো। মনে রাখবে, পল মাইনিং কোম্পানির ল্যাবে কাজ করে। ওখানে এমন কোনো কিছু ছিল, যার থেকে থ্যালিয়াম পাওয়ার সুযোগ কোনো ছিল কি না, সেটাও দেখে নিয়ো।

—ও.কে. স্যার।

লিসা আগামীকাল ছুটি নেওয়ার কথা ভাবছিল। কিন্তু এরকম অবস্থার মধ্যে সেটা আর বলা হল না। আজকেই এখন পলের বাড়িতে প্রথম যেতে হবে। একেই বলে ব্যাড লাক।

৭

২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭, ডেনভার, কলোরাডো

মাইক লিসার চেম্বারে ঢুকেই বলে, লিসা, তোমাকে আর এ কেসে বেশি সময় দিতে পারব না। খুব তাড়াতাড়ি এগোতে হবে। প্রায় এক মাস হয়ে গেল। উপরের থেকে চাপ আসছে। বলছে অন্য কাউকে দায়িত্ব দিতে। —মাইকের মুখে স্পষ্ট অসন্তোষের ভাব। একটু শব্দ করেই কফির মাগটা লিসার সামনে টেবিলের উপরে রাখল।

—না স্যার, অনেক এগিয়েছি। আর এক মাসের মধ্যে নিশ্চিতভাবে একটা কিনারা করার যাবে।

—এক মাস?—মাইকেল একটা খুব খারাপ শব্দ উচ্চারণ করে পায়চারি করতে করতে বলে উঠল, আমার কাছে প্রতিঘণ্টায় কল আসছে, আর তুমি বলছ এখনও এক মাস? আর ইউ ক্রেজি? আমার এখন থেকে প্রতিদিন রিপোর্ট চাই। মেরির ব্রেনডেথ। কোমায়। সুস্থ হওয়ার কোনো আশাই নেই। দুই ছেলের একজন এখনও গুরুতর অসুস্থ, একজনের পা কেটে বাদ দিতে হয়েছে, আর তুমি আরও এক মাস চাইছ! ঠিক কী কী কাজ এগিয়েছে, আমি এখনই জানতে চাই।

লিসা মাইককে এত রাগতে কখনো দেখেনি। নিশ্চয়ই উপরমহল থেকে সাংঘাতিক চাপ এসেছে। তা না হলে গত এক মাসে কী হয়েছে, সে বিষয়ে কোনো খবর নেওয়ার সময় পায়নি মাইক। অবশ্য এটাও ঠিক, মাইক অন্য একটা কেস নিয়ে বেশ খানিকটা সময় অত্যন্ত ব্যস্ত ছিল।

লিসা বলতে থাকে, স্যার, আমাদের সব থেকে বেশি সময় লেগেছে ওই বিষ কোথা থেকে এসেছে, সেটা বুঝতে। প্রথমে আমরা বাড়ির প্রত্যেকটা জিনিস টেস্ট করে কোথাও থ্যালিয়াম পাইনি। তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি। কী করে যে ওদের রক্তে থ্যালিয়াম এল, সেটা বুঝতে পারিনি। প্রথম ব্রেক পাই সার্চ শুরুর পাঁচ দিন বাদে।

—হ্যাঁ, সেটা শুনেছিলাম। কোকের বোতলে পেয়েছিলে তা-ই তো? —একটু যেন নরম হয়ে বলে উঠল মাইক।

—হ্যাঁ, সেটাই তো! কোকের বোতলে যে থ্যালিয়াম নাইট্রেট থাকবে, কে জানত! আরও তিনটে না-খোলা বোতলে একই জিনিস পাওয়া গিয়েছিল। কী করে জানি না 'থ্যালিয়াম নাইট্রেট'-এর গুঁড়ো মিশিয়ে আবার বোতল সিল করে দেওয়া হয়েছিল।

—আশ্চর্য! এটা তো সাধারণ কারো পক্ষে করা সম্ভব নয়! তা কোকের পুরো ব্যাচ টেস্ট করেছিলে?

—হ্যাঁ, স্যার। সেখানে অনেক সময় লেগে গেল। বুঝতেই পারছেন খুব সহজে এসব টেস্ট করা যায় না, বিশেষ করে যখন এত বড়ো একটা কোম্পানির একটা রেপুটেশনের ব্যাপার এর সঙ্গে যুক্ত আছে। তা ছাড়া অন্য কোথাও এরকম কিছু হয়নি। কিছুদিন পরে পারমিশন পাই। সঙ্গে সঙ্গে ওদের ডিস্ট্রিবিউটরদের অফিসে যোগাযোগ করে পুরো ব্যাচ ট্র্যাক করে সব টেস্ট করা হয়। বুঝতেই পারছেন, ব্যাপারটা খুব সেন্সিটিভ ছিল।

—কিছু পাওয়া গিয়েছিল?

—না, কোকের কোনো ব্যাচে কোথাও কিছু নেই। শুধু ওই বাড়ির আটটা বোতলে থ্যালিয়াম পাওয়া গেল। অর্থাৎ হয় সে বাড়ির কেউ, না হলে ওই বাড়িতে নিয়মিত আসা-যাওয়া ছিল এরকম কেউ ওই বোতলে মিশিয়েছিল।

—তারপর? এর জন্য পলের উপরে সন্দেহ আরও বাড়ার কথা। ওর সে সময় সুযোগ ছিল। হয়তো দক্ষতাও ছিল। তা এখন কাকে কাকে সন্দেহের লিস্টে রেখেছ?

—অবশ্যই সবার আগে পল। পল সেই সময় বাড়িতে ছিল না। অফিসের কাজে বাইরে গিয়েছিল। কিন্তু ওর পক্ষে কোকের বোতলে কিছু মেশানো সব থেকে সহজ কাজ ছিল।

—ওর এগেনস্টে কিছু ভালো মোটিভ পেয়েছ? কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে?

—বেশ কিছু দিন ধরেই স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক ভালো ছিল না। পল বেশ বদমেজাজি। কিছুদিন আগে একটা পাবে ওদের দুজনের মধ্যে বেশ ঝগড়াও হয়। অনেকে সেটা দেখেছে। মেরির দুই ছেলে। পল আবার তাদের খুব একটা পছন্দ করত না। মেরি সিগারেট খায়। সেটা পলের একেবারে পছন্দ ছিল না। মোদ্দা কথা, দুজনের মধ্যে ইতিমধ্যেই বেশ ভালোরকম অশান্তি

দেখা দিয়েছিল। খবর পেয়েছি যে পল নাকি ওর এক অফিসের বন্ধুকে এও বলেছিল যে এই বিয়েটা করা ওর খুব বড়ো ভুল হয়েছে। এ ছাড়া মেরির নামে একটা বড়ো অঙ্কের লাইফ ইনসিয়োরেন্স দু-মাস আগে নিয়েছিল পল।

—কীরকম অ্যামাউন্টের?

—এক লক্ষ ডলারের।

—হুঁ। বেশ মোটা অঙ্কের। দ্যাট'স এক্সেলেন্ট মোটিভ। বউ মরলে ভালো লাভই হবে ওর। তারপর? কিন্তু এরকম বিষ পাওয়ার অন্য কোনো উপায় ছিল?

—সেটাই— থ্যালিয়াম সহজে পাওয়ার কথা নয়। আমরা ওর অফিসে গিয়ে খোঁজখবর করি। একটা ইদুর মারার বিষের ফাঁকা বোতল পেয়েছি। আপনি নিশ্চয়ই জানেন আমেরিকার র‍্যাট পয়জন-এ থ্যালিয়াম নিষিদ্ধ। কিন্তু ওটা জার্মানি থেকে আনানো। তারা থ্যালিয়াম ব্যবহার করে কি না, সেটা জানতে চেয়ে আমরা ফ্যাক্স করি। কিছুদিন আগে উত্তর এসেছে।

—আছে তাতে?

—ছিল। কিন্তু সামান্য। যে বোতলটা পেয়েছি, তাতে অতটা থাকা সম্ভব ছিল না। এখনও সেটাই প্রশ্ন রয়ে গেছে। সেটা মিলে গেলে সঙ্গে সঙ্গে অ্যারেস্ট করতাম। পলকে সন্দেহের আরেকটা কারণ আছে।

—কী?

—পল বাড়ি ফিরে এসে দেখে যে সবাই অসুস্থ। সবার বমি-জ্বর তখন শুরু হয়েছে। গায়ে-হাতে-পায়ে অসহ্য যন্ত্রণা। কিন্তু তবু সঙ্গে সঙ্গে ওদের কাউকে হাসপাতালে ভরতি করেনি? ভরতি করে প্রায় একদিন পরে। এত দেরি করল কেন? ইচ্ছে করে কি ও চাইছিল, যাতে বিষের প্রভাব আরও ছড়িয়ে পড়ে? মৃত্যুর সম্ভাবনা যাতে বাড়ে?

—অন্যরকমও হতে পারে। যদি নিজে না করে থাকে তাহলে বিষ মেশানো হয়েছে, সেটাই হয়তো বুঝতে পারেনি! সবারই আগে যে কেউ ফুড পয়জনিং ভাববে। ওর ক্ষেত্রেও সেটাই স্বাভাবিক। আর কারো উদ্দেশ্য থাকতে পারে?

—পলের বোন অ্যানা। তার সঙ্গেও মেরির ভালো সম্পর্ক ছিল না। পল যেখানে থাকে, সে বাড়িটা আসলে পলের বাবার করা। সেদিন থেকে অ্যানার একটা অধিকার আছে ও বাড়ির উপর। কিন্তু মেরির তাতে আপত্তি ছিল। মেরি চাইত না যে অ্যানা এই বাড়িতে আসে। কিন্তু তবু অ্যানা প্রায় নিয়মিত আসত। প্রতি সপ্তাহে অন্তত দুবার। সে নিয়ে অশান্তি লেগে ছিল।

—অ্যানা কী কাজ করে, দেখেছ?

—নার্স। সেজন্য ওর পক্ষেও থ্যালিয়াম জোগাড় করা সম্ভব ছিল।

—তা-ই নাকি? থ্যালিয়াম-হাসপাতালে ব্যবহার করা হয়, জানতাম না তো?

—হ্যাঁ, কার্ডিয়াক স্ট্রেস টেস্টের জন্য যে ওষুধ ব্যবহার করা হয়, তাতে থ্যালিয়াম থাকে। কিন্তু তাহলেও এতটা পরিমাণ জোগাড় করা সহজ ছিল না। তা ছাড়া রেডিয়োঅ্যাকটিভ কোনো কিছু একটু একটু করে জোগাড় করে এত সহজে নিয়ে আসাও সম্ভব ছিল না।

—কিন্তু পল আর অ্যানা মিলে তো কাজ করতেই পারে। তা-ই না?

—সেটা অবশ্যই হতে পারে। তবে এখানে আমার তৃতীয় সাসপেক্টের কথা বলতে হয়। তৃতীয়জন হল পলের মেয়ে এমিলি।

—ও, তার কথা তো ভুলেই গিয়েছিলাম। এমিলি তো পলের প্রথম পক্ষের মেয়ে, তাই না?

—হ্যাঁ, ঠিক তা-ই। এমিলির সঙ্গে সৎমা মেরির সম্পর্ক ভালো ছিল না। মেরির থেকেও ও বেশি অপছন্দ করত মেরির দুই ছেলেকে। ওদের স্বভাব ভালো ছিল না। সেটা নিয়ে নাকি এমিলির সঙ্গে ওদের বাড়িতে প্রায়শই অশান্তি হত।

—বা, একেবারে আইডিয়াল ফ্যামিলি। কাউকে দেখছি, বাদ দেওয়া যায় না। কিন্তু এমিলিও অসুস্থ হয়ে পড়েছিল না?

—হ্যাঁ। কিন্তু অন্যদের মতো অতটা অসুস্থ হয়নি। এখন পুরোপুরি সুস্থ। ওর বক্তব্য, ও কোকে বরফ মিশিয়ে খায়। কোক খুব একটা পছন্দ করে না। সে জন্য কম খেয়েছিল। তার জন্যই হয়তো ওর বাড়াবাড়ি কিছু হয়নি। কিন্তু এখানেই প্রশ্ন, ও কি জানত যে কোকে বিষ মেশানো আছে? তাই কম খেয়েছিল?

—তা সে মেয়ে কী করে?

—কেমিস্ট্রি নিয়ে ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করে।

—ওরে বাবা! তার মানে থ্যালিয়াম কী তা ও ভালোভাবে জানত। কিন্তু ওর পক্ষেও থ্যালিয়াম জোগাড় করার কোনো সম্ভাবনা ছিল কি না, সেটা খতিয়ে দেখতে হবে।

—হ্যাঁ, স্যার, আমরা সেটাই দেখছি। এমনকী মেয়েটার বয়ফ্রেন্ডের পক্ষেও সে সম্ভাবনা ছিল কি না তা দেখছি।

—হ্যাঁ, দেখো। ল্যাব বা অন্য কোনো জায়গা থেকে কোনোভাবে ওর পক্ষে জোগাড় করা সম্ভব ছিল কি না। আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য রিজনস বিহাইন্ড দ্য ডিলে নাউ। খুব সিম্পল কেস নয়। এদের বাইরে অন্য কাউকে সন্দেহ করছ?

—না, বাকি সব কজনকে বাদ দেওয়া হয়েছে। মেরির প্রথম স্বামীর সঙ্গে কোনো যোগাযোগ ছিল না, সেটাও দেখেছি। সে কখনো ওই বাড়িতে আসেনি। তা ছাড়া ওদের

দুজনের মধ্যে ডিভোর্স প্রায় তিন বছর আগে হয়েছে, পলের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার অনেক আগে। সেদিক থেকে ওদের দুজনের মধ্যে কোনো আকর্ষণ, বা ঘৃণা—কোনো কিছুই ছিল না।

—ঠিক আছে। এবারে তাহলে জাল গোটাতে শুরু করো। মনে রাখবে, কোনো ইনভেস্টিগেশনই পারফেক্ট হয় না। আর ঠিক দু-সপ্তাহ সময় দেব। তার মধ্যে আমি শুধু একজনের নাম শুনতে চাই। লাই ডিটেক্টর টেস্ট করেছ এদের প্রত্যেককে, তাতে কিছু এসেছে?

—না, স্যার, তাতে তেমন কিছু ধরা পড়েনি।

—ঠিক আছে। মনে রেখো তোমার সময় আর ঠিক দু সপ্তাহ।

কফির মাগটা নিয়ে আবার উঠে পড়ল মাইক। যেভাবে আস্তে করে দরজা টেনে দিল তাতে লিসা বুঝতে পারল, মাইক দেরির কারণটা বুঝেছে।

সত্যি আর কতদিন এই কেসটা নিয়ে বসে থাকবে লিসা। শেষের সুতো গোটাতেই হবে। মাইকের কথাটাই ঠিক। কোনো ইনভেস্টিগেশনই পারফেক্ট হয় না। সময়মতো একটা সিদ্ধান্তে আসতেই হয়। এক্ষেত্রে সেটা আর দু-সপ্তাহ। না, না, দিনের হিসেবে চললে চলবে না। বলা যায়, ঠিক ৩৩৬ ঘণ্টা আছে।

লিসা উত্তেজনায় উঠে দাঁড়াল।

৭

১১ মার্চ ১৯৯৭, ডেনভার, কলোরাডো

অবশেষে কেস প্রায় সলভড। রিপোর্ট প্রায় তৈরি। শেষ কয়েকদিন কাজের চাপে ভালো করে ঘুম হয়নি। আজ অনেকটা হালকা লাগছে। ডেনভারের একটা পাবে এসেছে লিসা।

যাকে বলে জাল গোটানো, তা প্রায় শেষ। হ্যাঁ, এর পরেও কি কোনো প্রশ্ন নেই? অবশ্যই আছে। মানুষের চরিত্র খুব জটিল। অপরাধী শেষ পর্যন্ত কখনোই তার অপরাধ স্বীকার করবে না।

সেদিন মাইকের সঙ্গে এ কেসের ব্যাপারে আলোচনার সময়ই লিসার প্রথম সন্দেহ হয়, এটা বাবা-মেয়ে মিলে প্ল্যান করেনি তো? দুজনেরই লাভ এতে। দুজনে মিলে এ অপরাধ করতে পারে, এ সন্দেহ এর আগে হয়নি। সেজন্য সবকিছুর উত্তর মিলছিল না। অনেক সময় একই জিনিস দ্বিতীয়বার বললে বা তা নিয়ে আবার ভাবলে, তা মনের মধ্যে অন্য রঙে ধরা পড়ে।

আসলে লিসার মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন ছিল, পলের সঙ্গে কোথায় যেন খুনির সাইকোলজিক্যাল প্রোফাইল মেলে না। পল বদমেজাজি, স্থূল মস্তিষ্কের মানুষ। দেখে মনে হয়

লোকের সঙ্গে মারপিট করাই তার পক্ষে বেশি সম্ভব। সেখানে মারার এত উপায় থাকতে সে এরকম একটা জটিল উপায় বেছে নেবে, এত কিছু ভেবে সবকিছু করবে, সেটা ভাবতেই কষ্ট হচ্ছিল। ঠান্ডা মাথায় ওর পক্ষে এভাবে কিছু করা অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল লিসার।

কিন্তু এক প্লাস এক অনেক সময় দুইয়ের বেশি হয়। এক্ষেত্রে সেটাই হয়েছে। পলের মেয়ে এমিলি বেশ ইন্টেলিজেন্ট। কথায় কথায় যতই মেরির উপর ভালোবাসা দেখাক-না কেন, ও যে বেশ খুশি হয়েছে মেরির মৃত্যুতে তা বোঝা শক্ত ছিল না। একই সঙ্গে পড়াশোনায় বেশ ভালো। এ বিষয়ে অনেক কিছু জানে।

আসল লিড এল কয়েকদিন আগে।

এমিলির সঙ্গে ইদানীং এক রিসার্চ স্টুডেন্টের ভালো আলাপ হয়েছে। বয়ফ্রেন্ড। সে আবার বিষের উপরে গবেষণা করছে। তার ল্যাব থেকে বেশ কিছুটা থ্যালিয়াম পাওয়া যায়। তবে মনে হয় না সে ছেলেটা এর সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিল। সেটার দরকারও ছিল না। এমিলির পক্ষে ওই ল্যাবের মধ্যে আসা কিছু শক্ত ছিল না। পলের মেয়ে এমিলি যদিও এ বিষয় সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। কিন্তু খুনি তো কখনোই তার খুনের কথা এত সহজে স্বীকার করে না। কতটা থ্যালিয়াম এভাবে সে সরিয়েছিল, সেটা অবশ্য বোঝা যায় নি।

শুধু তা-ই নয়, ঘটনার দিন কোক সবাইকে দিয়েছিল পলের মেয়ে এমিলি। সেটা মেরির ছোটোছেলে বলেছে। এমিলিও অস্বীকার করেনি। সেদিক থেকে ওর থেকে ভালো সুযোগ আর কারো ছিল না। ও হয়তো নিজে খুব সামান্য কোক নিয়েছিল, যাতে কিছুটা অসুস্থ হয়। সন্দেহের বাইরে থাকে।

একই সঙ্গে পল ওর মেয়ে এমিলিকে খুব ভালোবাসত। বাবার নির্দেশে এরকম কিছু করা ওর পক্ষে শক্ত ছিল না। পল অকুস্থলে ছিল না। কিন্তু নিশ্চয়ই এ কাজে, বিশেষ করে কোকে থ্যালিয়াম মেশানোর মতো টেকনিক্যাল কাজে ও আগেই সাহায্য করেছিল।

মাইকের কথা ঠিক। সব ইনভেস্টিগেশনেই কিছু প্রশ্ন থেকে যায়। এখানেও তাই হয়তো কিছু প্রশ্ন থেকে যাবে।

পাব-এ বিয়ার নিয়ে একটা টেবিলে একাই বসেছিল লিসা। টিভি স্ক্রিনে বেসবল দেখাচ্ছে। বসে বসে দেখছিল। হঠাৎ মনে হল, দূর থেকে এক ভারতীয় ছেলে ওর দিকে তাকাচ্ছে। আগেও যেন কোনদিন এই ছেলেটাকে দেখেছে লিসা। বেশ আকর্ষণীয় দেখতে। চোখ দুটো খুব উজ্জ্বল, যেন অনেকটা টম ক্রুসের মতো দেখতে। একবার দেখলে বার বার আপনা থেকে চোখ চলে যায়। কিন্তু আবার দেখতে গিয়ে চোখে পড়ল না। উঠে দাঁড়াল লিসা। না, ছেলেটা এখান থেকে কখন বেরিয়ে গেছে।

কিছু প্রশ্ন এখনও ওর মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। পল বা এমিলির পক্ষে কি কোকের বোতলে থ্যালিয়াম মিশিয়ে আবার করে সিল করা সম্ভব ছিল?

এমিলি কি জেনে-বুঝে সাংঘাতিক বিপদের কথা জেনেও ওই কোক খেতে পারত? ওকেও তো হাসপাতালে যেতে হয়েছিল। অবশ্য ও জানত, সন্দেহের বাইরে থাকতে ওকেও খেতে হবে, কিছুটা অসুস্থ হতে হবে।

কিন্তু লিসা আদালতে প্রমাণ করতে পারবে তো? তবে এক, সব ক-টা গ্লাসেও কোকের বোতলে পাওয়া ফিঙ্গারপ্রিন্ট এমিলির সঙ্গে মিলে গেছে। তা ছাড়া ও নিজেই সবাইকে কোক দেওয়ার কথা স্বীকার করেছে। দুই, ওর বিষ মেশানোর সুযোগ ছিল। তিন, পল নিজে মাইনিং-এর কোম্পানিতে ড্রিলারের কাজ করে! ওর পক্ষে তো কোকের বোতলে এরকমভাবে ছোটো ফুটো করে মেশানো অবশ্যই সম্ভব। ঠিক যেরকম এখানে হয়েছিল।

নিশ্চিন্ত হয়ে আবার বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিল লিসা। দিনের শেষের গোধূলির রং-মাখা একটা মিষ্টি হাওয়া বইছে। নানান পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে। বসন্ত খুব দূরে নেই।

৮

১১ ফেব্রুয়ারি ২০২০, সকাল ১০টা, মধ্যমগ্রাম

রাহুলের ডাকে ঘুম ভাঙল। ও দেখি, আমার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। মুখে একটু যেন রহস্যময় হাসি।

চমকে উঠে বসলাম।

ও হাসতে হাসতে বলে উঠল, কাল অনেক রাতে ঘুমিয়েছিস নিশ্চয়ই। তুই তো এত দেরি করে ওঠার ছেলে না। মুখ ধুয়ে চলে আয়। রান্নার মাসিকে তোর ফেভারিট মাংসের কিমা দিয়ে মোগলাই পরোটা করতে বলেছি। রেডি হল বলে!

কী বলব! চুপ করে থেকে একটু অপ্রস্তুতের হাসি হাসলাম। হেসেই মনে হল যেন কীরকম একটা মেকি হাসি হাসলাম। একরাতে, শুধু একটা রাতে যেন অনেক কিছু পালটে গেছে। সত্যি বলতে কী তখনও মনে হচ্ছিল, একটা খারাপ স্বপ্ন দেখছিলাম। ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে যেন বাস্তব ফিরে পাচ্ছি। কোনো ভিত্তি নেই। রাহুল এসব করতে পারে না।

আড়মোড়া ভেঙে উঠে প্রথমে ফোনটাই দেখলাম। না, ফোন লক করা আছে। কী ছবি তুলেছি, সেটা রাহুলের পক্ষে দেখা সম্ভব ছিল না। কিন্তু পরক্ষণেই চমকে উঠলাম। বুককেসের ড্রয়ারে চাবি আর লাগানো নেই। চাবিটা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। তাহলে কি ব্যাপারটা বুঝতে পেরে গেছে ও, আমাকে কোনোরকম সন্দেহ করেছে? সেক্ষেত্রে কি আমার ওর সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলা দরকার?

খানিক বাদে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে দেখি, ও ড্রয়িং রুমের খাওয়ার টেবিলে বসে আছে। মন দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছে।

টেবিলে বসলাম, কিন্তু কীরকম যেন দ্বিধা নিয়ে। গলা যতটা সম্ভব স্বাভাবিক করে বলে উঠলাম, শরণ্যার কোনো খবর পেলি?

ও আমার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে চিন্তান্বিত গলায় বলে উঠল, না, এখনও পাইনি। আমি-ও তাই ভাবছিলাম। কী হয়ে থাকতে পারে! খানিক আগে পুলিশ আবার আমাকে ফোন করেছিল। স্বাভাবিকভাবেই ওরা আমাকেও সন্দেহের তালিকায় রেখেছে। আরেকটা ঘটনাও হয়েছে, সুরজিৎকে পাওয়া যাচ্ছে না।

এবার আমার চমকে ওঠার পালা।

—মানে? সুরজিৎ? শরণ্যার সেই বয়ফ্রেন্ড? এ আবার কখন জানলি?

—ওই এখনই। ফোন করেছিল সে ব্যাপারে। ওকে চিনি কি না? ফোনে যা কথা হল মনে হল, থানা থেকে ইনস্পেকটর এ বাড়িতেও আসবে। সকালেই আসবে।

—কাল তুই বললি যে ওর কথা তুই পুলিশের কাছে বলিসনি! তাহলে সুরজিতের কথা পুলিশ জানল কী করে? শরণ্যার বাড়ির লোকেরা বলেছে?

—তা-ই হবে হয়তো। নিশ্চয়ই তারপর থেকে পুলিশ ছেলেটার খোঁজ করেছে।

—তা কবে থেকে পাওয়া যাচ্ছে না?

—ওই পরশু রাত থেকে।

—বলিস কী! একই সময় থেকে? মানে দুজনে একসঙ্গে উধাও! আজব ব্যাপার। সুরজিতের বাড়ির লোকেরা কিছু বলেছে?

—সে আমি কী করে জানব? বুঝতেই পারছিস, আমাকে পুলিশ সবকিছু বলবে না। সুরজিতের সঙ্গে ভালোমতো জড়িয়ে আছে মনে হচ্ছে।

—কিন্তু ওর শরণ্যাকে নিয়ে পালানোর কী দরকার পড়ল?

কথার মধ্যে দেখি, মাসিমা খাওয়ার ঘরে ঢুকছেন। রাহুল চোখের ইশারায় আমাকে ইঙ্গিত করল, যাতে এ ব্যাপারে আর কোনো কথা না বলি।

আমাকে দেখে মাসিমা বলে উঠলেন,— সকাল থেকে কি দুই বন্ধুর মধ্যে খুব আড্ডা চলছে?

রাহুল বলে উঠল,—না, না, আড্ডা আর কোথায় হল। বাবুর উঠতে উঠতে দশটা বেজে গেল। এই এখনই কথা শুরু হল। —বলে একটা চেয়ার টেনে মাসিমাকে বসতে দিয়ে বলে উঠল,—বোসো মা। পুজো হয়ে গেল?

—হ্যাঁ, আমার আর পুজো। বাড়িতে বউমা নেই, নাতনি নেই, পুজো করে কী আর চাইব? — দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

—আবার মা, সেই এককথা।

—যা-ই হোক, কাল একবার ওদের বাড়ি ঘুরে আসিস। বউমা আর রিনির জন্য নারকেল নাড়ু করেছি। মেয়েটা খুব নাড়ু খেতে ভালোবাসে। দিয়ে আসিস।

বুঝলাম, মাসিমা খবরটা এখনও জানেন না যে শরণ্যাকে পাওয়া যাচ্ছে না। সেক্ষেত্রে এ বাড়িতে পুলিশ এলে ওঁর পক্ষে এ খবরটা আরও শকিং হবে। তা ছাড়া যদি এটা জানতে পারেন যে সংগত কারণেই পুলিশ রাহুলকে সন্দেহ করছে।

মোগলাই এসে গিয়েছিল। মাসিমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে ও মোগলাই খেতে খেতে গত রাতের সব কথা দুঃস্বপ্নের মতো ভুলে গিয়েছিলাম।

—তা তুমি আজ থাকছ তো?

—না মাসিমা, আমাকে আজ যেতেই হবে। এই সকালেই যেতে হবে। আসলে প্ল্যান করে আসিনি।

—তোমাদের আজকাল সবকিছুতে প্ল্যান লাগে। রাহুল গত পরশু সন্ধেতে দারুণ দু-কেজির ইলিশ এনেছে। ওরকম চট করে পাওয়া যায় না। আমি রান্না করব। খেয়ে যাও।

—দু-কেজির ইলিশ? ওরেবাবা! সে আবার কোথায় পেলি?— রাহুলকে জিজ্ঞাসা করে উঠলাম।

উত্তর অবশ্য রাহুলের কাছ থেকে এল না। উত্তর এল মাসিমার কাছ থেকে—দমদম বাজার থেকে পরশু সন্ধেতে বাজার করে এসেছে। আমাদের মধ্যমগ্রামের বাজারে এত ভালো মাছ পাওয়া যায় না। দমদমেও পাওয়া যায় না। সেদিন নেহাত পেয়েছে।

দমদম। পরশু সন্ধে। এটুকু শোনার পরে আর ইলিশ মাছ খাওয়ার ইচ্ছে হয়নি। তার মানে রাহুল গত পরশু দমদমে গিয়েছিল। এই কথাটা আমাকে এতক্ষণ বলেনি কেন? তবে কি ওর কোনো যোগাযোগ আছে শরণ্যার উধাও হয়ে যাওয়ার ঘটনার সঙ্গে!

বেশিক্ষণ ছিলাম না আর। আধ ঘণ্টা বাদে বেরিয়ে এলাম। রাহুল ফ্ল্যাটের দরজা অব্দি এসেছিল।

গাড়িতে বসে গাড়ি চালাতে শুরু করতে গিয়ে বুঝলাম, হাত কাঁপছে। অতীতের অনেক কিছু মনে পড়ে যাচ্ছে। ছবিগুলো চোখের সামনে ভাসছে। চুপ করে খানিকক্ষণ বসে রইলাম।

কাল রাতের বৃষ্টির পরে গরম কমে গেছে। কিন্তু বুঝতে পারলাম, তবু আমি ঘামছি। রাহুল দমদমে যাওয়ার এ কথা আমার থেকে লুকোল কেন? সেদিন কি ওর সঙ্গে শরণ্যার দমদমে

দেখা হয়েছিল? সেদিন ওখান থেকেই তো উধাও হয়ে গেছে। আর সুরজিৎও কি রাহুলের জন্যেই কোনো বিপদে পড়েছে? নাকি শুধুই বেশি ভাবছি?

রাহুল কি বুঝে গেছে যে আমি কিছুটা জেনে গেছি? একটা এত বড়ো ক্রিমিন্যাল কি আমার বেস্ট ফ্রেন্ড?

এসব ভাবছি, হঠাৎ কিছুটা নামানো গাড়ির জানলার কাচে টোকা। ভূত দেখার মতো চমকে উঠলাম। কখন জানি না রাহুল আমার গাড়ির জানলার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

—কী, কিছু অসুবিধে হয়েছে?

আমি অপ্রস্তুতের হাসি হেসে বলে উঠলাম, না, আসলে এত সকালে এরকম ভারী খাওয়ার অভ্যেস নেই তো, তাই শরীরটা কীরকম করছে।

—তা ভেতরে একটু বসে যা।

—না, না, আর দেরি করব না। এখন যেতেই হবে। এরপরে আবার রাস্তায় জ্যাম হয়ে যাবে।

বুঝতে পারছিলাম, আমার অনেক কথার মধ্যেই ঠিক যুক্তি নেই। আজ রোববার। কিন্তু কেন জানি রাহুলকে ভয় লাগছিল। অপরাধী বলে মনে হতে শুরু করেছিল।

ঠিক যে জিনিসটা ভাবছিলাম, সেটা ও-ই বলে উঠল,—আসলে তোকে একটা কথা বলতে এলাম। আমার সঙ্গে সেদিন দমদমের বাজারে শরণ্যার দেখা হয়েছিল। কেন জানি পুলিশকে বলতে ভরসা পাইনি। তাই তোকেও বলিনি। আমার ধারণা, ওরা তোকেও আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করবে। এ কথাটা বলিস না।

আমি শুকনো মুখে কোনো কথা না বলে শুধু মাথা নাড়লাম। তারপরে ওকে হাত নেড়ে গাড়ি স্টার্ট করলাম। গাড়ি একটু গোঁ গোঁ করে উঠল, কিন্তু ব্যাক করল না। খেয়াল করলাম, এতটাই নার্ভাস হয়ে গেছি, যে গাড়ি গিয়ারে না দিয়ে নিউট্রালে রেখে শুধু অ্যাক্সিলারেটরে চাপ দিয়েছি। অটোম্যাটিক গাড়ি। বুঝতে পারছি, রাহুলের চোখে ধরা পড়ে যাচ্ছি। মাথা ঠান্ডা করে রিভার্সে দিয়ে এবারে সাবধানে গাড়ি পার্কিং থেকে বার করলাম।

হাত নেড়ে গলা যতটা সম্ভব স্বাভাবিক করে বললাম, ভালো থাকিস।

কেন বললাম তাও জানি না।

গাড়ি ওর বাড়ি থেকে বেরিয়ে যখন যশোর রোডে এসে পড়ল, বুঝতে পারলাম, এ অবস্থায় চালানো ঠিক হবে না। একটা মিষ্টির দোকানের সামনে দাঁড় করিয়ে খানিকক্ষণ বসে রইলাম। একটা রাতে অনেক কিছু পালটে গেছে।

দুটো জিনিষস এখন মাথার মধ্যে ঘুরছে। প্রথম, রাহুলের সঙ্গে তার মানে শরণ্যার পরশু রাতে দেখা হয়েছিল। তার পর পরই ওকে পাওয়া যাচ্ছে না। ওদের সম্পর্ক কি আরও খারাপ হয়েছিল ইদানীং? কেন এ কথা আমার কাছে লুকিয়ে গেল রাহুল? বা পুলিশের কাছেও? একই সঙ্গে সুরজিৎ উধাও! মাসিমা না বললে জানতেও পারতাম না যে ও সেদিন দমদমে বাজার করত গিয়েছিল। সেটা আমার সামনে বলে ফেলার জন্যেই রাহুল স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে।

দুই, সুরজিতের কথা বলতে ও এত দ্বিধা করছিল কেন? সুরজিতও কি বিপদে?

রাহুল যদি আগের ঘটনাগুলোর সঙ্গে যুক্ত থেকে থাকে, তাহলে ওর কাছে আরও কয়েকটা খুন করা কিছুই শক্ত নয়। হয়নো একটা বড়ো অচেনা সিরিয়াল কিলার এখন রাহুলের মধ্যে দিয়ে উঁকি মারছে। এবারে কি সব জেনে গেছি বলে আমি ওর শিকার হতে চলেছি? কিছু কথা মনে পড়ছিল।

গত বছরে শরণ্যা কি এ কথাই বলতে চেয়েছিল রাহুল সম্বন্ধে? কিন্তু তখন পরিস্থিতি অন্যরকম ছিল বলে রাহুল সম্বন্ধে এরকম কোনো কথা মাথায় আসেনি।

চমকে উঠলাম। গাড়ির হর্ন। একটা গাড়ি পিছনে দাঁড়িয়ে হর্ন দিচ্ছে। এখানে আর দাঁড়ানো যাবে না।

৯

১১ ফেব্রুয়ারি ২০২০, বিকেল ৪টা

ঘুম ভাঙল গার্গীর ডাকে। চোখে এখনও ঘুম জড়িয়ে।

ও একটা লাল ম্যাক্সি পরেছে। ঠোঁটে লাল লিপস্টিক। 'লিপস্টিক এফেক্ট' বলে একটা কথা আছে। নাকি ইকনমিক রিসেশনের সময় লিপস্টিকের চাহিদা বেড়ে যায়, যাতে মহিলারা আরও আকর্ষণীয় দেখতে হয় ও তার উপর নির্ভর করে সহজে চাকরি পেতে পারে?

সেটা অবশ্য পুরোপুরি গার্গীর ক্ষেত্রে খাটে না। তবে পরার পিছনে সেইরকম কোনো একটা উদ্দেশ্য আছে। আমার সঙ্গে ফের কথা বলার চেষ্টা করা।

বাড়ি ফেরার পর থেকে বিশেষ কথা বলেনি। যা জিজ্ঞেস করছিলাম, সামান্য দু-একটা শব্দের উত্তরে বুঝিয়ে দিচ্ছিল যে ও কথা বাড়াতে চায় না। আমি আবার এসব বিষয়ে রাগ ভাঙতে খুব একটা পারি না। বুঝতেই পারছিলাম ওখানে রাত কাটিয়ে ফেরাটা একদম পছন্দ হয়নি। ছেলের উপরের রাগটা এখন আমার উপরে মেটাবে। তার পরীক্ষার প্রিপারেশন যত খারাপ হবে, আমার উপর ঝড়ঝাপটা তত বাড়বে।

কিন্তু লাল ম্যাক্সি আর লিপস্টিক ভালো লক্ষণ। ঝড় থামার পূর্বলক্ষণ। মেজাজ তাহলে একটু ঠান্ডা হয়েছে। ও চাইছে, আবার আমি কথা বলা শুরু করি। ওর দিক থেকে এখন ভাব করার চেষ্টা করছে। কথা বলা তার একটা পূর্বাভাস।

ঠিক তা-ই। এরকম সময়ে আরেকটু কঠিন হতে হয়। তাতে যে কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন হয়, তাতে রাগ খুব তাড়াতাড়ি অনুরাগে পরিণত হয়।

আমাকে একটু রাগত গলায় বলে উঠল,আর কত ঘুমোবে? ছুটির একটা দিন বন্ধুর বাড়িতে কাটিয়েছ। আরেকটা দিন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দাও। কাল থেকে আবার অফিস। কথা বলার কোনো সময় নেই। ছেলে পাশ করল না, ফেল করল, কী এসে যায়। আমারই সব দায় পড়েছে। আমারও তোমার মতো পাঁচ দিন অফিস থাকে। কিন্তু সাত দিন কাজ।

বুঝতে পারলাম। এটা এখন ঠিক সময়। মাটি সামান্য নরম হয়েছে। নির্ঘাত বাইরে কোথাও বেড়াতে যাওয়ার মতলবে আছে। বলে উঠলাম,— না, অনেক কাজ আছে। তবে তুমি কোথাও যেতে চাও?

—আর কি সময় হবে? এই এখনই তো ছ-টা বাজে। এখন আর কোথায় যাবে?

—কেন? এখনও অনেক জায়গাতেই যাওয়া যায়। চলো, চট করে মনিস্কোয়্যার ঘুরে আসি।

বুঝলাম। কথাটা মনে ধরেছে। মুখের ছায়া-ছায়া ভাবটা মুহূর্তে কেটে গেল।

বলে উঠল, ঠিক আছে। আমি চা করছি। তুমি তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নাও।

বলে একটু থেমে বলে উঠল, ও, ভুলে গিয়েছিলাম। তোমার ফোনটা বাইরে পড়ে আছে। রিং হচ্ছিল কয়েকবার। দুবার দেখলাম, রাহুল ফোন করেছে। এখনও বন্ধুর সঙ্গে সব কথা শেষ হয়নি হয়তো।

—তা তুমি ধরোনি?

—আমি সেকেন্ড টাইম ধরেছিলাম। তুমি একবার ওকে ফোন করো। কিছু একটা কথা আর্জেন্টলি বলতে চায়। বেশিক্ষণ বোলো না আবার।

কথা বলতে বলতে ও বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

আমি আরেকটু গড়াগড়ি করে উঠে পড়লাম। গার্গীকে তো আর বলা যাবে না যে গতকাল রাতে প্রায় ঘুমই হয়নি। ভোরের দিকে শুধু ঘণ্টা তিনেক ঘুমিয়েছি। এখনও ব্যাপারটা ভাবলে কী করব, বুঝে উঠতে পারছি না। একেই বোধহয় ধর্মসংকট বলে।

এমন একটা কথা, যা কাউকেই বলা যাবে না। বলার পরে সেটা খুব সহজেই ছড়িয়ে পড়তে পারে। গার্গীর থেকেও। এমন কিছু আমি করার কথা ভাবতে পারি না, যাতে রাহুল সামান্যতম বিপদে পড়ে। যখনই বিপদে পড়েছি, রাহুলকে সঙ্গে পেয়েছি। এই তো কিছুদিন

আগের কথা। বেশ কয়েক বছর আগে একটা জমি কিনেছিলাম একটা নামকরা প্রোমোটারের থেকে।

কথা ছিল, কটেজ তৈরি করে দেবে। পরে বোঝা গেল পুরো ব্যাপারটাই ধাপ্পা। ওদিকে আমি আমার সঞ্চয়ের একটা বড়ো অংশ সেখানে দিয়ে বসে আছি। টাকা ফেরত পাব এমনও কোনো আশা নেই। শেষে রাহুলই নানান জায়গায় ঘুরে, শেষে কনজিউমার ফোরামে গিয়ে অনেক কিছু করে আমার টাকা ফেরত পাওয়ার ব্যবস্থা করে। ও সঙ্গে না থাকলে আমি কিছুই পেতাম না।

ফোনটা দেখলাম।

একটা অচেনা নাম্বার থেকে দুবার ফোন। তারপরে রাহুলের নাম্বার থেকে ফোন।

রাহুলকে ফোন করলাম। বেশ খানিকক্ষণ রিং হয়ে গেল। কেউ ধরল না।

ফোনটা রেখে দিয়ে অন্য কাজে যাচ্ছিলাম, আবার ফোনটা বাজতে শুরু করল।

একটা অচেনা নাম্বার। ফোন ধরব কি ধরব না ভেবে শেষে ফোনটা নিলাম। উলটোদিকে ওরই গলা।

ধরেই বলে উঠল, ইন্দ্র, একটা খারাপ খবর আছে।

—কী?

—সুরজিৎ মারা গেছে। ওর মৃতদেহ ওর বাড়ি থেকে পাওয়া গেছে।

—বলিস কী? কীভাবে কখন জানা গেল? কী কারণে মনে হচ্ছে?

—জানি না। পুলিশের কাছেই শুনেছি। আমাকে ফোন করেছিল। ওরা মৃত্যুর টাইম বোঝার চেষ্টা করছে। ন্যাচারালি ফরেনসিকসের মাধ্যমে টাইমটা ঠিক ধরে ফেলবে খুব তাড়াতাড়ি।

—কিছু বলল সে ব্যাপারে?

—না। আমাকে সে কথা বলবে না। বুঝতেই পারছিস, আমাকে ওরা সন্দেহ করছে। এসব ইডিয়টের কাছে আমি আর রাস্তার এক গুন্ডা সব একই জায়গায়।

—কিন্তু বাড়িতে মরে পড়ে আছে, আর কেউ খবরটা জানল না। ও কি একা থাকত?

—হ্যাঁ, ওর দেশের বাড়ি বর্ধমানে, যেখানে শরণ্যার বাড়ি। এখানে দমদমে একা থাকত।

—আর শরণ্যা?

—না, তার এখনও কোনো খবর নেই।

—তুই এখন কোথায়? বাড়িতে?

—না, আমি বাইরে থেকে ফোন করছি।

—পুলিশ তোকে ফোন করছিল কেন?

—বুঝতেই পারছিস, ওরা জানার চেষ্টা করছিল, আমার সঙ্গে ওর রিসেন্টলি দেখা হয়েছিল কি না।

—কিন্তু তোর সঙ্গে তো আর সুরজিতের দেখা হয়নি! শেষ কবে দেখা হয়েছিল?

উলটোদিক থেকে ও চুপ করে রইল। পিছনে অনেক লোকের আওয়াজ। মনে হয়, রাস্তার থেকে ফোন করছে। ঠিক শুনতে পেয়েছে তো? আবার প্রশ্নটা করে উঠলাম।

ও আস্তে আস্তে বলে উঠল, পরশু দিন দেখা হয়েছিল। দমদম স্টেশনে শরণ্যার সঙ্গে দেখা হওয়ার পরে আমরা ওর বাড়ি গিয়েছিলাম।

খানিকক্ষণ আমার গলা থেকে কোনো আওয়াজ বেরোল না। ও কি জানে, আমি ওর সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পেরেছি! বোধহয় না, তাহলে এটা ও আমাকেও বলত না। আগে তো এটা ও বলেনি। একটু একটু করে সব বেরোচ্ছে।

যাতে ওর কাছে ধরা পড়ে না যাই, তাই যতটা সম্ভব স্বাভাবিকভাবে বলে উঠলাম,— কিন্তু ওখানে গিয়েছিলি কেন? তোর সঙ্গে কোনোদিন সেরকম আলাপ ছিল না তো!

ও ফের বলে উঠল, শরণ্যা বলেছিল, ওর আর সুরজিতের কিছু দরকারি কথা বলার আছে আমার সঙ্গে। আর্জেন্ট। আমি সুরজিতের বাড়ি যেতে চাইছিলাম না। কিন্তু বার বার বলাতে রাজি হয়ে যাই। ওখানে গিয়ে কথা বলতে চাইছিল। সেজন্য গিয়েছিলাম। বেশিক্ষণ ছিলাম না। মিনিট কুড়ি বাদে বেরিয়ে আসি।

—তুই সেটা বলেছিস পুলিশকে?

—পাগল! আমি শরণ্যার সঙ্গে সেদিন দমদমে দেখা হওয়ার কথাই তো বলিনি! এখন তো সেটা বলাও যাবে না। তা ছাড়া কবে মারা গেছে, সেটাও জানি না। যদি সেই রাতেই কিছু হয়ে থাকে তাহলে কী সাংঘাতিক যে হবে, তা-ই ভাবছি! ভাবছি, কী করা যায়। শোন, তোকে হয়তো পুলিশ ফোন করবে। আমাকে কেন জানি না জিজ্ঞেস করছিল, পরশু রাতে কোথায় ছিলাম? আমি বলেছি যে আমি সন্ধেবেলায় তোর সঙ্গে পার্কস্ট্রিটে ফ্লুরিজ-এ ছিলাম।

—হোয়াট? আর ইউ ক্রেজি? আমাকে জড়াচ্ছিস কেন এর মধ্যে?— জোরে বলেই খারাপ লাগল। বাড়ির অন্য কেউ বা গার্গী শুনে ফেললে কী ভাববে? ফোনটা নিয়ে বারান্দায় চলে এলাম।

রাহুল তো এরকম কথায় কথায় মিথ্যে বলত না। হঠাৎ কী জন্য? নাকি ও সত্যি এতেও ইনভলভড আছে!

—আমার আর কোনো উপায় নেই, ইন্দ্র। বলে ফেলেছি যে তুই সঙ্গে ছিলিস। তোর নাম্বার ওরা চেয়ে নিয়েছে। তোকে ফোন করবে হয়তো এ ব্যাপারে। প্লিজ হেল্প করিস। ফ্লুরিজ মনে

রাখিস। ইচ্ছে করে বলেছি কারণ, ওখানে দুজন কাস্টমারের সংখ্যা বেশি। টাইমটা একটু ভেবে রাখিস। সাড়ে আটটা থেকে ন-টা।

আমি না বলতে পারি না। বিশেষ করে রাহুলের মতো একজনকে। সম্মতি জানিয়ে ফোন রেখে দিলাম।

কিন্তু এবারে আমারই টেনশন হচ্ছে। হঠাৎ করে যেন প্রচণ্ড গরম লাগতে শুরু করেছে। রাহুলের ব্রেন ঠিক সেরকমই শার্প। এত কিছু ভেবে সঙ্গে সঙ্গে বলে দিয়েছে! কিন্তু এখন উপায়?

ইতিমধ্যে ফোন বেজে উঠল। ফোন নিয়ে বাইরে বারান্দায় বেরিয়ে এলাম।

ফোন ধরতে উলটোদিক থেকে খসখসে গলায় কে যেন জোরে বলে উঠল, আপনি কি ইন্দ্রনীল ঘোষ বলছেন?

—হ্যাঁ। আপনি কে?

—আমি দমদম-ঘুঘুডাঙা থানা থেকে ও.সি. মোহিত সরকার বলছি। এখন কথা বলা যাবে?

—হ্যাঁ, বলুন।

—আচ্ছা, আপনি রাহুল সান্যালের বন্ধু, তা-ই তো?

—হ্যাঁ, অফিস কলিগ। —একটু দূরত্ব দেখানোর চেষ্টা করলাম।

—পরশু দিন আপনি কোথায় ছিলেন?

—অফিসে।

—সেটা কোথায়?

—সল্ট লেক সেক্টর ফাইভ।

—তারপরে? সন্ধের দিকে?

—তারপরে বাড়ি। না সোজা বাড়ি অবশ্য না, পার্কস্ট্রিটেএকটু আড্ডা দিয়ে বাড়ি।

—কোথায়?

—পার্কস্ট্রিটে ফ্লুরিজ।

—তা সেখানে আপনার সঙ্গে কি রাহুল ছিল?

—হ্যাঁ। আমরা মাঝেমধ্যেই যাই।

— সল্ট লেক থেকে একেবারে পার্কস্ট্রিট—অতটা দূর— শুধু ওই ফ্লুরিজ-এ খেতে?

—আসলে একটা মাঝামাঝি জায়গা আমার আর রাহুলের বাড়ির মধ্যে। তারপর যা হয় আর কী! মধ্য কলকাতার একটা আলাদা উষ্ণতা আছে তা-ই না!

—হুঁ।

কতটা বিশ্বাস করল কে জানে! কিন্তু আমি এদিকে ঘামতে শুরু করেছি। ধরা পড়ে গেলাম নাকি?

উলটে প্রশ্ন করে উঠলাম, আপনি হঠাৎ করে এসব জিজ্ঞাসা করছেন?

—আসলে একটা মার্ডার কেসের ব্যাপারে। হয়তো আপনার আরও সাহায্য লাগতে পারে।

—কার?

—সুরজিৎ মহান্তি। চেনেন? আপনার বন্ধুর এক্স-ওয়াইফ যার সঙ্গে এখন প্রেম করছিল। একটু থেমে ফের বলে উঠল, আপনার বন্ধুর যে এক্স-ওয়াইফ নিখোঁজ, সেটাও নিশ্চয়ই জানেন?

—হ্যাঁ, সেটা শুনেছি।

—তা আপনার বন্ধুকে কীরকম মনে হয়?

—ভালো। খুব ভালো। কেন?

—না, না। এমনি জিজ্ঞেস করছিলাম। এই আর কী! একটা জিনিস মনে রাখবেন, কোনো ভুল তথ্য দিলে আপনি নিজেও বড়ো বিপদে পড়বেন। কোনো কিছু জানলে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে খবর দেবেন।

আরও কিছু কথা বলার পরে ছেড়ে দিল। মাথা ঘুরিয়ে চমকে উঠলাম। পিছনে গার্গী দাঁড়িয়ে আছে। কতটা কী শুনেছে কে জানে! কিন্তু উলটোদিকে যে ওসি ছিল, সেটা হয়তো বুঝেছে।

ওর দিক থেকে প্রশ্ন এল— কী হয়েছে রাহুলের?

১০

১৬ অক্টোবর ২০০৩, বার্মিংহ্যাম, ইংল্যান্ড

—আজ তোমাদের দুসগাপুজো না! কোথাও যাবে না? সারাদিন অফিস করবে?— জেসিকা ওর কেন্ট অ্যাক্সেন্টের ইংরেজিতে বলে উঠল।

অবাক হয়ে বলে উঠলাম, দুসগাপুজো নয়। দুর্গাপুজো।

—আয়াম সরি। টু ডিফিকাল্ট টুপ্রোনাউন্স ফর মি।

—কিন্তু তুমি কী করে দুর্গাপুজোর কথা জানলে? বইতে পড়েছ?

—না, না। রাহুলের কাছে শুনেছি। —বলে চোখের ইশারায় রাহুলকে দেখাল জেসিকা। মুখে একটা মিষ্টি হাসি।

অফিসে একটা লাঞ্চ করার আলাদা জায়গা আছে। সেখানেই আমি, রাহুল আর জেসিকা একসঙ্গে লাঞ্চ করছিলাম। জেসিকা আমাদের প্রোগ্রামের পি.এম.ও. বা প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট অফিসে আছে। রাহুল এই পুরো বিশাল প্রোগ্রামটার প্রোগ্রাম ডিরেক্টর। আমরা দু-বছরের জন্য

ইংল্যান্ডে এসেছি। বার্মিংহ্যামেএকটা বড়ো রিটেলারের অফিস থেকে আমরা কাজ করেছি। এখানে একটা বড়ো বিজনেস ট্রান্সফর্মেশনের প্রোগ্রাম চলছে। সহজভাবে বলতে গেলে ইংল্যান্ডের বিখ্যাত রিটেলার সেন্সবেরির ব্যাবসার খোলনলচে বদলে দিতে পারে এই প্রোগ্রাম। কীভাবে আরও বেশি ক্রেতাদের কাছে পৌঁছোনো যায়, কীভাবে ছোটো ছোটো সংস্থার সঙ্গে পার্টনারশিপে নতুন পণ্য বিভিন্ন ধরনের ক্রেতার কথা মাথায় রেখে চট করে বাজারে আনা যায়, এরকম নানান বিষয়ের উপরে এই প্রোগ্রাম। আরও অন্য দেশের নানান নতুন মার্কেটে ক্রেতাদের কাছে পৌঁছোনোর জন্য।

এরকম ধররে বড়ো পরিবর্তন, যাকে বিজনেস ট্রান্সফর্মেশনে বলে সেটা অনেক সময়ই সংস্থার নিজেদের লোকেদের দিয়ে করা সম্ভব হয় না। এর জন্য অনেক অভিজ্ঞতা লাগে, পরিবর্তন আনতে পারে এরকম নেতৃত্ব অনুঘটক হিসেবে লাগে। সেজন্যই আমাদের মতো স্পেশালিস্ট কনসালটেন্টদের প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে পুরো প্রোগ্রামের চালানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রাহুলকে। রাহুলের সঙ্গেই কাজ করছে সেন্সবেরির একদম উপরমহলের বেশ কিছু কর্তা, যাতে এ প্রোগ্রাম সার্থক হয়।

এসব বড়ো প্রোগ্রামের একটা প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট অফিস থাকে। এক্ষেত্রে ছজনের একটা টিম আছে। যার মধ্যে জেসিকাও আছে। এদের কাজ প্রোগ্রামের প্ল্যানিং, বিভিন্ন মিটিং কোঅর্ডিনেট করা থেকে পুরো টিমের খেয়াল রাখা যাতে তারা ঠিকভাবে কাজ করতে পারে, পরস্পরের সঙ্গে প্রয়োজনমতো যোগাযোগ করতে পারে।

জেসিকা কেন্টের মেয়ে। বলা যায় একদম গ্রামের মেয়ে। শুনেছি, ওদের বাড়িতে অনেক ভেড়া, গোরু আছে। ওর বাবা এখনও চাষবাসের সঙ্গে যুক্ত আছে।

সেজন্য জানি না কি না, জেসিকার মধ্যে এক অদ্ভুত সারল্য আছে। এখানকার অনেকের সঙ্গে একটু ভেবেচিন্তে কথা বলতে হয়। ইংরেজদের একটা অংশের মধ্যে সামান্য রেসিজম আছে। সেটা প্রচ্ছন্ন থাকলেও দূরত্বটা অনেক সময় বোঝা যায়। তাই সহজে মেশা যায় না। জেসিকার মধ্যে সেটা নেই। পাহাড়ি ঝরনার মতোই ওর ব্যবহার। ওকে খুব সহজে বোঝা যায়। একই সঙ্গে ভারত সম্বন্ধে জানতে সব সময় খুব আগ্রহী।

রাহুলই বলে উঠল, আগামীকাল অষ্টমী। সন্ধেবেলায় যাব। যেতে চাও? শাড়ি পরে যেতে হবে কিন্তু।

—শাড়ি, সে আবার কোথাও পাব?

আমি কিছু বলার আগে রাহুল বলে উঠল, সেটা নিয়ে চিন্তা কোরো না। শাড়ি আমি নিয়ে আসব তোমার জন্য। আমার বউয়ের শাড়ি। ওটাই পরে যেতে পারো।

—বাহ, দারুণ হবে তাহলে—বাচ্চাদের মতো খিলখিলিয়ে হেসে উঠল জেসিকা।

জেসিকা বেশ সুন্দরী। এখানে অবশ্য ওর মতো তন্বী সুন্দরী মাঝেমধ্যেই দেখা যায়। কিন্তু সেটা নয়। ওর মুখের মধ্যে একটা অদ্ভুত সারল্য আছে, স্প্যানিশ সুন্দরীদের মতো শরীরে এক লাবণ্য আছে, সেটাই বোধহয় ওর সব থেকে বড়ো আকর্ষণ।

রাহুল ফের বলে উঠল, বেস্ট হবে, কাল অফিসের পরে আমার সঙ্গে আমার বাড়ি চলে আসবে। ওখানে আমার বউ শরণ্যার সঙ্গে তো তোমার আগে থেকেই আলাপ আছে। ও-ই সাজিয়ে দেবে। তারপরে একসঙ্গে আমরা ওখান থেকে পুজোয় চলে যাব।

আমার দিকে ফিরে বলে উঠল রাহুল, পথে তোকে আর গার্গীকেও তুলে নেব। তোদের গাড়িটার কী একটা সমস্যা হয়েছে না!

এটাই রাহুল। সব সময় সবার কথা খেয়াল রাখা। কীভাবে করে, জানি না।

এখানে শুরুতে অনেকেরই পছন্দ হয়নি যে একজন ভারতীয় এসে এরকম একটা বড়ো প্রোগ্রামের একদম প্রধান হর্তাকর্তা হয়ে বসেছে। বিশেষ করে নাক-উঁচু ইংরেজদের এটা একদম পছন্দ হয়নি।

কিন্তু এক মাসের মধ্যে রাহুলের ম্যাজিক্যাল টাচে সব ভেদাভেদ—দূরত্ব মুছে গেছে। কাজের পরিভাষায় আমরা একটা কথা বলি 'চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট'। যখনই এরকম একটা বড়ো প্রোগ্রাম হয়, অনেকের কাজ রাতারাতি অনেকটা বদলে যায়। সেজন্য একটা বড়ো বিরোধিতা আসে। হয়তো কিছু লোককে অন্য কোনো কাজে নেওয়া হবে। অনেক ক্ষেত্রে চাকরি যাওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। এজন্য অনেকেই এ ধরনের প্রোগামকে ঠিকভাবে সাহায্য করে না। এমনিতেও সবাই পরিবর্তনকেই ভয় পায়। সামনাসামনি বাধা না দিলেও নানানভাবে যাতে কাজ না এগোয়, সে চেষ্টা করে। প্রথমদিকে এজন্য এ প্রোগ্রামের কোনো কাজই এগোচ্ছিল না। প্রায় এক বছর একই জায়গায় দাঁড়িয়েছিল।

কিন্তু রাহুল আসার পরে সব বদলে গেছে। ও সংস্থার উপরের স্তরের লোকদের সঙ্গে যেমন কথা বলে তাদেরকে বোঝাতে পারে, তেমনই একদম কর্মীস্তরে গিয়ে খুব সহজে বন্ধুত্ব স্থাপন করে তাদের থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য নিয়ে নিতে পারে। তারা যাতে এ প্রোগ্রামে সবরকম সহযোগিতা করে তা নিশ্চিত করতে পারে। কার কীসে আগ্রহ, কী ব্যাপারে আপত্তি সব জানতে ওর দশ দিনও লাগেনি।

সেদিন শুনলাম, এই প্রোগ্রামের মূল বিরোধী ফিনান্স ডিরেক্টর রবের সঙ্গে ব্যাডমিন্টন খেলে তাকেও ওর দলে টেনে এনেছে।

সেদিন টাউন হলে এখানকার লেবার ইউনিয়নের এক নেতা ওকে এগিয়ে এসে চ্যালেঞ্জ করেছিল, আমাদের যে এর জন্য অতিরিক্ত কাজ করতে হবে, তার বদলে আমরা কী পাব? কিছুদিন বাদে আমাদের অন্য কাজের সন্ধান করতে হবে, তা-ই তো?

আমাদের অফিসের আসা-যাওয়ার পথে কিছু দূরে একটা বন্ধ ম্যানুফাকচারিং প্ল্যান্ট আছে। সেটা একসময় নাকি খুব ভালো ফাউন্টেন পেন তৈরি করত। সারা বিশ্বজোড়া নাম ছিল তার।

রাহুল মুহূর্তের মধ্যে সে প্রসঙ্গ টেনে এনে বলে উঠল, আমরা চাই না যে আমরা ওই সংস্থার মতো হারিয়ে যাই। আমাদের জন্য এ প্রোগ্রাম এতটাই আবশ্যিক যে আমরা যদি না করি তাহলে আমাদের দশাও ওদের মতো হতে চলেছে।

বলে এগিয়ে গিয়ে ওই লোকটার হাত থেকে ফোনটা নিয়ে বলে উঠল, আগামীকাল তুমি নিজেও চাইবে, যাতে এই ফোন থেকে তুমি যেকোনো জিনিষস অর্ডার দিতে পারো, দোকানে না গিয়েই। এটা কিন্তু তুমি আগে ভাবোনি। আমাদের প্রয়োজন বদলে যাচ্ছে, কিন্তু আমরা নিজেদের বদলাতে শিখিনি। সেখানেই একটা সংস্থা সেরা হয়ে ওঠে, কেউ টিঁকে থাকে, কেউ হারিয়ে যায়। আমি চাইব, তোমার মতো নেতা এ পরিবর্তনে নেতৃত্ব দাও, যাতে আমরা ঠিক পথে এগোই। এ পরিবর্তন তোমার—তোমাদের।

সহজ কথায় রাহুল বুঝিয়ে দিল যে এই পরিবর্তনের দায়িত্ব সবার, এবং এর জন্য ও সবার কাছ থেকে একই রকম সাহায্য চায়।

শুধু ওর কথায় নয়, ওর হাবেভাবেও এমন কিছু থাকে, যা সব দূরত্ব এক মুহূর্তে মুছে দেয়। এখন দেখি, সেই ইউনিয়ন লিডার লোকটা মাঝেমধ্যেই এসে ওকে নতুন নতুন আইডিয়া দেয়। এ প্রোগ্রাম রাতারাতি সবার স্বপ্নের প্রোজেক্ট হয়ে উঠেছে। এমনকী অনেকে নির্ধারিত সময়ের বাইরে রাত অব্দি কাজ করে নিয়মিত। এককথায় যাকে বলা যায় রাহুলের ম্যাজিক।

তবে জেসিকাকে শাড়ি পরলে বেশ ভালোই লাগবে। কে জানে, রাহুল এখানে কয়েক বছর থাকলে হয়তোএখানকার মেয়েদের মধ্যে শাড়ি পরা চালু হয়ে যাবে।

১১

২৪ অক্টোবর ২০০৩, রাহুলের বাড়িতে, কেনিলওয়ার্থ, ইংল্যান্ড

শনিবার। এই একটা দিন আমরা হয় রাহুলের বাড়িতে, না হয় আমার বাড়িতে সবাই মিলে আড্ডা দিই। আমরা থাকি কেনিলওয়ার্থে। এটা মূলত উচ্চবিত্তদের শহর। বার্মিংহ্যামের কাছে। ১০০০ সাল নাগাদ গড়ে-ওঠা খুব পুরোনো শহর। আগেকার দিনের কাঠের কাজ করা টিউডর স্টাইলের অনেক বাড়ি শহর জুড়ে। এখানে বিখ্যাত কেনিলওয়ার্থ ক্যাসল আছে, যেখানে রানি

প্রথম এলিজাবেথ বেশ কয়েকবার এসেছিলেন তাঁর বন্ধু 'আরল অফ লেস্টার' রবার্ট ডাডলের সঙ্গে দেখা করতে।

শহর জুড়ে বেশ কিছু পুরোনো দিনের দোকান, ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস, পাব, রেস্টুরেন্ট, চার্চ। সবকিছুই আছে পুরোনোর সঙ্গে ভারী সুন্দর গা মিলিয়ে। বেশ ছিমছাম শহর। বার্মিংহ্যামের মতো প্রচুর লোকের ভিড় এখানে নেই। শুধু আছে পাথরের রাস্তায় অতীতের রহস্যময়তা, বর্তমানের অভিজাত উপস্থিতি।

এখানে এখন দিনের বেলা খানিকটা কমে এসেছে। শীত পড়ছে। আজ আবার তার মধ্যে মন-খারাপ-করা ঝিরঝিরে বৃষ্টি। ঘোলাটে বর্ণহীন আকাশ। অনেক সময় শনিবারে দূরে একসঙ্গে কোথাও বেড়াতে চলে যাই। আজ সে উপায় ছিল না।

পুজোর পরে প্রথম দেখা। শরণ্যা আজ হলুদ রঙের লালপাড় শাড়ি পরেছে। খুব সুন্দর লাগছে ওকে ওই শাড়িতে।

আমাদের জন্য আগে থেকেই ঘুগনি আর শিঙাড়া করে রেখেছিল শরণ্যা। খেতে খেতে আড্ডা শুরু হল।

গার্গী কথায় কথায় হেসে বলে উঠল রাহুলকে, দাদার সেক্রেটারিকে দেখতে কিন্তু খুব সুন্দর। জেসিকাকে ভারী সুন্দর লাগছিল শাড়িতে। দারুণ ফিগার। তোর শাড়ি ছিল ওটা, তা-ই না? —জিজ্ঞেস করে উঠল শরণ্যাকে।

—হ্যাঁ, ওরা অফিস থেকে এখানে এসেছিল। শাড়ি আগে কোনোদিন পরেনি। হিমশিম খাচ্ছিল। আমি পরিয়ে দিলাম। মেয়েটা বেশ ভালো। একদম ছেলেমানুষ। ওর আমাদের মতো কোনো লজ্জা নেই। তবে শাড়িতে তেমন কিছু লাগছিল না। ওদের পোশাকেই ওদের বেশি মানায়।—শরণ্যা জানায়।

রাহুল বলে উঠল, ও কিন্তু আমার সেক্রেটারি নয়। ও আমাদের প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট অফিসে কাজ করে। এরকমভাবে যে নারীমূর্তি দিয়ে দুর্গাপুজো হয়, সঙ্গে আবার অসুর থাকে — এসব নিয়ে খুব ইন্টারেস্ট। আমাকে পরের দিন অফিসে নানা প্রশ্ন করছিল এসব নিয়ে। দশ হাত কেন, দশ হাতে কী কী আছে, কেন আছে। এসব নানান প্রশ্ন।

—দেখো আবার বেশি কথা বোলো না। তুমি এত সুন্দর কথা বলো যে আবার না তোমার প্রেমে পড়ে যায়।—গার্গী মজা করে বলে।

শরণ্যা আড়চোখে রাহুলের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, ঠিকই বলেছ। চিন্তা হচ্ছে এখন। প্রেমে আবার পোড়ো না। চোখে চোখে রাখব।

হেসে বলে উঠল শরণ্যা।

শরণ্যা ফের বলে উঠল, রাহুলের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যে সব মেয়েই চট করে প্রেমে পড়ে যেতে পারে। আমাকে তাই ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়।

গার্গী বলে উঠল, হ্যাঁ। একদম। —হেসে বলে উঠল, তা তুমিই বা কম কীসে। তোমার মতো সুন্দরী বউ থাকতে অন্য কারো দিকে কেন তাকাবে রাহুলদা? তা ছাড়া, শরণ্যার মতো এত গুণী মেয়েই বা কজন হয়! সবকিছুতেই এক্সপার্ট।

কথাটা ঠিক। শুধু ভালো রান্না করা, ভালো গান গাওয়া, ভালো নাচতে জানা এসবই নয়, শরণ্যা খুব সুন্দর ঘর সাজানোর জিনিষ বানায় নানান ছোটোখাটো ফেলে-দেওয়া জিনিস দিয়ে। আজই দেখলাম, একটা কী সুন্দর টেবিল ল্যাম্প বানিয়েছে নানান জিনিস দিয়ে, যার মধ্যে জলের বোতলও আছে।

রাহুল একটু অপ্রস্তুতের হাসি হেসে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল, আজ বেশ প্ল্যান করে আমাকে অ্যাটাক হচ্ছে তো! অন্য প্রসঙ্গে যাই। ভাবছিলাম, দু-সপ্তাহ পরে লং উইকএন্ডে লেক ডিস্ট্রিক্ট গেলে কীরকম হয়? আমার গাড়িতেই সবাই চলে যাব। ইন্দ্রর আর ড্রাইভ করতে হবে না।

—বাহ বেশ, দারুণ হবে ব্যাপারটা। আমার ড্রাইভ করতে ভালো লাগে না। বিশেষ করে ভালো ড্রাইভার পাচ্ছি যখন, তখন যাওয়াই যায়। —মজা করে বলে উঠলাম।

—তা তোমার মেন্সার মিটিংটায় যেতে হবে না! ওটা তো ওই শনিবারে ফেলেছে।—শরণ্যা বলে ওঠে।

—ভালো মনে করেছ। হ্যাঁ। ওটা একটু কথা বলে নিতে হবে। মনে হয় না কোনো অসুবিধে হবে।

—মেন্সার—সেটা কী?

—আরে, মেন্সার নাম শুনিসনি? আমি ওই ধাঁধা, পাজল এসব ভালো লাগে বলে ওদের একটা কম্পিটিশনে নাম দিয়েছিলাম। যা-ই হোক, আমাকে সিলেক্ট করেছে। ওদের মেম্বারদের একটা রেগুলার মিটিং হয়। মাসে একবার করে। আমরা যাই।

পাশ থেকে শরণ্যা বলে ওঠে, ও একটু বিনয় করে বলছে। এটা হল একটা অত্যন্ত হাই আই. কিউ.—মানুষদের ক্লাব। মেম্বারশিপ পাওয়া আদৌ সহজ নয়। নানান সব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় ওদের ওখানে।

—তা-ই নাকি? সে তো দারুণ ব্যাপার।

শরণ্যা ফের বলে ওঠে,— ওকে আবার ওখানে মার্ডার মিস্ট্রির উপরে কিছু আলোচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ওই দিনে।

—বাহ, ওটা তো ওর ফেভারিট টপিক।

এ বিষয়ে বলে রাখি, আমার এই বন্ধুটি অত্যন্ত হাই আই. কিউ.-এর-এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। অনেক সময় আমাকে বেশ অপ্রস্তুতে পড়তে হয় ওর জন্য। এত তাড়াতাড়ি সবকিছু বুঝে ফেলে যে আশপাশের লোকেদের একটু ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্সে ভোগা খুব স্বাভাবিক। তার মধ্যে আবার ওর সাংঘাতিক বই পড়ার শখ। বিশেষ করে মার্ডার মিস্ট্রির। আগাথা ক্রিস্টি থেকে এখনকার সব গোয়েন্দা কাহিনির পোকা।

শরণ্যা ফের বলে উঠল,—হ্যাঁ, কথা বলে নিয়ো। সবে জয়েন করেছ, এখনও নিয়মগুলো জানা নেই ঠিক।

—শুধু আমি একা! তোমার কথাটা খুব কায়দা করে চেপে গেলে! উনিও কিন্তু সিলেক্টেড হয়েছেন। মেন্সার মেম্বার। দুজনেরই যাওয়ার কথা।

—ওরেব্বাস! এ তো ডাবল পার্টির ব্যাপার। এসব তো জানা ছিল না।

—শরণ্যা হচ্ছে পাজল এক্সপার্ট। যেকোনো শক্ত পাজল চটপট সলভ করে ফেলে।

শরণ্যা কিছু বলল না। দেখলাম, লজ্জায় ওর কান লাল হয়ে গেছে।

১২

১৪ জানুয়ারি ২০০৪, বার্মিংহ্যাম, ইংল্যান্ড

আজ অফিসে কাজ করতে করতে পাশের জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চোখ পড়ল। রাহুল, সঙ্গে জেসিকা। অফিসের বাইরে কিছুটা বাগান আছে। সেখানে হাঁটছে। একবার মনে হল যেন দুজনে দুজনের হাত ধরেছে। তারপরে মনে হল, রাহুল কী যেন বলছে জেসিকাকে। একটু উত্তেজিত। ওর কথা বলার ভঙ্গি থেকে অন্তত তা-ই মনে হল। তারপরে আবার দুজনে হাঁটতে থাকল। এই হাড় কাঁপানো শীতে বাইরে হাঁটা!

এখানে লাঞ্চের পরে কেউ হাটতে যেতেই পারে। কিন্তু তবু যেন কীরকম লাগল। চট করে এখানকার একজন স্থানীয় মেয়ে একজন ভারতীয় ছেলের এত কাছাকাছি আসে না। জেসিকার কি কোনোরকম দুর্বলতা আছে রাহুলের প্রতি!

হয়তো অস্বাভাবিক নয়। রাহুলকে শুধু যে দেখতে ভালো তা-ই নয়, ওর মধ্যে একটা খুব সহজাত ভদ্রতাবোধ—সৌজন্য আছে, কথাবার্তায় বুদ্ধির ছাপ আছে, যা খুব কমেরই মধ্যে পাওয়া যায়। তার বাইরে ওর আকর্ষণীয় কথা বলার ক্ষমতা, ন্যাচারাল সেন্স অফ হিউমার। কিন্তু একই সঙ্গে আমি রাহুলকে যতটা জানি, তাতে মনে হয়, ও শরণ্যাকে ছেড়ে এক মুহূর্ত থাকতে পারবে না।

কিন্তু এটা কি শুধু জেসিকার দিক থেকে থাকা সম্ভব? নাহ, সেটাও হওয়া সম্ভব নয়। যদ্দূর জানি, জেসিকার এক বয়ফ্রেন্ড আছে। লিভ টুগেদারও করে। এমনকী মাঝেমধ্যে তার ছবিও

আমাদের দেখায়।

অবশ্য এও হতেই পারে, ওরা দুজন শুধু ভালো বন্ধু। শুধু শুধু ভাবছি। ভারতীয় মেন্টালিটি।

খানিক বাদে রাহুল ফিরে এল। একটু মজা করেই বলে উঠলাম, কী রে, জেসিকার সঙ্গে কী গল্প হচ্ছিল?

ও দেখি, উলটে মজা করে বলে উঠল,— এই প্রেম, সুখ-দুঃখের গল্প। শীত কাটিয়ে জীবনে আসন্ন বসন্তে আসার কথা—বলে হেসে বলে উঠল, খুব জানলা দিয়ে দেখা হচ্ছিল। দেখিস, আবার শরণ্যাকে বলিস না। সেদিন ওর সামনে জেসিকার এমন প্রশংসা করেছিস, যে সত্যি আমায় চোখে চোখে রেখেছে।

বলে একটু থেমে ফের বলে উঠল, কী বলছিল আজ, জানিস?

—তোর সঙ্গে বিয়ের কথা?

—হচ্ছে তোর! বলছিল, ভারতীয়রা ধর্ম নিয়ে বেশি কথা বলে না কেন? ধর্ম নিয়ে কথা উঠলেই সবাই কেমন যেন সে প্রসঙ্গ এড়িয়ে যায়। ভালো-মন্দ নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করে না কেন! সেটাই বোঝাচ্ছিলাম।

—কী বললি!

—বলছিলাম যে আমাদের দেশে এত বেশি সংখ্যক অশিক্ষিত লোক আছে যে তারা এ ধরনের আলোচনাকে অন্যভাবে নিতে পারে। শিক্ষা নেই বলে বিশেষ বিশেষ ধর্মের আচার-বিচার—কুসংস্কারগুলো মনের গভীরে ঢুকে গেছে। তাদের মনে হয়, অন্যরকম কিছু আলোচনা হলেই তাদের সে বিশ্বাসে আঘাত হানা হচ্ছে। সেজন্যে আমরা ধর্ম নিয়ে আলোচনা করি না। যাক গে, কাজের কথায় আসি। আমি ওর উপরে একটু খেপেই গিয়েছিলাম আজ। বলে কিনা মার্কের টিম বলেছে, ইউজার ট্রেনিং পরের এক মাসের মধ্যে নিতে পারবে না। আমাকে ভয়ে আগে বলেনি। এত বড়ো একটা খবর। আমি এখনই মিটিং অর্গানাইজ করতে বলেছি। পরের সপ্তাহ থেকেই ট্রেনিং শুরু করতে হবে। তা না হলে পুরো প্রোগ্রাম কয়েক মাস পিছিয়ে যাবে।

—রাজি না হলে! লোকটা খুব পাওয়ারফুল শুনেছি।

—সে যতই পাওয়ারফুল হোক-না কেন, আমার জানা দরকার পরের এক মাসের মধ্যে কী কারণে ওর টিমের আট ঘণ্টার ট্রেনিং সম্ভব নয়। না হলে কী হবে বুঝেছিস, কোনোভাবে ইউজার অ্যাকসেপ্টেন্স টেস্টিং শুরু করা যাবে না। পুরো পলিটিকস। পুরো প্রোগ্রামের উপরে তার প্রভাব পড়বে।

—এসকালেট কর। চিফ অপারেটিং অফিসারের কাছে।

—ধুর, সব কি আর এসকালেট করলে হয়? তাতে কাজ আরও অনেক শক্ত হয়ে যায়। তার থেকে ওদের এমনভাবে বোঝাতে হবে, যাতে 'না' বলার সুযোগ না পায়।

১৩

২১ জানুয়ারি ২০০৪ বার্মিংহ্যাম, ইংল্যান্ড

—জেসিকার সঙ্গে কোনোভাবে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। বলা যায়, কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। —কফির মেশিনে কফি নিতে নিতে রাহুল গম্ভীর গলায় বলে উঠল।

আজ এখানে সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে। ঠান্ডাটাও একটু বেড়েছে। সকাল এখন সাড়ে আটটা। কিন্তু বাইরে তাকালে মনে হচ্ছে, দিন যেন শুরুই হয়নি। এখনও রাতের অন্ধকার। শুধু জানলার বাইরে রাস্তার আলোগুলোর কম্পমান ঘুমন্ত আলো কুয়াশার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে। তারাও যেন চোখ খুলে তাকায়নি। দেখলেই কীরকম যেন মন খারাপ হয়ে যায়। মনে হয়, কবে শীত কাটবে।

তার মধ্যে আবার এরকম একটা খবর।

—কেন, ফোন ধরছে না?

—সে তো গত তিন দিন ধরেই ফোনে পাচ্ছি না। প্রথমে ভাবছিলাম, হঠাৎ করে হয়তো কোনো কারণে বাড়ি চলে গেছে। কিন্তু আজ সকালে ওর বাড়ি থেকে খবর পেয়েছি, ও বাড়িতেও যায়নি।

—বাড়ি তো কেন্টে। কেউ খবর দিল?

—না, আমি গতকালও অফিসে ওকে না দেখে এখানকার এইচ. আর. ম্যানেজার পিটারকে জানিয়েছিলাম। এটাই নিয়ম জানিস নিশ্চয়ই। আমার কাছে কোনো খবর ছিল না। ভাবছিলাম, শরীর খারাপ হল কি না! ওদের কাছেই ওর বাড়ির নাম্বার ছিল। ফোন করে জানা গেল ওর বাবা-মা-ও একই রকম চিন্তিত। রোজ নাকি একবার অন্তত ফোন করত। কিন্তু চার দিন আগে শেষ ফোন করেছিল।

—চার দিন আগে মানে, এই সোমবার। সেদিন তো অফিসেও এসেছিল।

রাহুল যেন একটু খেয়াল করে বলে উঠল, হ্যাঁ, সেদিনই লাস্ট। সেদিন যাওয়ার সময়েও আমার সঙ্গে কথা হয়েছিল। মনে আছে, সেদিন আমাদের অনেক রাত অব্দি মিটিং ছিল। মনে হয়, রাত করেই বেরিয়েছিল।

—ও থাকত কোথায়?

—টাইলস হিল বলে একটা জায়গা আছে, জানিস। ওখানেই। দু-তিন দিন গাড়িতে ড্রপ করেছিলাম বলে চিনি। একটা বাড়িতে ভাড়া থাকত।

—ওখানে ওরা খোঁজ করেছে?

—হ্যাঁ, বাড়িতেও নেই।

—তাহলে এবারে কী করবি?

—এবারে অফিস থেকে ওরা পুলিশে জানাবে। এখানকার নিয়মকানুন ঠিক জানা নেই। তা না হলে আমিই জানাতাম।

—আচ্ছা, ওর এক বয়ফ্রেন্ড ছিল না। তার সঙ্গে কোথাও যায়নি তো?

—না, তার সঙ্গেও ওরা কাল যোগাযোগ করেছে। সে-ও কিছুই জানে না। নাকি এক মাস আগে শেষ দেখা হয়েছে। মনে হল, সম্পর্কে একটু ভাঙন শুরু হয়েছিল। আমারও জেসিকার কথা শুনে মনে হয়েছিল, ছেলেটার সঙ্গে কিছুদিন ওর সম্পর্ক ভালো যাচ্ছিল না।

—তা তোর সঙ্গে এসব পার্সোনাল ব্যাপার শেয়ার করত? ওর সঙ্গে তো গত চার বছর ধরে ডেট করছিল না।

—ধুর, এখানে এরকম হামেশাই হয়। সম্পর্ক গড়ে ওঠে, ভেঙে যায়। সেদিক দিয়ে চার বছর অনেক সময়। অন্য কারোর সঙ্গে ইদানীং সম্পর্ক গড়ে উঠলেও অবাক হব না।

—তা তোর সঙ্গে আবার কোনো সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি তো? এত চিন্তিত। —মজা করেই বলে উঠেছিলাম।

—ইন্দ্র, প্লিজ, ডোন্ট টক রাবিশ। —বেশ উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, এটা হাসিঠাট্টার সময় নয়।

চুপ করে গেলাম। বলাটা আমার সত্যি ঠিক হয়নি। ঘটনাটা যতই লাইটভাবে নিই-না কেন, চিন্তার কথা। কোনো খবর নেই প্রাণোচ্ছল মেয়েটার। সত্যি কোনো বিপদ হয়নি তো?

অফিসে ইতিমধ্যে দেখি, একজন পুলিশ সার্জেণ্ট ঢুকেছে। লোকটার সঙ্গে এইচ. আর. ডিরেক্টর ম্যাথিউ। রাহুলের সঙ্গে কথা বলে চায়। ওকে ডেকে নিয়ে একটা কনফারেন্স রুমের দিকে এগিয়ে গেল।

ব্যাপারটা তাহলে বেশ সিরিয়াস হয়ে উঠেছে।

নাহ, আমার এরকম সস্তা ইয়ারকি করা উচিত হয়নি। আজ শুক্রবার। অফিসে একটা হালকা মেজাজ থাকে। দূর থেকে যারা আসে, তাঁরা অনেকেই শুক্রবার আসে না।

ঠিক আগের শুক্রবার এখানে আমাদের সঙ্গে এ সময় জেসিকা কফি খাচ্ছিল। বেশ হাসিখুশি ছিল। শেষ ওকে দেখেছি এই সপ্তাহে সোমবার। আমি সাড়ে সাতটা নাগাদ বেরিয়ে

গিয়েছিলাম। মনে করার চেষ্টা করলাম। মনে পড়ছে। সেদিন যখন বেরোই, তখন অফিস প্রায় ফাঁকা। একটা স্লাইড ডেকের উপরে রাহুল আর জেসিকা কাজ করছিল একটা কনফারেন্স রুমে। তখন অবশ্য অফিসে আরও অনেকে ছিল। শেষ ওকে কে দেখেছে, কে জানে?

বোর্ডের উপরে পিন দিয়ে অনেক টিম মিটিং-এর ছবি লাগানো আছে। কিছুদিন আগে আমরা এখানে একসঙ্গে দেওয়ালি পালন করেছিলাম। তার ছবিও আছে।

জেসিকাও সেখানে আছে। জিন্স প্যান্টের উপরে ছোটো লাল টপ। মুখে ভারী মিষ্টি হাসি। সত্যি আকর্ষণীয় ইয়োরোপিয়ান মেয়েদের ফিগার। মুখের মধ্যে স্প্যানিশ মেয়েদের নমনীয়তা আছে। অনেকের মধ্যে ঠিক রাহুলের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। আলতোভাবে রাহুলের কাঁধে ডান হাত রেখে। ছবি দেখেই মনে হচ্ছে, ওরা যেন অনেক কাছাকাছি চলে এসেছে। আশ্চর্য! এটা তো আগে চোখে পড়েনি। অফিসিয়াল ছবিতে এটা ঠিক স্বাভাবিক নয়।

১৪

৮ জুন ২০০৪, বার্মিংহ্যাম, ইংল্যান্ড

শনিবার। জুন মাসের শুরুর দিক। এ সময়টায় প্রকৃতি তার হৃদয়—বুদ্ধি সবকিছু উজাড় করে সাজিয়ে তোলে ইংল্যান্ডকে। আমার বাড়ির সামনেই একটা পার্ক। সেখানে সকালে হাঁটতে গিয়েছিলাম।

এখন ফুলের মরশুম। সারি দিয়ে হথহর্ন গাছ। সাদা থোকা থোকা ফুল হয়েছে তাতে। ফুলের পাপড়িতে গাছের তলার ঘাস হারিয়ে গেছে।

অন্য যেকোনোদিকে মাঠের ঘাস থেকে মাথা তুলে আছে হলুদরঙা ঘাসফুল। পাঁচটা করে পাপড়ি। ভারী সুন্দর দেখতে। খেয়াল করে হাঁটতে হয়, মনে হয়, এই ঘাসের উপরে পড়ে-থাকা মণিমাণিক্য পায়ের তলায় চাপা পড়ছে না তো!

দূর থেকে মাঝেমধ্যে নিয়মিত সময় অন্তর অন্তর কাঠঠোকরার ঠোকরানোর আওয়াজ ফিরে ফিরে আসছ। ছোটো ছোটো আপেল হয়েছে গাছে। কিছু গাছ আবার কমলালেবুতে ভরে আছে। পাখিদের, কাঠবেড়ালিদের, খরগোশদের এখন দিন জুড়ে উৎসব। চারদিকে তাকালেই ম্যাগপাই, শালিক, রংচঙে, রবিন, পাপিয়া, ব্ল্যাক বার্ড। গাছ ভরতি লাল বুনো চেরি হয়েছে। তা-ই ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে।

হঠাৎ দেখলাম, আমার সেলফোনটা বাজছে। রাহুলের ফোন। আজ ওর বাড়িতে যাওয়ার কথা ছিল। সে ব্যাপারে নিশ্চয়ই কিছু বলবে।

ফোনটা ধরলাম। রাহুলের গলায় উত্তেজনার সুর।—ইন্দ্র, কভেন্ট্রি পুলিশ স্টেশনে আছি। একটা খুব খারাপ খবর আছে।

—কী? তোর কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে?

—না, না, তার থেকেও খারাপ। জেসিকার বডি পাওয়া গেছে। শি ইজ ডেড।

—মানে? কী বলছিস?

—তুই একটু থানায় চলে আসবি?

—হ্যাঁ, আসছি। সোজা যাচ্ছি এখান থেকে। আধ ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাচ্ছি।

অ্যাড্রেস নিয়ে ট্যাক্সিতে করে পৌঁছোতে এক ঘণ্টা লাগল।

রাহুল বলেই রেখেছিল। যেতেই এক মহিলা পুলিশ আমাকে নিয়ে একটা ছোটো ঘরে গেল। গিয়ে দেখি, রাহুলও ওখানে বসে আছে। এইচ. আর. ম্যানেজার পিটারও আছে। ছোটো ঘর। ঘরে কীরকম যেন বিদঘুটে বমি-বমি গন্ধ। অবশ্য পুলিশ থানাতে খুব ভালো এয়ার সার্কুলেশন এক্সপেক্টেড নয়।

ডিটেকটিভ সার্জেন্ট জেমস পারটন তদন্তের দায়িত্ব নিয়েছে। সে বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে রাহুল আর পিটারকে আজই ডাকা হয়েছে। আমাকেও হয়তো ডাকতেন।

যা বুঝলাম তা হল এই। আজ থেকে চার দিন আগে এক ব্যক্তি জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতে গিয়ে একটা বড়ো কালো স্যুটকেস পড়ে থাকতে দেখে। সেটা এমন একটা নিচু জায়গায় আগাছার মধ্যে ফেলা ছিল যে কারো চোখে চট করে পড়ার কথা নয়। লোকটার কাছে গিয়ে লক্ষ করে দেখে যে সেটাকে ঘিরে পিঁপড়ের ভিড়। বাইরে একটা তালা লাগানো ছিল। লোকটা একসময় ব্রিটিশ মিলিটারিতে ছিল। সন্দেহ হতে তালা ভেঙে ফেলে। ডালা খুলে দেখে তার মধ্যে সম্পূর্ণভাবে ডিকম্পোজড একটা বডি। বলা যায়, তাতে কঙ্কাল ছাড়া কিছুই ছিল না। আর পোকার বাসা গড়ে উঠেছে সেখানে। এমনকী তার মধ্যে ভিকটিমের কোনো পোষাক বা কোনো আইডেন্টিটিও খুঁজে পায় না। জায়গাটা ছিল টাইল হিল স্টেশন থেকে মাইল দুয়েক দূরে।

যে-ই খুন করে থাকুক, খুব নিখুঁত কাজ করেছে।

জেমস বলে উঠল, মনে হয়, এই বডিটা অন্য কোথাও রাখা ছিল, পরে সরিয়ে এখানে ফেলে দেওয়া হয়।

—বলছেন, এই মঙ্গলবারে পেয়েছেন। আর আজ শনিবার। এ ক'দিন আমাদের জানাননি কেন?— পিটার বলে উঠলেন।

—বডি এত ডিকম্পোজড হয়ে গিয়েছিল যে বলতে পারেন ,শুধু কঙ্কালটাই ছিল। সেটা থেকে শনাক্ত করা সহজ ছিল না। এমনকী ওটা দশ বছর আগের কি না, সেটাও বোঝার উপায় ছিল না। জেসিকার মতো অনেকেই বিভিন্ন সময়ে মিসিং হয়েছে গত দশ বছরে।

সেজন্য প্রথমে জানা দরকার ছিল, খুনটা ঠিক কীরকম সময় নাগাদ হয়েছে সেটা আন্দাজ করার। সেজন্য আমরা মিসেস হার্পারকে খবর দিই।

—ফরেনসিক এন্টিমোলজিস্ট?— রাহুল বলে উঠল।

একটু অবাক হয়ে রাহুলের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল জেমস—ওকে চেনেন নাকি?

—না, না, এক্ষেত্রে ওইভাবে মৃত্যুর সময় নির্ধারণ করা সম্ভব। পোকার বাসা বললেন, তাই বললাম। অনুমান করেছি যে হয়ন্তব্ধ ফরেনসিক এন্টিমোলজিস্ট— এর দরকার ছিল।

অবাক হয়ে জেমস ফের বলে উঠল, বাহ, আপনার এ ব্যাপারে বেশ ভালো আইডিয়া আছে তো। হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। পোকার কলোনি, পোকার ডিম, ওদের সংখ্যা এসব দেখে খুনের সময় আন্দাজ করা যায়। তা বাক্সের ওই পোকার কলোনির বয়স দেখেই মিসেস হার্পার বললেন যে হত্যাটা গত ছয় থেকে আট মাসের মধ্যে হয়েছে। আমরা তখন ওই সময়ের সব মিসিং পার্সন রেকরড চেক করতে গিয়ে যে ক-টা কেস পেলাম, তাদের জেন্ডার, বয়স, সকলের এর সঙ্গে তুলনা করে নিশ্চিত হই যে এটা আপনাদের জেসিকার। এবারে বুঝেছেন তো কেন আজ সকালে চার দিন বাদে ডাকলাম ইন ফ্যাক্ট, আজ সকালেই আমরা নিশ্চিত হয়েছি।

—কীভাবে মারা হয়েছে কিছু আন্দাজ করতে পেরেছেন?

—মাথার পিছনদিকে ফ্র্যাকচার। মনে হয়, মাথার পিছনদিক থেকে ভারী কিছু দিয়ে মারা হয়েছে। বেশ কয়েকবার। বুঝতেই পারছেন, আরও বেশ কিছু তথ্য আমাদের সামনে এসেছে। কিন্তু এ বিষয়ে আপনাদের সাহায্য লাগবে। আমি আপনাদের দরকার হলে এখানে ডাকব।

একটু থেকে সার্জেন্ট ফের বলে উঠলেন,আচ্ছা, কাউকে সন্দেহ হয়! মানে শেষ কয়েকদিন কেমন ছিল জেসিকা?

রাহুল বলে উঠল, অন্যরকম কিছু মনে হয়নি। একই রকম হাসিখুশি ছিল। মনে হয়নি কোনোরকম টেনশনে ছিল। তবে ওর এক বয়ফ্রেন্ড ছিল। তার সঙ্গে ওর শেষদিকে খুব ভালো সম্পর্ক ছিল না। তাকে নিশ্চয়ই জেরা করেছেন। আচ্ছা, ওর বাবা-মা-কে জানিয়েছেন?

—হ্যাঁ, প্রথমে সকালে ওদেরই খবর দিই। আপনারা অফিস থেকে একটু কথা বলে নেবেন ওদের সঙ্গে। খুব ভেঙে পড়েছে। অবশ্য ভেঙে পড়াই স্বাভাবিক।

—হ্যাঁ, অবশ্যই, আমরা অফিসে ফিরে ওদের সঙ্গে শুধু যোগাযোগ করব না। কেন্টেওনাদের কাছে আমাদের অফিস থেকে লোকও যাবে।

ফের জেমস বলে উঠল, অফিসের সবার সঙ্গে ওর ভালো সম্পর্ক ছিল তো? কারোর সঙ্গে মনোমালিন্য? হয়েছিল ঘটনার আগে?

—না, না,— রাহুল ফের বলে উঠল, ওর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করাও শক্ত ছিল। সেরকম কিছু হলে ঠিক জানতে পারতাম।

—কী করে এতটা শিয়োর ছিলেন?

বুঝতে পারলাম, রাহুলের অতটা বলা উচিত হয়নি।

ওর হয়েই বলে উঠলাম, আসলে আমরা তিন-চারজন জেনারেলি অফিসের মধ্যে একসঙ্গে লাঞ্চ ইত্যাদি করতাম। তা ছাড়া ও আমাদের প্রোগ্রাম অফিসের মেম্বার হওয়ার জন্যে আমাদের প্রায় প্রতিঘণ্টায় কথা হত। সামান্য টেনশন হলে সেটা বুঝতে পারতাম। তবে—

—তবে কী?

একটু দোনামনা করে বলে উঠলাম, আসলে আমাদের প্রোগ্রামের কিছু চ্যালেঞ্জ ছিল সে সময়। জেসিকা সেজন্য কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলছিল। বুঝতেই পারছেন, অনেকের ক্ষেত্রে এই প্রোগ্রামের জন্য কাজের পরিবর্তন মেনে নেওয়া সহজ ছিল না। তারা বাধা দিচ্ছিল। অনেকের কাজের চরিত্রে আমূল পরিবর্তন হয়ে যেত, সেটা যাতে তারা জানতে পারে আগে থেকে, সেসব বিষয়ে বেশ কিছু কমিউনিকেশনের দায়িত্বে ছিল জেসিকা।

—ইন্টারেস্টিং। তার জন্য কারো সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হতে পারে বলছেন?

রাহুল উত্তর দিল, হ্যাঁ, হতে পারে। তবে আমার বিশ্বাস, তার জন্য এরকম কাজ কেউ করবে না। ওর একার উপরে রাগ করার কথা নয়। তবে ওর বয়ফ্রেন্ডকে একটু ভালো করে জেরা করবেন। ইদানীং মনে হয়, ওদের মধ্যে কিছু ঝগড়াঝাঁটি মারপিটও হয়ে থাকতে পারে।

—হুঁ, সে তো দেখবই।

পাশ থেকে মিস্টার পিটার বলে উঠল, অচেনা কেউও তো হতে পারে? কোনোরকম ধর্ষণ হয়নি তো?

ঘাড় নাড়লেন সার্জেন্ট জেমস। —না, সেরকম কিছুর চিহ্ন পাওয়া যায়নি। তবে এর কাছাকাছি একটা জায়গায় কিছু কাউন্সিল হাউস আছে। কাউন্সিল হাউসে আফ্রিকা থেকে আসা কিছু রেফিউজি আছে। আমরা এখানকার সব সন্দেহজনক লোকের খোঁজখবরও নেব। ওটা স্ট্যান্ডার্ড রুটিনের মধ্যে পড়ে। আমরা মার্ডার ওয়েপনটাও পাইনি।

আরও কিছু প্রশ্ন করলেন জেমস। আমাদের যার যা তথ্য ছিল, জানালাম। আমাদের কন্ট্রাক্ট নাম্বার রেখে দিলেন।

থানার থেকে বেরোলাম প্রায় দুপুর দুটো নাগাদ। রাহুল দেখলাম, খানিকক্ষণ কোনো কথা বলছে না। কী যেন ভাবছে। দুবার শরণ্যার ফোন-আসতেই কেটে দিল। আমি বলে উঠলাম, কীরে, ফোন ধরছিস না?

—ভালো লাগছে না রে ইন্দ্র। এক খুব প্রিয়জন যেন হঠাৎ করে আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। খুব ভালো ছিল মেয়েটা। ভাবতে পারিস, ওর বাবা-মা-র কী অবস্থা হবে? আমিও যাব কেন্টে।

বলে আবার অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটতে থাকল। পথে আর তেমন কোনো কথাই হল না।

১৫

১৬ এপ্রিল ২০১৯, কলকাতা

মনিস্কোয়্যারে একটা সিনেমা দেখে বেরিয়ে এসে দেখি গার্গী সঙ্গে নেই। এই তো সঙ্গে সঙ্গে ছিল। কোথায় গেল!

একটু দূরে গিয়ে অপেক্ষা করলাম। ছুটির দিন। তাই যথেষ্ট ভিড় হয়েছে। কলকাতায় এই শপিং মলগুলো ছোটো ছোটো পরিবারের ছুটির দিনে সময় কাটানোর ভালো জায়গা। এরকম একটা অতি সাধারণ সিনেমা দেখতেও তাই এরকম ভিড়।

যা-ই হোক, খানিকক্ষণ বাদেই গার্গীর দেখা মিলল। সঙ্গে শরণ্যা।

আমাকে দেখে মুচকি হেসে শরণ্যা এগিয়ে এল। আরও রোগা হয়ে গেছে এই এক মাসে। হয়তো যেরকম মানসিক চাপে আছে, তার জন্যই। চোখের তলায় সামান্য কালি, তাতে অবশ্য আকর্ষণ কিছু কমেনি। আশপাশ থেকে যে-ই যাচ্ছে, সে-ই একবার ওর দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে যাচ্ছে।

আমি বলে উঠলাম, চলো, কফি শপে বসে গল্প করা যাক।

আমরা তিনজন গিয়ে বসলাম।

গার্গী ওকে জিজ্ঞেস করে উঠল, একা এসেছ সিনেমা দেখতে?

—না, না, এমনি ঘুরতে এসেছি। আসলে বাড়িতে একদম ভালো লাগছিল না। রিনির স্কুলের এক বন্ধুর জন্মদিন। ও তাই বন্ধুর বাড়িতে সারাদিন থাকবে। পৌঁছে দিয়ে ভাবলাম, একবার ঘুরে যাই।—বলে মাথা নিচু করল। চোখের কোণ থেকে নেমে এল কয়েক ফোঁটা জল। ও কাঁদছে।

গার্গী ওর হাত চেপে ধরল। আমরা সান্ত্বনা দেওয়ার সামান্য চেষ্টা করলাম।

ও বলে উঠল, সবকিছু যেন কয়েকদিনের মধ্যে ওলটপালট হয়ে গেল। এত বছর একসঙ্গে কাটিয়েছি, অনেক কিছুই শুধু যেন অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল। এখন সবকিছুই যেন অন্যরকম লাগে, মানিয়ে নিতে পারি না।

চোখের কোণটা ফের রুমাল দিয়ে মুছে বলে উঠল, এই যে অটো করে এইটুকু পথ এলাম, তাতেও যেন সম্পূর্ণ অন্যরকম লাগছিল। এমনকী নামার পর টাকা দিতে ভুলে গিয়ে চলে

যাচ্ছিলাম। খেয়াল ছিল না যে রাহুল সঙ্গে নেই।

গার্গী বলে উঠল, এখনও সময় আছে। এরকম সব সংসারেই হয়। মাঝেমধ্যে টেনশন। সবকিছু ফের দু-একদিনে ঠিক হয়ে যাবে।

—না, না, এ আর ঠিক হওয়ার নয়। —ও আস্তে আস্তে বলে উঠল, তোমরা ওকে চেনো না। ও যখন একবার সরে যায়, আর কিছুতে ফিরে আসে না। নদীর জল অন্য খাতে অনেক দূরে বয়ে গেছে এখন। ও অনেক দূরে চলে গেছে।

গার্গী বলে উঠল, অন্য কারো সঙ্গে রাহুলের সম্পর্ক?

—না, না, সেরকম কেন হবে!—একটু যেন অসন্তুষ্ট হয়ে বলে উঠল শরণ্যা।

আমি বলে উঠলাম, শরণ্যা, এখনও সময় আছে। তোমাদের মেয়ের জীবনও এর সঙ্গে জড়িত আছে। আমার উপর সে দায়িত্ব ছেড়ে দাও। আমি রাহুলকে ঠিক বুঝিয়ে দেব।

—না। ওর সঙ্গে কোনো কথা বলবে না। না, ওর মধ্যে একটা একদম অন্যরকম আরেক রাহুল আছে। তার কথা তোমরা কোনোদিন টেরও পাওনি। আমিই পাই নি। হয়তো কোনো একদিন সেই রাহুলের সন্ধান পাবে তোমরা।

—কীসের কথা বলছিস তুই? —গার্গী বলে উঠল, ও কি তোকে মারধর করে?

—না, না। সে অন্য এক কথা। তোমার জেসিকার কথা মনে পড়ে?

—জেসিকা, কোন জেসিকা?

আমি পাশ থেকে বলে উঠলাম, ইংল্যান্ডের সেই আমাদের প্রোজেক্টে যে ছিল, সেই জেসিকা?

সায় দিল শরণ্যা।

—জেসিকার কি কোনো খোঁজ পাওয়া গিয়েছে? তাকে নিয়ে এতদিন পরে হঠাৎ? কিছু ব্যাপার ছিল ওদের মধ্যে?—পরপর প্রশ্নগুলো করে উঠলাম।

—না, খোঁজ পাওয়া যায়নি। কিন্তু কী অদ্ভুতভাবে উধাও হয়ে গেল, তাই না?— শরণ্যা বলে উঠল।

—হ্যাঁ। কিন্তু হঠাৎ করে এ কথা?

—না, সে কথা থাক। পাঁচ বছর আগে আমাদের ওই মধ্যমগ্রামের জমি কেনা নিয়ে কিছু ঝামেলা হয়েছিল, শুনেছ নিশ্চয়ই!

—হ্যা, ওই তো তোমাদের জমির পাশের ক্লাবটা, কী যেন নাম ছিল! তারা তো সেই জমির একটা অংশ জবরদখল করে বসেছিল। কিছুতেই বিক্রি করতে দিচ্ছিল না।

—হ্যাঁ, ওই তো মহম্মদ শেরিফ। ওখানকার বিখ্যাত মস্তান। সেই লোকটা করতে দিচ্ছিল না। পার্টির সঙ্গে খুব ভালো বোঝাপড়া ছিল ওর।

—হ্যাঁ, জানি, কেন, আবার সে সমস্যা তৈরি করছে নাকি!

—না, না, সে আর আছে নাকি সমস্যা তৈরি করার জন্য! গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়। সেজন্যই ঝামেলা মিটে গিয়েছিল। বাকিদের সঙ্গে রাহুল কিছু টাকা দিয়ে বোঝাপড়া করে নিয়েছিল। কিন্তু সে থাকলে সেটা সম্ভব হত না। অবশ্যই ওদের ডিমান্ড তো আর ঠিক ছিল না।

—হ্যাঁ, সেটা ঠিক। আমি হলে মেটাতে পারতাম না। এটা রাহুল ঠান্ডা মাথায় করেছিল বলেই। তা না হলে অতো টাকা নষ্ট হত। এদিকে এসব রাজনীতির লোকেদের যা ক্ষমতা। কিন্তু হঠাৎ করে একথা!

—কোনো একদিন হয়তো জানবে, এর পিছনের আসল কথা। আসল রাহুলের কথা। তবে এ নিয়ে আজ আর আমি কিছু বলব না।

ওর কথার মধ্যে এমন কিছু ছিল যে আমি আর গার্গী অন্য প্রসঙ্গে গেলাম। কিছুই বুঝতে পারলাম না।

১৬

১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০, দুপুর দুটো, কলকাতা

আজ মনে পড়ল কয়েক মাস আগে বলা শরণ্যার কথা। তখন কিছুই বুঝিনি। ভাবতেও পারিনি। জেসিকার কথা। শরণ্যা তাহলে কি জানতে পেরে গিয়েছিল সব কথা!

তাহলে কি সেই মহম্মদ শেরিফ, তাকেও সরিয়ে দিয়েছিল রাহুল? হ্যাঁ, মনে পড়ছে, সেরকম একটা ছবিও যেন ছিল ওখানে। আমি অবশ্য শেরিফকে দেখিনি। তখন শরণ্যার কথা শুনে একবারও মনে হয়নি এরকম কোনো সম্ভাবনার কথা।

আমার অ্যালবামে জেসিকার সঙ্গে রাহুলের কিছু ছবি ছিল। আমিও আছি। কিন্তু সেই ছবিগুলো এখন যেন অন্যভাবে সামনে এল। একটা ছবিতে দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে আছে। জেসিকার মুখে এক রহস্যময় হাসি।

কিছু কি হয়েছিল ওদের মধ্যে? যার জন্য পরে ওকে রাহুল সরিয়ে দিতে বাধ্য হয়। সে সুযোগ ওর ছিল। যথেষ্টই ছিল। ও জানত, ঠিক কোন পথ দিয়ে জেসিকা ঠিক কখন অফিস থেকে ফেরে। হয়তো সেদিন জেসিকাকে রাতে গাড়িতে পৌঁছে দিতেও পারে। কাকে ধরা হয়েছিল, শেষ অব্দি, জানা নেই!

জেসিকা কীভাবে খুন হয়েছিল, কাউকে ধরা হয়েছে কি না, সেটা আমাকে জানতে হবে। সে বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। এখনও কিছু যোগাযোগ আছে আমার সেই প্রোজেক্টের কয়েকজনের সঙ্গে। তাদের কয়েকজনের সঙ্গে লিঙ্কডইন-এ কানেক্টেডও আছি।

অফিসে কাজে মন আসছিল না। এখন আমি ও রাহুল আলাদা অফিসে বসি। যদিও মাঝেমধ্যে দেখা হয়েই যায়। সিনিয়র লিডারশিপ মিটিং-এ।

কিছুক্ষণ বাদে দেখি, ফোন বাজছে। ইংল্যান্ডের ফোন। ফোন তুলে দেখি উলটোদিকে পিটার। পিটার সে সময় সেন্সবেরিতে হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজার ছিল। জেসিকার উধাও হওয়ার পরে পুরো তদন্তের সময়ে ও যথেষ্ট ইনভলভড ছিল। ও এখন অবশ্য সেই কোম্পানিতে নেই। ওকেই মেসেজ করেছিলাম লিঙ্কডইন থেকে পাওয়া ওর এখনকার ফোন নাম্বারে। লিখেছিলাম খুব জরুরি বলে। সেজন্যে আমাকে ফোন করেছে।

কিছুক্ষণ কথা হল জেসিকার ব্যাপারে। ও জানে না ঠিক কী হয়েছিল শেষে। কিন্তু যতটুকু জানে, শেষ অব্দি কেউই ধরা পড়েনি ওই কেসে। ওর বয়ফ্রেন্ডের বিরুদ্ধেও কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি শেষ অব্দি। ওর ধারণা, এখনও ওপেন কেসগুলোর মধ্যেই ওটা পড়ে।

আমার এ বিষয়ে এতদিন বাদে আগ্রহ দেখে ও খানিকটা অবাকই হয়েছিল। আমাকে উলটে প্রশ্ন করছিল এ ব্যাপারে। শুধু বললাম, এ বিষয়ে আমি আবার ফোন করব। আমার কাছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এসেছে যা এ তদন্তে সাহায্য করতে পারে। ও আমাকে জানাল, এ ব্যাপারে যেকোনো বিষয়ে আমাকে সবরকম সাহায্য করবে।

আমি নিজে এখন বুঝেছি, রাহুল কেন এত তাড়াহুড়ো করে দেশে ফিরে আসতে চেয়েছিল। ও চায়নি ও এ তদন্তের ব্যাপারে কোনো কিছুতে জড়িয়ে পড়ুক। কী যেন ছিল সেই সার্জেন্টের নাম? তার সঙ্গে একবার যোগাযোগ করলে মন্দ হয় না।

আজ সন্ধেতে একটা খুব দরকারি কাস্টমার মিটিং আছে। আমেরিকার একটা বড়ো রিটেলারের গ্লোবাল চিফ ইনফর্মেশন অফিসার এবং চিফ ফিনানসিয়াল অফিসারের সঙ্গে। আমাদের কোম্পানির একটা খুব বড়ো একটা কন্ট্রাক্ট পাওয়া-না-পাওয়া অনেকটাই নির্ভর করবে এই মিটিংটার উপরে। এমনিতে আমেরিকাতেই যেতে হত মিটিংটার জন্য। হঠাৎ করে মিটিংটা ঠিক হওয়ায় যেতে পারিনি।

মিটিংয়ের আগে বেশ কিছু কাজ বাকি। টিমকে ডেকে নিলাম আমার চেম্বারে। যে বিষয়গুলো নিয়ে মূলত আলোচনা হবে, তার জন্য কিছু প্রস্তুতি দরকার। একই সঙ্গে দেখতে হবে কিছু স্পেশাল ডিসকাউন্ট দেওয়া যায় কি না।

মিটিংয়ের মধ্যে দু-দুবার আমার ফোনটা বেজে উঠল। যত দরকারি হোক-না কেন, আমি মিটিংয়ের মধ্যে কোনো ফোন ধরি না। সাইলেন্ট করে রাখি। কিন্তু তৃতীয়বার যখন একই নাম্বার থেকে ফোনটা এসে সমানে বাজতেই থাকল, বাধ্য হয়ে তুলে নিলাম।

উলটোদিকে দমদম-ঘুঘুডাঙ্গা থানা থেকে ও.সি. মোহিত সরকারের গলা।

—আপনাকে এখনই থানায় আসতে হবে।

একটু সময় নিয়ে টিমকে বাইরে যেতে বলে উত্তর দিলাম,—কী ব্যাপার বলুন তো?

—সবকিছু ফোনে বলা যাবে না। কিন্তু আমার প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর দেবেন। আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা না করলে শুধু শুধু আপনিই বিপদে পড়বেন। আমাদের কাছে খবর আছে যে রাহুল সেদিন দমদমে গিয়েছিল। ওকে দমদমের এক মাছওয়ালা দেখেছে। ম্যাডাম, মানে শরণ্যাও ওর সঙ্গে ছিল। আপনার বন্ধু কী করে একই সঙ্গে দুটো জায়গায় থাকতে পারে?

চুপ করে বসে রইলাম। এমনিতেও আমার মিথ্যে কথা বলার বিশেষ অভ্যেস নেই। ধরা পড়ে গেছি।

আমার গলার কাঁপুনি বাড়িয়ে দিয়ে পরের মন্তব্য এল—মিথ্যে কথা বলে আপনার নিজের বিপদ বাড়াবেন না। আপনার নিজের পরিবারের কথা ভাববেন। আরেকটা কথা জানিয়ে রাখি, সুরজিতের বাড়ির কফির কাপে আমরা রাহুলের ফিঙ্গারপ্রিন্ট পেয়েছি। আপনি যদি এখনও বলেন ওর সঙ্গেই ছিলেন, তাহলে...

—আমি আসছি।

ফোন ছেড়েচুপ করে একটুক্ষণ বসে রইলাম। বাইরে টিম অপেক্ষা করছিল। বেরিয়ে এসে বললাম, একটা আর্জেন্ট কাজে বেরোতে হবে।

স্বপ্না আমার মুখের ফ্যাকাশে রঙ দেখে কিছু একটা আন্দাজ করেছিল। বলে উঠল—কিছু হয়েছে?

না বললেও বুঝতে পারলাম, আমার নার্ভাসনেস, অস্থিরতা ধরা পড়ে যাচ্ছে। মাথা কাজ করছে না।

১৭

১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০, বিকেল চারটে, কলকাতা

—আপনি একটু খুলে বলুন সবকিছু, যতটুকু জানেন। —স্থির চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল ও.সি. মোহিত সরকার।

লোকটাকে দেখেই কীরকম যেন অস্বস্তি লাগে। শার্টের উপরের বোতামগুলো খোলা। দু-হাতে বেশ কয়েকটা মাদুলি। চোখ দুটো দেখলেই মনে হয় যেন সারারাত মদ খাওয়ার পরে,

এই সবে ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে।

আমি ভেবেই রেখেছিলাম, ঠিক যতটুকু জানি, সেটুকুই বলব।

মিথ্যে কথা বলা ঠিক হবে না, আবার শুধু অনুমানের উপরে নির্ভর করে কোনো কথা বলে রাহুলকে কোনোরকম বিপদে ফেলাও উচিত হবে না।

লোকটা দেখলাম, খানিক বাদে উঠে ঘরে পায়চারি করছে। আর একটা কাঠি দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করছে।

ফের চেঁচিয়ে প্রশ্ন করে উঠল,কী হল! আপনি কি টের পেয়েছিলেন যে আপনার বন্ধু ওর স্ত্রী-কে খুন করবে? তার প্রেমিককে খুন করবে?

—না।

—কিন্তু খুন করতে পারে না—যেভাবে আগের বারে বলেছিলেন, এখন কি সেটাই বিশ্বাস করেন?

চুপ করে বসে রইলাম। সত্যি এখন সে কথাটা জোর করে বলতে পারি না।

—লুক, মিস্টার ইন্দ্র। আপনি অতিশয় ভদ্রলোক। কিন্তু আমার আবার চোর-জোচ্চোর-খুনিদের নিয়ে কাজ। ধৈর্য কম। সবার জন্য একই ট্রিটমেন্ট। যা জানেন, চটপট বলে ফেলুন। আশা রাখব, আপনার সঙ্গে কোনো পুলিশি ট্রিটমেন্ট করতে হবে না। আপনাকে জানিয়ে রাখি, সুরজিতের কফিতে আমরা বিষ পেয়েছি। থ্যাল না থ্যালিয়াম জাতীয় কিছু! সেই থ্যালিয়াম ওর রক্তেও পাওয়া গেছে। খুব হাই চান্স রাহুলই এটা করেছে। এবং একইভাবে ওর এক্স-ওয়াইফ শরণ্যাকেও হয়তো খুন করেছে। মৃতদেহ শুধু পাওয়ার অপেক্ষায়। বেঁচে থাকলেও শরণ্যা হয়তো ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

—থ্যালিয়াম? আপনি নিশ্চিত?

—হ্যাঁ,আপনি এই নাম চেনেন! আমি এটার নাম আগে শুনিনি। বেশ রেয়ার মাল শুনলাম। ফরেনসিকসের লোকটা বলল। সাংঘাতিক বিষ, কিন্তু সহজে পাওয়া যায় না। বাংলাদেশ থেকে নিয়ে আসা যায়। তা আপনি এটার কথা শুনেছেন মনে হয়। রাহুলের কাছে?

শুনে চুপ করে রইলাম কিছুক্ষণ। তাহলে আর সন্দেহ নেই। এরপরে কি আর লুকোনো ঠিক হবে? আমি নিজে আরও জড়িয়ে যাব। আমি কী ভাবছি সেটা এখনই বলা দরকার। সব কিছু খুলে বলা দরকার।

আমার দিকে স্থির চোখে উনি তাকিয়ে ছিলেন। বলে উঠলেন— কী এত ভাবছেন? উগরে দিন। লকআপে দু-দিন থাকলে বুঝতে পারবেন এ কীরকম শক্ত ঠাঁই। আপনার চাকরির রেকর্ডও খারাপ হয়ে যাবে।

দু-তিন মিনিট বাদে বলতে বাধ্য হলাম আমার সন্দেহের কথা। আমেরিকার কথা, ইংল্যান্ডের কথা। শরণ্যার বলা কিছু কথা যেজন্য ওদের ডিভোর্স হয়েছিল। আমেরিকার সেই কেস, যেখানে থ্যালিয়াম ব্যবহার করা হয়েছিল। রাহুলের সে কাজ করার সুযোগ ছিল। জেসিকার কথা। একই সঙ্গে জানালাম, আমি ওদের বাড়ির আলমারির তাকে কী দেখেছি।

উনি শুনতে শুনতে বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়ছিলেন। বেশ কিছু প্রশ্ন করছিলেন। আমার কাছ থেকে ইংল্যান্ডের কয়েকজনের ফোন নাম্বারও নিয়ে নিলেন।

সব শোনার পরে বলে উঠলেন, আমাদের পুলিশের লোক আপনার বন্ধুর উপরে সবসময় নজর রাখবে। কোথায় যায়। কী করছে। আপনি এখানে আসার ব্যাপারে কিছু বলবেন না। এখনই অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট বার করছি না। যেরকম ঘোড়েল লোক, লইয়ার-টইয়ার ধরে ঠিক জামিন পেয়ে যাবে। আমার কাছে আরেকটু স্ট্রং এভিডেন্স চাই।

—আর শরণ্যার?

—সে আমরা খুঁজছি। আশা করি, ঠিক দু-একদিনের মধ্যে খোঁজ পেয়ে যাব। সে জীবিত থাকুক বা মৃত হোক। তবে বুঝতেই পারছেন শরণ্যার বেঁচে থাকার চান্স খুব কম। মালটা নির্ঘাত বউকে সরিয়ে দিয়েছে। —বলে একটু থেমে ঠোঁটের কোণে একটু মুচকি হাসি নিয়ে বলে উঠল, তা আপনারও বন্ধুর স্ত্রী-র উপরে একটু সফট কর্নার আছে দেখছি। আপনার সঙ্গেও কোনো ইন্টুমিন্টু ছিল নাকি?

এরকম নোংরা প্রশ্নে রেগে বলে উঠলাম, এত বছর ধরে দেখছি, এরকম ভালো মেয়ে, ওর জন্য কিছুটা চিন্তা থাকাটা স্বাভাবিক নয় কি? তা ওর ফোন ট্র্যাক করা গেছে?

—ফানটা তো বাড়িতেই রেখে গেছে। শুনলাম, ওই ফোন নাকি মেয়েটা অনেক সময় ক্যারি করতাম না। এখনকার দিনে ভাবা যায়!

একটু থেমে ফের ও.সি. বলে উঠল, আপনি যা বলেছেন, তাতে এত শুধু আমাদের থানার আওতায় রাখলে চলবে না। লালবাজারের ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্টকেও পুরোপুরি ইনভলভ করতে হবে। আপনার সাহায্য লাগবে।

বলে একটু থেমে ফের বলে উঠলেন, বেশ হত যদি আমেরিকা-ইংল্যান্ডে যাওয়া যেত এরকম কেসের জন্য। সেসব তো আর হয় না। শুধু ঘাটশিলা আর বর্ধমান। আর গরমে পচা।

এরপরে যেটা করলেন সেটা আরও অদ্ভুত। টেবিলে রাখা জলের গ্লাসটা নিয়ে খানিকক্ষণ কুলকুচি করে ঘরের এককোণে গিয়ে ফেলে দিলেন।

আমিও অনুমতি নিয়ে উঠে পড়লাম।

২১ ফেব্রুয়ারি ২০২০, রাত দেড়টা, কলকাতা

দীর্ঘক্ষণ বেজে চলল সেল ফোনটা।

আমি বেশ রাত করে শুই। রাত তিনটে অব্দিও কোনো কোনোদিন জেগে থাকি। এটা আমাকে যারা ভালো করে জানে, আমার সঙ্গে মেশে, তারা জানে। কিন্তু তা বলে কেউ রাত দেড়টায় ফোন করে না। কিন্তু আজ ঠিক তা-ই হল।

পর পর দুবার বেশ কিছুক্ষণ বেজে ফোনটা ক্লান্ত হয়ে থেমে গেল। সোফায় বসে একটা বই পড়ছিলাম, উঠে গিয়ে ফোন নাম্বারটা দেখলাম। অফিসের কেউ ফোন করছে? অনেক সময় বিদেশের কেউ ভারতের সময় ঠিক আন্দাজ না করতে পেরে এরকম গভীর রাতে ফোন করে ফেলে। কিন্তু এটা ভারতেরই নাম্বার। কোনো কিছু আর্জেন্ট?

ফোনটা করার আগেই আবার ফোনটা বেজে উঠল। ফোনটা ধরে কিছুটা বিরক্ত হয়ে বলে উঠলাম, কে?

উলটোদিকে শরণ্যার গলা। খুব আস্তে। গলার স্বরে যেন ভয় মিশে আছে।

ফিসফিসিয়ে বলে উঠল, তুমি একা আছ? আসলে বাধ্য হয়ে তোমাকে এত রাতে ফোন করছি।

—শরণ্যা! মাই গড! তুমি কোথায়? তোমাকে তো খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা সবাই খুব চিন্তিত। আমি এখানে একাই আছি— বলতে পারো।— একটু উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলাম।

—বলছি। আচ্ছা, রাহুল তোমার কাছে নেই তো?

—না, না। তুমি নিশ্চিন্তে বলতে পারো।

—তুমি কিছুই হয়তো জানো না। —একটু দীর্ঘশ্বাসের আওয়াজ পেলাম। ফের বলে উঠল, তোমার হয়তো রাহুল সম্বন্ধে কোনো ধারণাই নেই। ও একজন সিরিয়াল কিলার। —ও থামল।

ভেবেছিল, আমি খবরটাতে হয়তো চমকে উঠব বা হেসে উঠব। কিন্তু সেরকম কোনো প্রতিক্রিয়া না দেখে ফের বলে উঠল, আমার মনে হয় রাহুল এবার আমাকেও মেরে ফেলবে। কারণ আমি সব জানি। অন্য কেউ জানে না।

—শুধু তুমি না। আমিও জানি। তা তুমি এখন কোথায় আছ?— ওকে জানালাম, অ্যাক্সিডেন্টালি কী কী দেখেছি ওই বুককেসের তাকে।

উলটোদিকে কিছুক্ষণের অস্বস্তিকর নীরবতা। আস্তে আস্তে ধরা গলায় ও বলল, আমিও কখনো ভেবে উঠতে পারিনি যে রাহুল এরকম।

ও বর্ধমানের একটা জায়গার ঠিকানা দিয়ে বলে উঠল, তুমি একটু পুলিশকে ইমিডিয়েটলি জানাতে পারবে?

—আমার সঙ্গে পুলিশের যোগাযোগ হয়েছে, কী করে জানলে?

—খবর পেয়েছি। কিন্তু আমি সরাসরি ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে ভরসা পাচ্ছিলাম না। যদি আমাকেও কোনো কারণে সন্দেহ করে।

—তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। আমি সব ব্যবস্থা করছি। আমি সবকিছু জেনে গেছি। পুলিশকেও এই সন্দেহের ব্যাপারে জানিয়েছি। ওরা জানে তুমি নিরপরাধ।

—ও, তাহলে আন্দাজ করতে পারছ, জানার পরে আমার পক্ষে ওর সঙ্গে আর একসঙ্গে থাকা সম্ভব হয়নি। সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকতাম। মনে হত, কবে আমারও ওই দশা হবে। এখন ঠিক সেটাই সত্যি হচ্ছে।

ফের বলে উঠি, চিন্তা কোরো না। আমি সব ব্যবস্থা করছি। তুমি যেখানে আছ, সেখান থেকে বাইরে বেরিয়ো না। তোমাকে এই নাম্বারে পাওয়া যাবে তো? দরকার হলে পুলিশ যাতে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে।

—এতে কিছু অসুবিধে হবে না তো?— মৃদুস্বরে বলে উঠল। মনে হল, ও যেন কাঁদছে।

—না, না, এটুকু ভরসা তো করতেই হবে। আমি তো আছি।

অ্যাড্রেসটা নিলাম। শান্তিনিকেতনের একটা হোটেল।

তারপরেই ও.সি. মোহিত সরকারকে ফোন করলাম।

উনি শুনেই উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন, এখনই পুলিশফোর্স পাঠিয়ে দেব। আর আপনি দেখুন তো আপনার বন্ধুকে ফোনে পাওয়া যায় কি না। ওকে এবারে অ্যারেস্ট করতেই হবে। শরণ্যা ও আপনার বয়ান ও অন্য সারকামস্টানশিয়াল এভিডেন্সের উপরে নির্ভর করে অ্যারেস্ট এখনই করা যেতে পারে। ও খুব ডেঞ্জারাস। কখন কী করে বসে, বা দেশ ছেড়ে পালায়, কে জানে! তার আগেই যা করার করতে হবে।

দু-বছর বাদে

১০ ফেব্রুয়ারি ২০২২, কলকাতা

অবশেষে আদালত থেকে রাহুলের কেসের রায় বেরিয়েছে। IPC 302 ধারায় আজীবন কারাদণ্ড হতে পারত। কিন্তু এক্ষেত্রে যেভাবে একের পর এক খুন ঠান্ডা মাথায় করেছে, যেভাবে ওর অপরাধ দেশের বাইরেও ছড়িয়ে আছে, সেসব কথা মাথায় রেখে ওকে শেষে

মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এমনকী রাহুল যে মানসিক দিক দিয়ে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, বিচার চলাকালীন সেটাও বোঝা গেছে।

ঠান্ডা মাথায় বদলা নিতেই একের পর এক খুন। সুপরিকল্পিত খুন। তার মধ্যে পলের দুই ছেলেকে পারমানেন্টলি পঙ্গু করার অভিযোগও আছে। আরও একটা খুনের খবর পাওয়া গেছে। মহম্মদ শেরিফ, সেই মধ্যমগ্রামের মস্তান, যে ওর বাড়ির জমি ছাড়ছিল না, তাকেও খুন করেছিল রাহুল। গাড়িচাপা দিয়ে।

জাজ এটাও বলেছেন যে প্রশ্নোত্তরের সময়ও কখনোই রাহুলের উত্তরে অনুতাপের সুর দেখা যায়নি। উলটে খুব ঠান্ডা মাথায় কীভাবে একের পর এক খুন করেছে, তার বিবরণ দিয়ে গেছে।

এরকম একজন অত্যন্ত উচ্চবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ যে এত সহজে আরেকজনকে খুন করে ফেলতে পারে, যে অতি সহজে সবরকম প্রমাণ লোপাট করে দিতে পারে, সেরকম একজনকে কোনোদিন বাইরে যেতে দিলে তা সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক।

তবে কলকাতা হাইকোর্টের এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে অ্যাপিল করা হবে। আমরা করব।

এত কিছুর পরেও শরণ্যা শেষের দিকে ওকে যেভাবে সাপোর্ট করেছে, তা সত্যি দেখার মতো। এমনকী প্রশ্নোত্তরের সময় একাধিকবার শরণ্যাকে কান্নায় ভেঙে পড়তেও দেখা গেছে।

তদন্তের সময় রাহুলের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ড-আমেরিকা থেকে সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছে, পেশ করা হয়েছে। অকাট্য প্রমাণ। কোনো সন্দেহ নেই যে প্রত্যেকটা খুন রাহুলেরই করা। এত নিখুঁতভাবে প্ল্যান করেছিল যে শরণ্যার পক্ষেও কোনো কিছু ধারণা করা সম্ভব হয়নি। আমিও যেমন ধারণা করতে পারিনি। আমি আর শরণ্যা সঙ্গে ছিলাম বলে এখন এসব রিলেট করতে পেরেছি। একটা সময়ে তদন্তের চাপে সব অপরাধও স্বীকার করে নিয়েছে।

আমার কাছে পুরোটা দুঃস্বপ্নের মতো। জীবনের এক অবিশ্বাস্য অধ্যায়। গত দুই বছরে আমি শুধু আমার সব থেকে প্রিয় বন্ধু হারিয়েছি তা-ই নয়, নিজের উপরে সব বিশ্বাসও হারিয়েছি। যাকে এত আপনার বন্ধু বলে মনে হত, সে যে এত অচেনা হবে, তার মধ্যে যে এরকম এক অন্ধকার মানুষ লুকিয়ে থাকবে, সেটা এখনও ভাবতে পারি না।

আজ ঠিক সেই দিন, যেদিন দু-বছর আগে আমি রাহুলের বাড়ি গিয়ে প্রথম এই কথা জানতে পেরেছিলাম। মাসিমা আর নেই। দশ মাস আগে এসবের মধ্যে মারা গেছেন। একদিক থেকে ভালো। ছেলের এই শাস্তির কথা জেনে যেতে হয়নি। জানলে সহ্য করতে পারতেন না।

আজ ছেলেকে নিয়ে ব্যাডমিন্টন খেলতে যাব, হঠাৎ ফোন এল। উলটোদিকে শরণ্যা। গলা ভারী। বোঝা গেল, এখনও কাঁদছে। গত সপ্তাহে শেষ কথা হয়েছে।

—আজ বিকেলের দিকে একটু সময় আছে?

—আজ বিকেলে অন্য জায়গায় যাওয়ার ছিল। আর্জেন্ট কিছু?

—না, সেরকম নয়। তবে—

—ঠিক আছে। আমি দেখছি।

সন্ধে সাতটার সময় শরণ্যার বাড়িতে এলাম। শরণ্যার মেয়ে রিনি ফোন নিয়ে গেম খেলছিল। এই হয়েছে এখন সব বাচ্চার। আমার ছেলেরও। সব সময় ফোন নিয়ে কিছু একটা করছে। ওদিকে ওর বাবা যে জেলে, তার সামনে আসন্ন মৃত্যু, এসব যেন কিছুই জানে না।

শরণ্যার বাড়িতে কাজের একটা মেয়ে থাকে সারাক্ষণ। তাকে আমার জন্য খাবার করতে বলে শরণ্যা আমার সঙ্গে ড্রয়িং রুমের এককোণে এসে বসল। তাকিয়ে দেখলাম ওর দিকে। চুল উসকোখুসকো। কোর্টে ওর মুখের দিকে তাকাতে ইচ্ছে করত না। সারাক্ষণ টেনশন। যেন রাহুলের অপমান, কষ্ট ওকে প্রতিমুহূর্ত বিব্রত করছে, কষ্ট দিচ্ছে।

বেশ বুঝতে পারতাম, ও এখনও রাহুলকে কতটা ভালোবাসে। বাইরে অজস্র প্রেসের লোকের ভিড়। গাড়ি থেকে বেরোতেই ওর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ত সাংবাদিকদের আর ক্যামেরাম্যানদের ভিড়।

এরকম মুখরোচক ঘটনা কলকাতার জনতা সাম্প্রতিককালে পায়নি। এমন একজন, যার কর্মকাণ্ড শুধু ভারতে সীমিত নয়, নানান দেশে। একই সঙ্গে এরকম একজন উচ্চশিক্ষিত প্রোফাইলের খুনি কলকাতা দেখেনি যে দেশ-বিদেশের পুলিস ফোর্সকে বোকা বানিয়েছে। এজন্য রাহুলের ভক্তসংখ্যাও কম নয়। বেশ কয়েকটা 'রাহুল ক্রাইম ফ্যান ক্লাব'ও তৈরি হয়েছে। একটা খুব নামী প্ল্যাটফর্মে ওয়েব সিরিজও হতে চলেছে আগামী দিনে রাহুলের কর্মকাণ্ডের উপরে।

ঘটনার কেন্দ্রে শরণ্যার মতো একজন অত্যন্ত আকর্ষণীয় সুন্দরী মহিলা থাকায় সেটা মিডিয়ার কাছে ঘটনার আকর্ষণ আরও বাড়িয়েছে।

এই গত দু-বছর কত ঝড়ঝাপটা গেছে শরণ্যার উপর দিয়ে। রাহুলের এই অপরাধ সামনে আসা, সেজন্য ডিভোর্স, যার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার কথা ছিল, সেই সুরজিতের মৃত্যু।

কিন্তু এখনও ওর মধ্যে সেই অদ্ভুত আকর্ষণ। আজ মনে হল, একটু যেন আবার সেই আগের জৌলুস ফিরে পেয়েছে। তবে এখন ও আর আগের মতো ভালো পোশাক, সাজসজ্জা করে না। আমি আসব জেনেও মুখে সামান্যতম প্রসাধন নেই।

সোফার এককোণে নিজেকে শামুকের মতো গুটিয়ে নিয়ে শরণ্যা বলে উঠল, ইন্দ্র, রাহুলকে বাঁচাতেই হবে।

ওর চোখ ছলছল করে উঠল।

—আমরা অবশ্যই সুপ্রিম কোর্টে অ্যাপিল করব। দেখা যাক, সুপ্রিম কোর্ট যদি অন্য কোনোরকম সিদ্ধান্ত নেয়। অনেক চেষ্টাই তো করলাম। আর কী-ই বা করার আছে?

শরণ্যা চুপ করে বসে রইল। জানলার দিকে মুখ করে।

তারপরে বলে উঠল, আমার ছোটোবেলাটা খুব অন্যরকম ছিল। আর পাঁচটা বাচ্চার মতো ঠিক সুখী ছিলাম না আমি। খুব ইনসিকিয়োর ফিল করতাম। তার অবশ্য কারণও ছিল। যখন পাঁচ বছর বয়েস, তখন মা মারা যায়। আমার জন্যেই। রাস্তার উলটোদিকে একটা বেলুনওয়ালা দাঁড়িয়ে ছিল, নানান রঙের বেলুন নিয়ে। মা-র হাত ছেড়ে ছুটে রাস্তা পার হতে যাচ্ছিলাম। খেয়াল করিনি যে একটা গাড়ি খুব জোরে আসছিল। আমাকে বাঁচাতে গিয়ে মা ছুটে আসে, সেই অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়। আমার এখন আর স্পষ্ট মনে নেই। তবে এখনও স্বপ্নে বার বার নানানভাবে ওই ঘটনা ধরা দেয়। মনে হয়, রাস্তার ধারে পড়ে আছি। চারদিকে রক্ত। অনেক লোকের ভিড়। চমকে উঠে বসি।

এর কিছুদিন বাদে আমি মামার বাড়ি চলে আসি। ওখানেই মানুষ। বাবা আবার বিয়ে করেন। কেন জানি না বাবা আমাকে পছন্দ করতেন না। হয়তো আমার জন্যে মা-কে হারিয়েছিল, সেজন্যে। আমার সঙ্গে খুব কম যোগাযোগ ছিল বাবার।

চুপ করে রইল শরণ্যা। বলে উঠল, এসব কথা তুমি নিশ্চয়ই জানতে না, ইন্দ্র। আমি আমার মা-র মৃত্যুর জন্য দায়ী। ভাবতে পারো!

—না, তা জানতাম না। রাহুলও বলেনি। কিন্তু একজন পাঁচ বছরের বাচ্চার আর কী দোষ থাকতে পারে এতে? এতে তোমার কোনো অপরাধ ছিল না। এসবই ভাগ্য।

—কিন্তু আমিই ছিলাম ওই মৃত্যুর পিছনে, তা-ই না! আমি যদি বোকার মতো কিছু না লক্ষ করে ওই বেলুন নিতে ছুটে না যেতাম, তাহলে হয়তো আমার মা আজও বেঁচে থাকত। সেজন্য বাড়ির সবাই আমাকে মুখে কিছু না বললেও বাবা অন্তত আমাকে ক্ষমা করেনি। শুধু আমার বিয়েতে এসেছিল। সেরকম কোনো যোগাযোগ রাখেনি তার পরেও।

আমার দিদিমা আমাকে খুব ভালোবাসতেন। কিন্তু একই সঙ্গে একটা হয়তো লুকোনো রাগ, অভিমান ছিল আমার উপরে, হয়তো ওই একই কারণে। হাজার হোক নিজের মেয়েকে হারানো।

আমি থাকলাম মামার বাড়িতে সবার উপরে বোঝা হয়ে। মামা বাইরে বাইরে থাকত। থাকতাম মামির কাছে। কিন্তু মামির নিজের এক মেয়ে ছিল। কেন জানি না মামি আমাকে একদমই পছন্দ করত না। কখনোই আপনার মনে করত না। খুব বকাবকি, এমনকী সামান্য কারণে মারধরও করত। মনে হয়, আমি ওর নিজের মেয়ে বুনির থেকে অনেক বেশি সুন্দর দেখতে ছিলাম, পড়াশোনায় খুব ভালো ছিলাম—এজন্যই হয়তো। কিন্তু সেটা তো আমার হাতে ছিল না। তারপরে একদিন হঠাৎ মামি মারা গেল। গ্যাস থেকে শাড়িতে আগুন লেগে।

—আচ্ছা, তুমি আজ হঠাৎ এসব বলছ কেন? কী একটা দরকারি বিষয় আছে বলছিলে!

আমি সত্যি একটু বিরক্ত হয়েই বলে উঠলাম। এসব গল্প শোনার জন্য আমি নিশ্চয়ই আজ ব্যাডমিন্টন খেলা ছেড়ে এখানে ছুটে আসিনি।

ও ফের বলে উঠল, কারণ আছে। যেটা বলতে যাচ্ছি, তার সঙ্গে এটা কানেক্টেড। সেজন্যেই বলছি। মামা বুঝতে পারল, একা ওর পক্ষে আমাকে আর ওর মেয়েকে মানুষ করা আর সম্ভব হবে না। দিদিমারও অনেক বয়স হয়েছিল। খুব কম বয়সে তখন মামা আমার বিয়ে দিয়ে দেয়। রাহুলের সঙ্গে। আমার বয়স তখন মোটে আঠেরো। বুঝতেই পারছ, আমার বয়সে কেউ সে সময়ে বিয়ে করত না। কিন্তু আমার তার জন্য কোনো অসুবিধে হয়নি। প্রথমবার মনে হল, ভালোবাসা কী তা যেন বুঝতে পারলাম। হঠাৎ যেন জীবনটা পালটে গেল। মনে হল যেন এক স্বর্গরাজ্যের সন্ধান পেয়ে গেছি।

আমার শ্বশুর-শাশুড়িও খুব ভালো ছিল। আমাকে নিজেদের মেয়ের মতো দেখত। হঠাৎ যেন এক ডুবন্ত মানুষ খড়কুটোর মতো কিছু একটা আঁকড়ে ধরে জীবন ফিরে পেল। আর রাহুল! রাহুল আমাকে খুব ভালোবাসত। এখনও বাসে। আমিও তা-ই।

—জানি। সে তোমাদের দেখলেই বোঝা যেত, কিন্তু ওর মধ্যে যে এরকম একজন জঘন্য অপরাধী লুকিয়ে আছে, সেটা কীভাবে জানবে!

আমার দিকে এবারে রহস্যজনকভাবে তাকাল শরণ্যা। চারপাশ একবার দেখে নিয়ে বলে উঠল,—ইন্দ্র, রাহুল যে খুনগুলো করেছে, সেগুলো অন্য কারো করার সুযোগ ছিল কি?

—না, সেসব তো খতিয়ে দেখা হয়েছে। প্রমাণিত হয়েছে, আর কারো পক্ষেই সম্ভব ছিল না। তুমি কি পলের স্ত্রী-র হত্যার ঘটনার ক্ষেত্রে পলকে বা ওর মেয়েকে এখনও খুনি বলছ? জেসিকার ক্ষেত্রে অন্য কেউ? কিন্তু সেটা তো প্রমাণিত হয়নি! রাহুলও স্বীকার করে নিয়েছে।

—না, ওদের কথা বলছি না। এসব খুনে আরেকজন কমন ফ্যাক্টরও ছিল, তা-ই না?

—কী বলছ, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

—আচ্ছা, আমার পক্ষে কি সম্ভব ছিল না? আমিও তো সেসব জায়গাতে রাহুলের সঙ্গেই ছিলাম। হয়তো আমারও মোটিভ ছিল।

হঠাৎ ওর এই প্রশ্ন আমি প্রথমে বুঝতে না পেরে ফের বলে উঠলাম, কী বলছ?

—বলছি, আমার পক্ষেও এই খুনগুলো করা সম্ভব ছিল। —একটু থেমে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে শরণ্যা ফের বলে উঠল—সত্যি কথা বলতে কী, আমিই করেছি। কারণ রাহুলের অপমান আমি সহ্য করতে পারি না। সেজন্য পল ও পলের বউকে মারতে চেয়েছিলাম।

এই মন্তব্যে হঠাৎ যেন আমার হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে গেল।

—কী বলছ!

—ঠিকই বলছি, ইন্দ্র। সব ক-টা খুনই আমার। রাহুলের কোনোদিনই কোনো ইনভলভমেন্ট ছিল না। ও জানতই না এসব কিছু।

—কিন্তু তুমি কেন এসব খুন করবে?

—রাহুল ছিল আমার সবকিছু। সবকিছু। এভরিথিং। সেজন্য যখনই কেউ রাহুলকে আঘাত করত বা আমার মনে হত, রাহুলকে কেউ আমার থেকে কেড়ে নিচ্ছে, তখনই আমি তার উপর প্রতিশোধ নিতাম। জেসিকাকে রাহুল ভালোবাসতে শুরু করেছিল। তুমিও সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিলে।

—কী সব বলছ? এসব বানিয়ে বলছ নিশ্চয়ই।

—ঠিকই বলছি। তুমি ভুলে গেছ। আমিও মেন্সার মেম্বার ছিলাম। ছোটোবেলা থেকেই আমার আই. কিউ. ছিল অন্য সবার থেকে অনেক বেশি। সেজন্য এসব নিখুঁতভাবে প্ল্যান করতেও আমার অসুবিধে হয়নি। নিখুঁতভাবে প্ল্যান করতে আমার খুব ভালো লাগত। কী কী হতে পারে ভেবে নিয়ে প্রত্যেকটা চাল আগে থেকে ভাবা, আমার উপরে যাতে কোনোরকম সন্দেহ না হয়, সেজন্য কাকে কাকে সন্দেহের তালিকায় রাখতে হবে, সেটা ভেবে এগোনো, এসবই তারই অংশ।

রাহুল যখন তিন বছর আগে জানতে পারল আমার অপরাধের কথা, তখন ও আমাকে পুলিশের কাছে সারেন্ডার করতে বলল। সব অপরাধ স্বীকার করে নিতে বলল। অবশ্য মুখে সেটা বললেও আমার মনে হয়, ওর মধ্যে এ ব্যাপারে একটা দ্বিধা ছিল। কারণ ও জানত, আমার কী শাস্তি হতে পারে। একই সঙ্গে এর জন্যে আমাকে ও দূরে সরিয়ে দিয়েছিল মন থেকে। ভালোবাসার সম্পর্কটা একদম নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আমার তখনই মনে হল, দরকার হলে আমি যাতে ওকে অপরাধী হিসেবে সামনে নিয়ে আসতে পাবি, সেরকম একটা কিছু

ভাবতে হবে। সেজন্যই আমিও তোমার মনে ওর প্রতি সন্দেহ তৈরি করার চেষ্টা করেছিলাম, যাতে এরকম কোনো সময় এলে তোমাকে পাশে পাওয়া যায়। গার্গীকে ও আরও অন্যদের পাশে পাওয়া যায়। আমার ধারণা যে একদম মিলে যাবে, সেটা অবশ্য ভাবতে পারিনি।

কিন্তু বিশ্বাস করো, এসবই করেছিলাম, যাতে ও পুলিশের কাছে আমার অপরাধ কোনোদিন প্রকাশ না করে। প্রকাশ করতে ভয় পায়। এজন্য নয় যে ওকে অপরাধী সাব্যস্ত করার কোনো ইচ্ছে ছিল। কিন্তু কোথা থেকে যে কী হয়ে গেল। সুরজিৎকে আমার বিয়ে করার কোন ইচ্ছে ছিল না। ওকে কোনোদিন ভালোবাসিনি। কিন্তু সুরজিৎ বিয়ের জন্য খুব জোরাজুরি করায় বাধ্য হয়ে ওকে আমাকে সরিয়ে দিতে হয়েছিল। একটু যেন রাহুলের উপরে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যই সেদিন রাহুলকে ওর বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলাম, যাতে ওকে এ ব্যাপারে ভয় দেখানো যায়।

একটু থামল শরণ্যা। ফের আস্তে আস্তে বলে উঠল, আমার মাথার ঠিক ছিল না। আসলে ভালোবাসা খুব অদ্ভুত এক জিনিস। যেকোনোভাবে, এমনকী ভয় দেখিয়ে এ ব্যাপারে ব্ল্যাকমেল করে যাতে রাহুলের ভালোবাসা ফিরে পাওয়া যায়, সে চেষ্টা আমি করেছি। একবার শুধু ওকে বলতে হত, যে ও আমাকে ক্ষমা করেছে, আমাকে ভালোবাসে। আমি সব প্রমাণ ফের লোপাট করে ওকে নিরপরাধ প্রমাণ করে দিতাম। শেষে ও সেটা মুখে বলেনি। কিন্তু প্রমাণ করে গেছে যে ও আমাকে সত্যি ভালোবাসে।

আমাকে বাঁচাতে গিয়ে যে ও সব অপরাধ নিজে স্বীকার করে নেবে, একবারও আমার উপরে সামান্যতম সন্দেহ হতে দেবে না, এটা আমার ধারণার বাইরে ছিল।

একটু উদাসী হয়ে গেল শরণ্যা। আমি আর ওর চোখের দিকে তাকাতে পারছিলাম না। অন্যদিকে তাকিয়ে ও বলে উঠল, রাহুল কোনোদিন আন্দাজও করতে পারেনি যে আমি এসবের পিছনে আছি। এতটাই সাবধানে করতাম। কিন্তু জেসিকার খুনের পরে রাহুল হয়তো কিছুটা সন্দেহ করেছিল, তবু ভাবতে পারেনি। তারপর তোমার মতো ওর হাতে একদিন এল এসব লুকোনো ছবি। সেখানে মহম্মদ শেরিফের ছবিও ছিল, যাকে তার কিছুদিন আগেই আমি খুন করেছি। মহম্মদ শেরিফ কিছুতেই আমাদের জমিতে বাড়ি করতে দিত না। ওকে সবাই যমের মতো ভয় পেত।

বেশ কিছু কারণে রাহুল সন্দেহ করছিল যে ওই খুনে, ওই গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে আমার হাত আছে। তারপরে ওইসব ছবি, ওই খাম একদিন ওর হাতে হঠাৎ করে এল। ও নিশ্চিত হয়ে যায়। বুঝতে পারে শুধু ওটাই নয়, আগের ওই খুনগুলোও আমার হাতে।

আমার ওই ছবিগুলো লুকিয়ে রেখে দেওয়া ঠিক হয়নি। কেন জানি না ওসব ছবি আমি ফেলতে পারিনি। মনে হত ওটাই আমার সাফল্যের চিহ্ন, আমার পাওয়া ট্রফি। এটাও তো একরকম শিল্প। যাকে খুন করা হচ্ছে, তাকে পরে দেখলে মনে হত যেন আমার এই খুন শিল্পের স্বীকৃতি পেয়েছে। আনন্দ পেতাম। যাকে মারব ঠিক করতাম, ওইরকম সিম্বল এঁকে আগে থেকে একটা লুকোনো স্ক্র্যাপবুকে রেখে দিতাম। ওই সিম্বলটা মধ্যযুগে ইংল্যান্ডে ব্যবহার করা হত কারো অনিষ্ট চাওয়ার জন্য।

এসব দেখে রাহুল জানল যে আমিই এসব খুনের পিছনে। এমনকী এটাও জানতে পারল যে আমার মামির মৃত্যুও স্বাভাবিক ছিল না। গ্যাস থেকে আগুন লেগে মামির মৃত্যু, সেখানেও ছিল আমার নিখুঁত প্ল্যান।

—কী সব বলছ!

—ভেবে দেখো ইন্দ্র। প্রত্যেকটা খুন ভেবে দেখো। অন্য কারোর হত্যা করার সুযোগ ছিল? হয় রাহুল, নয় আমার। এমনকী আমার সুযোগ ছিল আরও বেশি। ধরো পলের কেসটাই।

—কোকের বোতলে থ্যালিয়াম, তা-ই তো?

—হ্যাঁ। আচ্ছা, রাহুলকে কখনো বাড়ির কোনো কাজ করতে দেখেছ? অন্যদিকে তুমি নিশ্চয়ই জানো, বাড়ির অনেক জিনিস আমি নিজে হাতে বানাই ছোটোখাটো সব ফেলে-দেওয়া জিনিস দিয়ে, ফেলে-দেওয়া কোকের বোতল দিয়ে। কোকের বোতলের তলায় খুব ছোটো ফুটো করে আমিই ওতে সুতো দিয়ে থ্যালিয়াম ঢোকাই। পলের মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব করি। ওদের বাড়িতে যাই। ওই বোতলগুলো আমিই ওদের বাড়িতে রেখে এসেছিলাম।

আবার বলে উঠল শরণ্যা, রাহুল যখন তিন বছর আগে এসব প্রথম জানল, ওকে অনেক বোঝালাম, যে এসব ওর ভালোর জন্যেই। কিন্তু ও শুনতে চাইল না। ও চাইল আমার থেকে দূরে সরে যেতে। সেসব নিয়ে মনোমালিন্য এত বেড়ে গিয়েছিল যে আমি বাধ্য হয়ে ছেড়ে চলে আসি। ভেবেছিলাম, ও আমাকে আর ভালোবাসে না। ও পুলিশে সব জানিয়ে দেবে। সেজন্য আমি তারই প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ভুল ভেবেছিলাম।

আমার দিকে চোখ তুলে তাকাল শরণ্যা। একটা মোহময়ী দৃষ্টির মধ্যে যে এতটা শীতলতা থাকতে পারে, প্রথমবার ওর চোখে চোখ পড়তে বুঝলাম। চোখ সরিয়ে নিলাম।

—কিন্তু রাহুল কেন একবারও এসব কথা জেনেও বলল না! নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করল না?

—সেটাই তো! তখনই আমি বুঝতে পারলাম যে ও এখনও আমাকে সত্যি ভালোবাসে। আমার জন্যে নিজের মৃত্যুস্বীকারেও ওর কোনো আপত্তি নেই। এমন একজনকে কীভাবে মরতে দিই, ইন্দ্র? আমাকে ওকে বাঁচাতেই হবে।

—কিন্তু কে আর তোমাকে বিশ্বাস করবে? এত কিছুর পরে! যেভাবে ও.সি. মোহিত সরকার ওয়াটারটাইট কেস বানিয়েছে রাহুলের বিরুদ্ধে, কেউ তোমার কথা বিশ্বাস করবে না। ভাববে, তুমি রাহুলকে খুব ভালোবাসো বলে, মিথ্যে কথা বলে ওকে বাঁচানোর চেষ্টা করছ।

একটু মুচকি হেসে উঠল শরণ্যা।

—বিশ্বাস করবে। কারণ ও.সি. মোহিত সরকার আর নেই। কয়েক ঘণ্টা আগে ওর মৃত্যু হয়েছে। থ্যালিয়াম বিষে। আমি ইচ্ছে করে আমার ফিঙ্গারপ্রিন্ট রেখে এসেছি মোহিত সরকারের কফির কাপে। লোকটা ভালো ছিল না। রাহুল জেলে চলে যাওয়ার পর থেকে আমাকে অনেক অশালীন প্রস্তাব দিত। দু-সপ্তাহ আগে আমার বাড়িতে এসে রিনির সামনে আমার সঙ্গে অসভ্যতা করারও চেষ্টা করে, আমার গায়ে হাত দেয়, জোর করে বিছানায় নিয়ে যেতে চায়। তখনই ঠিক করি, ওকেও মারতে হবে। একই সঙ্গে খুনের ধরন বলে দেবে যে খুনি আমি। রাহুল সম্পূর্ণ নির্দোষ।

আজ মোহিত সরকার আমাকে নিরিবিলিতে পাওয়ার জন্যে একটা ফাইভ স্টার হোটেলে ডেকেছিল। সেখানে সেই হোটেলের রুমে সে কাজ সেরে এসেছি।

আমি কোথা থেকে এসব থ্যালিয়াম জোগাড় করি, সেটাও জানিয়ে দেব। আচ্ছা, ভেবে দেখো, আমরা অনেক কিছুরই বেসিকস ভুলে যাই। আমি চাকরি করিনি বটে, কিন্তু আমি একটা নামী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে যে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েছি, সেটা সবাই দিব্যি ভুলে গেছে। তুমিও।

এবারে জেসিকার কথায় আসি। জেসিকা রাহুলকে খুব ভালোবাসত, রাহুলও ওকে ভালোবাসতে শুরু করেছিল। তখনই ঠিক করি, জেসিকাকে মারতে হবে। জেসিকার মাথার স্কালের পিছনটা ফরেনসিকস এক্সপার্টরা ভালো করে দেখলে বুঝতে পারত, জেসিকাকে ভারী কিছু দিয়ে পিছনদিক দিয়ে মারা হয়েছে। যে মেরেছে, সে বাঁহাতি। রাহুল বাঁহাতি নয়, আমি বাঁহাতি। তা ছাড়া রাহুলের তিনবার মারার দরকার পড়ত না।

এ ছাড়াও মহম্মদ শেরিফের মৃত্যুর সময়ে রাহুল কলকাতায় ছিল না। আমি সেটাও প্রমাণ করে দেব।

—কী সব বলছ শরণ্যা?— আমার গলায় অবিশ্বাস ও ভয়। গলা কেঁপে যায়।

—আমার আর মরতে কোনো ভয় নেই, ইন্দ্র। আমি যে জেনে গেছি, রাহুল আমাকে এখনও সব থেকে ভালোবাসে। নিজের প্রাণের থেকেও ভালোবাসে। সেজন্যেই এত সহজে ও সব অপরাধ মেনে নিয়েছে।

ফের বলে ওঠে, তুমি আর আমি মিলে নিশ্চয়ই আবার জীবন ফিরিয়ে দিতে পারব রাহুলকে। এটা আমার দায়িত্ব। আমি জানি, আমি পারব। পারতেই হবে।

আমার চোখে ভয় দেখে ও মুচকি হেসে বলে উঠল, ভয় পেয়ো না ইন্দ্র। আমি সিরিয়াল কিলার নই। কারণ ছাড়া কাউকে মারি না। আর তোমার মতো একজন ভালোমানুষ বন্ধুকে তো কখনোই নয়। আমি শুধু ভালোবাসাকে কোনোদিন হারাতে চাইনি। তার জন্য যদি আরও দু-একটা খুন করতে হয়, আবারও করব।

দেখো, আমি রাহুলকে ফিরে পাবই। ওর ভালোবাসা আমাকে ফিরে পেতেই হবে। তারপরে আমার যা হওয়ার তা-ই হবে। তুমি আমার শাস্তির কথা ভাবছ? যদি মৃত্যুদণ্ড হয়! সে তো আমার পাঁচ বছরেই হয়েছিল।

১ মে ২০২২

কেনিলওয়ার্থ, ইংল্যান্ড

সমাপ্ত

পড়ে ভালো লাগলে বই কিনে রাখুন, এই রকম আরো বই পড়তে আমাদের টেলিগ্রামে জয়েন করুন